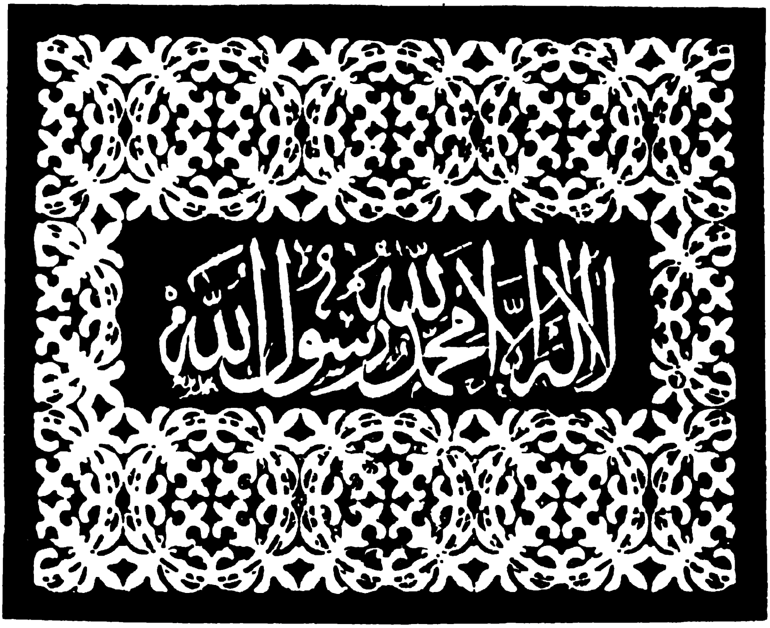


লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্

আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, মহম্মদ (দঃ) তাঁর প্রেরিত দূত।

ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস : চতুর্থ খণ্ড

জিন্নুরায়েন
হযরত ওসমান

কোরআনের আলোকে : চার খলিফা
খোলাফা-ই-রা'শেদীন
(ন্যায়পরায়ণ খলিফাগণ)

ডক্টর ওসমান গনী, এম. এ., পি-এইচ. ডি., ডি. লিট.
বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক—ইসলামেব ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয, কলকাতা

মল্লিক ব্রাদার্স
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৫৫, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

HISTORY OF ISLAM—Vol. IV

Holy prophet : 570—632
Char Khalifa : 632—661
Hazrat Uthman : 644—656

By
DR. OSMAN GHANI.
M. A., Ph. D., D. Litt., R. L. S., F. A. S., S. R. F.

• মল্লিক ব্রাদার্স-এর পক্ষে
আলহাজ্ব আবুল কালাম মল্লিক
৫৫ কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা—৭৩

তৃতীয় সংস্করণ আগস্ট ১৯৬৫

প্রচ্ছদ : কুমাব অজিত

টাইপ সেটিং :
গ্রীন টাইপ
৩ শ্যামাচবণ দে স্ট্রীট
কলকাতা—৭৩

মুদ্রক :
শ্রীঅসিত কুমার ঘোষ
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০১-এ, বিধান সরণী
কলিকাতা—৭০০০০৬

উৎসর্গ

একনিষ্ঠ শিক্ষাদরদী, বহু জনহিতকব
প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, বীরভূম জেলাব
প্রাণপুরুষ
খান্ বাহাদুর চৌধুরী আব্দুল মজিদ মিয়া
(মজু মিযা)
নানুব সাঁকুলিপুব, বীবভূম।

দেখেছি তোমায় দূর হ'তে নয়—
অতি নিকটে অতি কাছে
শিক্ষার লাগি দেখেছি তোমায়—
অন্তরে তব কি আছে।
মাননি মুসলমান, মাননি হিন্দু
মাননি খ্রীস্টান কোন জাতি
মানুষের সেবা করিতে তুমি—
জেনেছ মানুষ এক জাতি।
শিক্ষা, সেবা, শান্তির লাগি—
বিশ্ব-স্রষ্টার সংবিধান
চির শান্তির চিরনির্দেশ—
দিতেছে আল্লাহর মহা কোরআন।

কোরআন : ২ : ২১৩, ১০ : ১৯, ১১ : ১১৮, ১৬ : ৯৩, ২১ : ১০, ৫০, ৯২, ১৮ : ২৭, ২৩ : ৫২, ৪২ : ৮, ৫৬ : ৭৭, ৮০, ৮১, ৬৮ : ৫২।

পূর্বাভাষ

ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রথম খণ্ড হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ 'মহানবী' ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। স্নেহভাজন ছাত্রছাত্রী ও দেশজোড়া পাঠক-পাঠিকাগণের আশাতীত আগ্রহ দেখে অভিভূত হয়েছি, উৎসাহ বোধ করেছি। বহু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি পত্রও দিয়েছেন 'ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস' শেষ করার জন্য। তাঁদের অকৃত্রিম অনুরোধে আমি অনুপ্রাণিত ও কৃতজ্ঞ। 'মহানবী' গ্রন্থটি সমাজে এত সত্বর এরূপ মর্মস্পর্শী সাড়া জাগাবে আমি ধারণাও করতে পারিনি। যে কোন লেখকের জীবনে এটা খুবই আনন্দের কথা।

'মহানবী'র পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনমতো কিছু কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করার ইচ্ছা রেখেছি। বহু বিদগ্ধজন হতে সাধারণ মানুষও 'মহানবী' (দঃ)-কে 'মানুষ' হিসাবে দেখার যথার্থ মূল্য দিয়েছেন, যার জন্য খুবই আনন্দ পেলাম। বাংলাদেশ হতেও বহু বিদ্যানুরাগী আমাকে অনুরূপ পত্র দিয়ে ধন্য করেছেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট 'মহানবী' গ্রন্থটি প্রভূত সমাদর লাভ করায় সকলকে আবার বিনম্র চিত্তে ধন্যবাদ জানাই।

কোরআন ১৮ : ১০৯, ১১০, ৪১ : ৬।

আজ সকলের শুভেচ্ছা ও আন্তরিকতা মাথায় নিয়ে ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাসের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড—'খোলাফায়ে রাশেদীন' (সৎপথে পরিচালিত ন্যায়পরায়ণ চার খলিফাগণ) প্রকাশিত হল। আমার ক্ষুদ্র ব্যক্তিজীবনের অনুভূতি, বহু জনের আগ্রহ ও অনুরোধ আমাকে এই কাজে শক্তি জুগিয়েছে, সাহস জুগিয়েছে নিবিড় সাধনায়।

মহানবী রচনাকালে যে কোরআনভিত্তিক নীতি অনুসরণ করেছিলাম, এখানেও সেই একই নীতির প্রয়োগ করেছি। কেননা, এখানে যাঁদের কথা আলোচনা করেছি তাঁরা ছিলেন মহানবী (দঃ) এর একান্ত অকৃত্রিম অনুসারী, সুতরাং ঐ একই নীতির প্রয়োগ স্বাভাবিক।

মুসলিম খেলাফত ও সাম্যবাদ

মহান গুরুভার ও বিশাল গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়েও সংসার-জীবনে, সমাজ-জীবনে ও প্রশাসনে মানুষ কি করে আপন গুণে মহান হতে পারে, মহিমান্বিত হতে পাবে, খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনধারা তারই আলেখ্য। তাঁরা আপন কর্মগুণে আলোক-সামান্য প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন মানব সমাজে। সুতরাং এখানেও অহেতুক অলৌকিকতার মোহ বা দুর্বলতা পবিহাব

করার চেষ্টা করেছি। কেননা, সাবধান বাণী এইটুকু—সত্য ও সুন্দরের পথে তাঁদের কঠিন অর্জিত মনুষ্যত্বের দীপশিখা যেন কোন অনিশ্চিত অলৌকিকতার ঝড় ঝাপটায় নিভন্ত হয়ে না ওঠে। সবার সম্মুখে তাঁরা দেহগতভাবে ছিলেন সাধারণ মানুষ, অন্তরে ছিলেন আদর্শ মানব।

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) সবসময় নিজেকে অতি সাধারণ মানুষ বলে পরিচয় দিতে ভালবাসতেন এবং ঠিক ঐ ভাবেই দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরাও করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন—"আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ"। পরবর্তীকালে তাঁর চারজন অকৃত্রিম অনুসারী খলিফাও ঠিক ঐ ভাবেই নিজেদের সমাজে তুলে ধরেছিলেন। খলিফাগণের জীবন ছিল এমনই সরল ও সহজ, কোথাও কোন দুর্বলতা ও জটিলতা নেই, অভিনয় নেই, অভিমান নেই, আড়ম্বর নেই, অহমিকা নেই, অসাম্যের চিহ্ন নেই। তাঁরা শুধুমাত্র সাম্যের প্রবক্তা ছিলেন না, বাগ্মী ছিলেন না, তাঁরা বিশাল জনসমাবেশে সাম্যের সুন্দর ভাষণ দিয়ে অসাম্যের বিরাট অট্টালিকায় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বৈধ অবৈধ সম্ভোগের চরম প্রাচুর্যে দিন ও রাত্রি কাটিয়ে নিজেদেরকে নিজেই প্রবঞ্চনা করতেন না। ১৮:১১০।

তাঁরা ছিলেন সত্য, শান্তি ও সাম্যের আচার্য। তাই তাঁদের বলা হয়— খোলাফায়ে রাশেদীন, অর্থাৎ সৎপথে পরিচালিত খলিফাগণ। আরবী খলিফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি। মহানবী (দঃ) ছিলেন এক আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। চার খলিফা ছিলেন তাঁর প্রতিনিধি ৬৩২-৬৬১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত।

মহানবী (দঃ) রাতের পর রাত, নিবিড় ধ্যানে, একান্ত আরাধনায় আত্মিক সাধনায় আল্লাহ্‌র নিকট হতে শক্তি সঞ্চয় করতেন এবং দিবালোকে মানুষের কল্যাণে ঐ শক্তির সদ্ব্যবহার করতেন। 'খোলাফায়ে রাশেদীন'ও ছিলেন ঠিক তাঁর পূর্ণ অনুসারী। তাঁরাও বলতেন—'রাত্রিতে যে শক্তি সঞ্চয় করি, দিবালোকে তা খরচ করি।' তাঁরা আরো বলতেন, মনের জন্য যেমন প্রার্থনা আছে, দেহের জন্যও তেমনি প্রার্থনা আছে। মনের প্রার্থনা ধর্মযোগে, অর্থাৎ মন ভাল থাকে ধর্মযোগে, দেহের প্রার্থনা কর্মযোগে, অর্থাৎ দেহ ভাল থাকে কর্মযোগে। এইভাবে তাঁরা একদিকে ছিলেন ধর্মযোগী, আবার অন্যদিকে ছিলেন কর্মযোগী। তাই তাঁদের জীবনধারা ছিল আদর্শের ধারা, অনুশীলনের ধারা, মানুষ গঠনের ধারা, সমাজ গঠনের ধারা। তাঁদের ধারা শুধু জড়বাদের (Materialistic world) মতো দেহ ও ইহলোকের ধারা নয়। তাঁদের জীবনধারা দেহ ও মনের সমন্বিত ধারা, ইহলোক ও পরলোকের সম্মিলিত ধারা, এককথায় অখণ্ড জীবনের ধারা।

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারায় বিধৃত হয়েছিল সমগ্র বিশ্বে একটি মাত্র জাতি, যার নাম মানবজাতি। একটি মাত্র সমাজ, যার নাম মানবসমাজ। তিনি চেয়েছিলেন একটি মাত্র সরকার, যার নাম বিশ্ব সরকার বা মানব সরকার। (বর্তমানের U.N.O. জাতিসংঘ তার

কিছুটা মাত্র।) একটিমাত্র শাসন, যার নাম বিশ্ব-শাসন বা মানব-শাসন; একটি মাত্র সভ্যতা, যার নাম বিশ্ব-সভ্যতা বা মানব-সভ্যতা; একটি মাত্র পরিবার, যার নাম বিশ্ব-পরিবার বা মানব-পরিবার। তাই তিনি ঘোষণা করেছিলেন দ্বিধাহীনভাবে—"সমগ্র বিশ্ব আল্লাহর পরিবার, যে ব্যক্তি এই পরিবারের নিকট ভাল লোক, সেই আল্লাহর নিকট ভাল লোক। যে তার প্রতিবেশীর চোখে ভাল লোক, সেই আল্লাহর নিকট ভাল লোক।" সুতরাং ভাল লোকের সংজ্ঞা তিনি কোন দেশ-পাত্র বংশ-গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে যাননি।

আজ ১৪০০ বছর পর সমগ্র বিশ্ব যেন একটি হাতের মুঠোয় এসে যাচ্ছে। অতএব সমগ্র বিশ্ব মানব আজ ঐরূপ একটি একান্নবর্তী পরিবারভিত্তিক চিন্তা-ভাবনা নিতে না পারলে, একদিন বিশ্ব-সমাজ একে অপরের অব্যর্থ আঘাতে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে। এই বিশ্বব্যাপী ধ্বংসকে প্রতিরোধ করার জন্যই আজ হতে ১৪০০ বছর পূর্বে বিশ্বনবী এরূপ একটা চিন্তা নিয়েছিলেন - বিশ্ব মানব, বিশ্ব সরকার। তাঁর বিষয়বস্তু ছিল—বিশ্ব সৃষ্টি, বিশ্ব-সমাজ। তাঁর বিচার্য বিষয় ছিল মানবাধিকার, মানব সমাজ। তাঁর এক হাতে ছিল বিশ্বপিতার বন্দনা, অন্য হাতে ছিল সেই এক বিশ্ব পিতার সকল সন্তানে এক ও অভিন্ন জানা এবং সকল মানুষের মানবাধিকারকে স্বীকার করা ও সম্মান দেওয়া।

খোলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস সেই এক মাতা ও এক পিতার ইতিহাস, সেই এক ও অভিন্ন সন্তানের ইতিহাস, মানবাধিকারের ইতিহাস, সবল ও দুর্বল, ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, পুরুষ ও রমণী সকলকে নিয়ে সাম্যভিত্তিক উন্নয়নশীল অখণ্ড মনুষ্য-সমাজের ইতিহাস।

ইসলাম ধর্ম মূলত তাই শান্তি ও সাম্যভিত্তিক, প্রতিবেশী, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, ভাই বোন, স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি সহ পরিবারভিত্তিক, উন্নত জীবনের জন্য শিক্ষা ও জ্ঞানভিত্তিক, দেশ পরিচালনার জন্য রাজনীতি ও গণতন্ত্রভিত্তিক, সংসার ও সমাজভিত্তিক, সংস্কার ও সভ্যতাভিত্তিক এবং বিপ্লব ও বিবর্তনভিত্তিক। ইসলামের মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন ও পবিত্র হাদিস এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণপঞ্জী। শুধু গ্রন্থ মধ্যে কাগজে-কলমেই এই সংজ্ঞা সীমাবদ্ধ নয়। স্বয়ং মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) এর জীবন হতে তাঁর অকৃত্রিম খলিফাগণ 'খোলাফায়ে রাশেদীনের' জীবনধারা এর প্রমাণের কোন অপেক্ষাই রাখে না। ধর্মে, শাস্ত্রে, শাসনে, প্রশাসনে, ইতিহাসে, দর্শনে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে এবং মানুষের দৈনন্দিন সমাজ-জীবনে দূর অতীত হতে সুদূর ভবিষ্যতের অখণ্ড মানুষের এবং মানুষের অখণ্ড জীবনের জন্য 'খোলাফায়ে রাশেদীন' সর্বজনগ্রাহ্য একটি আদর্শ জীবন-ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ যেন সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য কতিপয় মহাজীবনের প্রবল প্রয়াসের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ইতিহাস, দৃষ্টান্তের ইতিহাস, উপমার ইতিহাস, অনুশীলনের ইতিহাস, প্রতিজ্ঞার ইতিহাস, প্রজ্ঞার ইতিহাস, ত্যাগ ও তিতিক্ষার ইতিহাস, আদর্শের ইতিহাস ও মানবাধিকারে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধের ইতিহাস।

মহানবী হযরত মহম্মদ (সাঃ) নিরঙ্কুশ সাম্যের ভিত্তিতে জগৎ-শান্তির যে সমাজব্যবস্থা, যে বিধিবিধান দান করেছিলেন, খোলাফায়ে রাশেদীন সেই পথে পরিচালিত হলেন। মহানবী (দঃ)-এর পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দেওয়া পথ ও পন্থা কিছু কিছু সমাজবিরোধীদের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠল, তখন ইসলাম জাহানের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) (৬৩২-৩৪ খ্রীঃ) তরীর হাল ধরলেন। খুবই শক্ত হাতে, খুবই দক্ষতার সাথে বিপদাপন্ন উত্তাল তরঙ্গ হতে ইসলামের তরীকে তীরে আনতে সক্ষম হলেন। তাই তাঁকে Saviour of Islam বা ইসলামের ত্রাণকারী বলা হয়।

এরপর হাল ধরলেন আমিরুল মোমেনিন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) (৬৩৪-৪৪ খ্রীঃ)। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা রূপে শাসনে সমাজ জীবনে, সাম্রাজ্য বিস্তারে এবং গঠনে ও বিচারাসনে যে অভাবনীয় ও অচিন্ত্যনীয় কৃতকার্যতার দৃষ্টান্ত এবং ক্ষণজন্মা পুরুষ ও কালজয়ী প্রতিভার পরিচয় তিনি রেখে গেছেন, তা জগতের ইতিহাসে আজও দুর্লভ। তাই তাঁকে Real Builder of Islamic State বা ইসলামি রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

অতঃপর এলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) (৬৪৪ ৫৬ খ্রীঃ)। হযরত ওসমান (রাঃ) চিরদিনই ছিলেন অতীব দয়ালু, দাতা, মহানুভব। তিনি নিজে ধনী ব্যক্তি ছিলেন, পরবর্তীকালে ইসলামের সেবায় সমস্ত ধন বিতরণ করে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। ইসলামের মূল গ্রন্থ পবিত্র কোরআনকে জগতের বুকে অক্ষয় ও নিখুঁত রাখার জন্য তাঁর অবদান অসামান্য। অন্যান্য সকল কাজের মাধ্যমে পবিত্র কোরআন একত্রীকরণে তিনি যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, তা চিরস্মরণীয় বস্তু। তাই তাঁকে জা'মেয়ুল কোরআন বা কোরআন একত্রকারী বলা হয়।

এরপর এলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ বা শের-ই-খোদা হযরত আলী হায়দার (কঃ) (৬৫৬ ৬১ খ্রীঃ)। পৃথিবীর বীরের ইতিহাসে বহু বীর এসেছেন ও গেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত মানব সমাজ দ্বিতীয় আলীর (কঃ) জন্ম দিতে পারেনি। তিনি শারীরিক শক্তির দিক থেকে ছিলেন মহাবীর, আবার মানুষের দিক থেকেও ছিলেন মহামানব, পৌরুষের দিক থেকে ছিলেন মহাপুরুষ, মনের দিক থেকে ছিলেন মহানুভব। দেহেব বীরত্ব ও মনের মহত্ত্ব একযোগে তাঁকে এতদূর ঊর্ধ্ব জগতে নিয়ে গিয়েছিল, স্বয়ং মহানবী (সাঃ) তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' বা আল্লাহর সিংহ ও 'জ্ঞানের দরজা' বলে ভূষিত করেন। সত্যিই তিনি ছিলেন মানব সমাজেব নজিরবিহীন সিংহ-পুরুষ। তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন পবিত্র খোলাফায়ে

রাশেদীনের অক্ষত সময়কাল, মানবতার পরিপূর্ণ জীবনদীপ, সাম্যের পূর্ণ প্রতীক, শান্তির নিরঙ্কুশ বাহন চির ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠল। মানব সমাজ হারাল তার সাম্যেব যুগ, স্বর্ণ যুগ, আদর্শ সাম্যবাদ। ইসলামের প্রকৃত খেলাফত যুগ এখানেই সমাপ্ত হল। পরবর্তী অধ্যায় খলিফা বনাম রাজা-বাদশার যুগ। মানবকালের মধ্য-গগনে মানবতাব পূর্ণচন্দ্র যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর সততা ও ধর্মপরায়ণতা, হযরত ওমর (রাঃ)-এর বিচার ও প্রশাসনিক প্রতিভা ও যোগ্যতা, হযরত ওসমান (রাঃ)-এর জনহিতকর কার্য ও মহানুভবতা, হযরত আলী (রাঃ)-এর বীরত্ব ও মহত্ত্বকে মানব সমাজে মানুষের স্মৃতিতে ম্লান করতে পারে মহাকাল আজও সে শক্তি অর্জন করেনি। খলিফাগণ এই যে অলোকসাধারণ শক্তি অর্জন করেছিলেন, এর মূলে ছিল তাঁদের অদম্য চরিত্রবল। তাই তাঁদের ইতিহাস একদিকে রাজা-বাদশাব ইতিহাস, অন্যদিকে ফকিরের ইতিহাস; একদিকে মানুষের ইতিহাস, অন্যদিকে মনুষ্যত্বের ইতিহাস. মানবতার ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাস, সংস্কৃতির ইতিহাস, সমৃদ্ধির ইতিহাস। সবের উর্ধ্বে সত্য ও সুন্দরের পথে ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে তাঁদের ইতিহাস সাম্যের ইতিহাস, শান্তির ইতিহাস। এককথায় তাঁদের ইতিহাস রাষ্ট্রের ও সমাজের দরিদ্রতম মানুষের কথা স্মরণ করে সাম্যবাদেব চূড়ান্ত রূপকারের অকৃত্রিমভাবে অনুস্মরণের ইতিহাস।

সাম্যবাদের চূড়ান্ত রূপকার

অতীতের ইতিহাস হতে, বর্তমানের অভিজ্ঞতা হতে, জ্ঞান বিজ্ঞান হতে, ধর্মগ্রন্থ হতে ও নানা দিক হতে ভবিষ্যতের পথে একটি কথা বিশ্ব মানবসমাজ বারবার জানতে পেরেছে—যখনই যে কোন সমাজ বা দেশ তার সাম্যেব ভারসাম্য হারিয়ে, মনুষ্যত্বকে হারিযে পশুত্বের পবিচয় দিযেছে, তখনই বিধাতা পুরুষ পরম করুণাবশত এক একটি ক্ষণজন্মা পুরুষকে পাঠিযেছেন তাঁর দূতরূপে, সাম্যকে ফিরিযে এনে শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাঁব দূতগণেব সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ দূত ছিলেন হযরত মহম্মদ (দঃ) (৫৭০-৬৩২ খ্রীঃ)। কোরআন—৩:১৪৪, ৪:৭৯, ৩৩:২১, ৪১:৬, ৪৮:২৯, ৬১:৬।

ইসলাম জগতের মহান কাণ্ডারী মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) ছিলেন অখণ্ড মানবসমাজের দরিদ্র মানুষ ও অভাগা রমণীকুলের ত্রাণকারী ও দবদী বন্ধু; এবং দুর্গত মানবতার উদ্ধারকারী মহান দূত, মরুর কল্যাণে মরুদুলাল, দুর্লভ মানব জন্মে ও মানুষের চিন্তায় মহামানব, শান্তি সাম্যে মহাসেনা, সমাজ সংস্কারের দুর্জয় সাধনায় সিদ্ধ সাধক, ক্ষমাব দরবারে দয়াব সাগর, প্রেম ও ভালবাসায় পরমপুরুষ। কোরআন—৩:১৫৯, ৪:৭৯, ১৬৫, ৯:১২৮, ১৫:১০, ১৬:৪, ২১:১০৭।

তুলিতে মানব জাতি মনুষ্য সম্মানে
এক সুরে ডাক দিলে মানব সন্তানে।
দুই হাত তুলে ধরে দিলে আমন্ত্রণ
শাশ্বত জীবনের স্বাদ বিতরণ।

*　　*　　*

জীবন হয়েছে যবে ওষ্ঠাগত
বাধার কণ্টকেতে ক্ষতবিক্ষত
তখনো নিবিড় প্রাণে অবিরাম ধ্যান
দাও প্রভু অবোধেরে বোধশক্তি জ্ঞান। —মহানবী

তবে বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক মহানবী (দঃ)-এর চিন্তাধারাকে তদানীন্তন বিশ্ব-সমাজের যে দুটো জিনিস সর্বাপেক্ষা বেশি অলোড়িত করেছিল, এবং যে দুটো দিকে তাঁর দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি নিবদ্ধ হয়েছিল, ঐ দুটো জিনিস সমাজের দরিদ্র মানুষ ও অবহেলিত নারী সমাজ। কোরআন—২ : ১৮৭, ৩ : ১২৯, ৪ : ৩৪।

পুরুষ-রমণী সমাজপাখি মহানবীর হুঁশিযার
একটি ডানায নাহি থাকে বল আকাশেতে উড়িবার।
যুবক-যুবতী ভেদাভেদ নাই, উন্নত পরিবাব
উভয়েরই শ্রম সাধনার দ্বারা গড়িবে এ সংসার।
এক যদি গরীয়ান তবে অন্য সে গরীযসী
এক যদি মহীয়ান তবে অন্য সে মহীয়সী। —মহানবী

মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর মহান ব্রতের মূল লক্ষ্য ছিল—সকল মানুষের মাঝে বিশ্ব স্রষ্টার বন্দনা, এবং সেই এক বিশ্ব স্রষ্টার অধীনে সকল মানুষের মাঝে জাতিগত-বর্ণগত, শ্রেণীগত, সম্প্রদায়গত, অর্থনৈতিক দুববস্থায় মানুষ রচিত কৃত্রিম ব্যবধানগুলোর মূলোচ্ছেদ করে সাম্যের ভিত্তিতে বিশ্বজোড়া ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তোলা। মানবতার এই বাস্তবায়নের জন্যই কখনও উড়িয়েছিলেন ধর্মের পতাকা, কখনও বা উড়িয়েছিলেন কর্মের নিশান, কখনও বা রেখেছিলেন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ প্রাণের সুদৃঢ় পদক্ষেপ, কখনও বা ঘোষণা করেছিলেন 'জেহাদ'—অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কোরআন—৮৭ : ১৪, ৯১ : ৯, ১০, ৯৩ : ১০।

জেহাদ যাহার লাগি যুদ্ধ আমরণ
সাম্য ভ্রাতৃত্ব পরে সমাজ গঠন।
যার লাগি নির্যাতন যত নিপীড়ন
অন্যায় অবিচার করিতে দমন।
দেখিবারে দেখেছিলে জগৎ স্বপন
সাম্য ভ্রাতৃত্ব পবে সমাজ গঠন।

—মহানবী

মহানবী ঘোষণা করেছিলেন—এই জগতে যা কিছু আছে তার একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ্, এবং তাঁর সৃষ্ট-জগতে ও সম্পদে সকল মানুষের সমান অধিকাব আছে। তিনি কোন রাজতন্ত্র মেনে নেননি। কোন রাজা মানেননি। কোন জমিদার ও জোতদারকেও স্বীকার করেননি। কোন অতিবিক্ত সঞ্চয়কারীকেও বরদাস্ত করেননি। এ বিশ্বে মদিনার বুকে নিবঙ্কুশ গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রথম প্রতিষ্ঠা করলেন গণতন্ত্রমুখী সমাজব্যবস্থা। যা ছিল একান্ত সাম্যভিত্তিক।

এ ধরার মালিকানা জগৎপিতার
সকল সম্পদ হতে সবকিছু তার।
শিখায়েছ মানুষেরে স্রষ্টা সবাকার
সৃষ্টিকুলে সকলের সম অধিকার।
এ জগতে আছে যদি রাজ-সিংহাসন
সর্বহারা মানুষের হৃদয় আসন।
বলে নাই জোরে নাই জাতির জনক
মানুষই কবিবে ঠিক মানব সেবক।
শিখাইলে মানুষের মান—মানবতার
অবাধে করিতে পার রুজি-রোজগার
অফুরন্ত সঞ্চয়ের নাহি অধিকার।
জগতের গণতন্ত্র সাম্য অধিকার।
মানুষ খলিফা শুধু খাদেম খোদার
এ কথা জানে না যেই নহে জনতার।
মহানবীর গণতন্ত্র সভ্যসমাজ
শিখায়েছে মানবেরে গড়িতে সমাজ।

অক্ষত সাম্যবাদের ক্ষতবিক্ষত রূপ

সাম্য ও ভ্রাতৃত্বেব ওপর প্রতিষ্ঠিত মহানবী (দঃ)-এর বিশ্ব সমস্যার সমাধানকারী মানবতার উদ্ধারকারী, চিন্তা ও কর্মধারার প্রয়োগ প্রণালীকে উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করে চলেছিলেন তাঁর খোলাফাযে রাশেদীন (ন্যায়পরায়ণ খলিফাগণ) সাহাবায়ে কেরামগণ অর্থাৎ মহান সঙ্গীগণ।

এই খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কাল মানব সমাজে প্রথম নিরঙ্কুশ সাম্যবাদেব পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি চূড়ান্ত ফল। কি করে এই সংসারের একটি মানুষ সামান্য সংসার জীবন হতে অসামান্য বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করেও সাম্যেব ভিত্তিতে সহজেই প্রমাণ করতে পারেন—একদিকে তিনি ফকিব, অন্যদিকে তিনি সম্রাট; আবার শক্তির দিক থেকে একদিকে তিনি পার্থিব জীবনেব

শক্তিধর পুরুষ ও সম্রাট, অন্যদিকে আত্মিক দিক থেকে স্বয়ং স্রষ্টার অমিত শক্তির অসীম আধার। এইখানেই, এই তাৎপর্যেই তাঁরা স্রষ্টার দূতের প্রতিনিধি, প্রতিনিধিত্বও তাঁদের সার্থক হয়েছে। তাঁদের যে জীবন, তা জাগতিক ও ঐশ্বরিক দ্বিশক্তিকে দু'হাতে ধারণ করে মানব সমাজে সাম্যের সেনারূপে মানবতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনকাল সময়কাল জগতেরও (স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ) সংসারের এই পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল, সত্য পরীক্ষায় উন্নীত। সুতরাং খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনে-প্রশাসনে প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সাম্য সত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কোন গালভরা সংবিধানে নয়, কোন কনফারেন্স বা সেমিনারে নয়, কোন ঐতিহাসিক মঞ্চের আসনে নয়, ভাষণে নয়, তাঁদের কর্মময় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই সাম্য পেয়েছে প্রাণ সমাজ-জীবনে।

তাঁদের পবিত্র জীবন ব্যতীত পৃথিবীর ইতিহাসে, মানব ইতিহাসে, রাজ-ইতিহাসে এই অপূর্ব সমন্বয়ের সাম্যের অধ্যায়টি অলিখিত থেকে যেত। সংসারের কঠিন ধারা ও স্বর্গের সুধা কেমন করে একটি মানুষের জীবনে একই সঙ্গে প্রবাহিত হতে পারে, কি করে একটি সম্রাট ফকিরের জীবনযাপন করতে পারেন, সাম্যের প্রতীক খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন-প্রণালী, খেলাফতকাল তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, নজিরবিহীন উপমা। এই দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন মরণোত্তর অখণ্ড জীবনের ও সাম্যবাদী মানব-সমাজের এবং সভ্যতার, শাসনের-প্রশাসনের মহান রূপকার।

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবক্কর সিদ্দিক (রাঃ) (৬৩২-৩৪) (ইসলামের ত্রাণকারী) অত্যন্ত যোগ্যতার সাথেই মহানবী (দঃ)-এর মহান চিন্তাধারাকে সমাজ-জীবনে রূপ দিলেন। দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মোমেনিন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) (৬৩৪-৪৪ খ্রীঃ) (ইসলামি রাজ্য ও শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা) ঐ চিন্তাধারাকে সযত্নে লালন করে বিশ্ব-সমাজ জীবনের সারবান বৃক্ষরূপে পরিণত করেন। শুধু তাই নয়, তিনি প্রমাণ করেছিলেন সাম্যের ভিত্তিতে ধনী-দরিদ্র, মুসলমান-অমুসলমান যেন একটি একান্নবর্তী পরিবার। (মহানবী (দঃ) বলেছিলেন—"সমগ্র বিশ্ব আল্লাহর পরিবার। যে এই পরিবারের নিকট ভাল মানুষ, সেই আল্লাহর নিকট ভাল মানুষ।") হযরত ওমর (রাঃ) এর প্রশাসনে ও দক্ষ হাতে মহানবী (দঃ)-এর এই পরিবারভিত্তিক চিন্তার বলিষ্ঠ রূপায়ণ দেখতে পাই। চতুর্থ খলিফা হযরত আলীও ছিলেন এই পথেরই অনুসারী।

কোন অনিবার্য কারণবশত তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) (৬৪৪-৫৬) (কোরআন একত্রকারী) এর সময় ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তনের ফলে সমাজে কিছু কিছু ধনী, জমিদার ও জোতদারের আবির্ভাব হলে মহানবী (দঃ) এর কয়েকজন বিশেষ সাহাবী সাম্যের জন্য সিংহবিক্রমে গর্জিয়ে ওঠেন।

মহানবী (দঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্যের গায়ে সামান্যতম আঘাতকে তাঁরা যেন আপন শরীরের অসামান্যতম আঘাত বলে অনুভব করেছিলেন। এই সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ) ছিলেন অন্যতম।

তখন (৬৪৪-৫৬ খ্রীঃ) সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া। সিরিয়াতে হযরত আবুজর গিফারীর (রাঃ) অসন্তোষের বহ্নি যখন বিরাট আকার ধারণ করল, তখন স্বয়ং গভর্নর প্রমাদ গুণলেন। তিনি কালবিলম্ব না করেই হযরত গিফারীকে সুকৌশলে মদিনায় খলিফার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। খলিফা বহু চেষ্টা করেও হযরত গিফারী (রাঃ)-কে বোঝাতে সক্ষম হননি। হযরত গিফারী (রাঃ) মহানবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের জন্য জনগণকে ডাক দিলেন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর শরীর তাঁকে আর বেশিদিন সময় দেয়নি। কিন্তু তাঁর আন্দোলন ও আহ্বান সকলের প্রাণে সাড়া জাগিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে বিশ্ব-সমাজবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছিল।

আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ, ভাষ্য, টীকা ও ব্যাখ্যা বেরিয়েছে, জার্মান ভাষা তাদের অন্যতম। এই পথে জার্মান পণ্ডিতগণ, রাজনীতিবিদগণ পবিত্র কোরআন ও ইসলামের ইতিহাস হতেই সর্বপ্রথম কমিউনিজমের সন্ধান পান। (কোরআন-সূরা*মাউন ১০৭:১-৭।) এবং আবুজর গিফারী (রাঃ)-কে বিশ্বের সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট—সাম্যবাদী) বলে আখ্যায়িত কবেন। জার্মানবাসীদের মনে মুসলিম ভাব ও চিন্তাধারাকে আয়ত্ত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষার ফলে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী অধ্যয়ন শুরু হয়। পবিত্র কোরআন হতে আরবের ইতিহাস ও সংস্কৃতি জার্মান ভাষায় অনূদিত হল। পরবর্তীকালে (KARL MARX) কার্ল মার্কস ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফ্রেডারিক এঞ্জেলস মুসলিম ইতিহাসকে সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার ও উপায় হিসাবে গ্রহণ করেন, এবং জার্মান পণ্ডিতগণও এই মুসলিম সংস্কৃতির সাথে পরিচিতির ফলে সারা বিশ্বে বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

সুতরাং আজ যদি মহানবীর প্রিয় উম্মত বিশ্ব মুসলমানকে ও ঋষি মহর্ষীগণের বংশধর ভারতবাসীকে বা যে কোন ধর্মের যে কোন আস্তিককে কোন নাস্তিকের নিকট সাম্যের সেবক ও শান্তির শিক্ষার জন্য দ্বারস্থ হতে হয়, তাহলে বিশ্ব মুসলমানের জন্য ও বিশ্ব-আস্তিকের জন্য এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি আছে!

---

*সূবা মাউন: (১) তুমি কি তাকে দেখেছ—যে ধর্মকে অস্বীকাব কবে'? (২) ফলত সে ঐ ব্যক্তি, যে পিতৃহীনকে রূঢভাবে তাডিযে দেয, (৩) যে অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহ দেয না। (৪) সুতবাং ঐ সকল নামাজ আদাযকাবীদেব জন্য পবিতাপ, (৫) যাবা স্বীয নামাজে (অর্থাৎ নামাজেব মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে) অমনোযোগী। (৬) যাবা শুধু (যেন লোকচক্ষে লোক) দেখানোব জন্য (উপাসনা) কবে। (৭) এবং (গৃহস্থালীব) প্রযোজনীয ছোটখাটো দ্রব্যাদি দ্বাবা (গবিবকে) সাহায্য কবতে বিবত থাকে। কোবআন ২:২৬১ ৬৪, ৩:৯২, ১০৭:১-৭, ৯৩:১০।

পরবর্তীকালে ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) যথাসাধ্য চেষ্টা করেন ইসলামের সেই অনাবিল শান্তি ও সাম্যকে ফিরিয়ে আনতে। ইসলামের প্রথম দুই খলিফা মূলত যুদ্ধ করেছিলেন অমুসলমানদের সাথে। তখন মুসলমানদের মধ্যে কোনপ্রকার মতভেদের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু হযরত আলীর জন্য চরম দুর্ভাগ্য, তাকে তাঁর আপন জাতি মুসলমানদের বিরুদ্ধেই তরবারি ধরতে হল। তিনি যখন খেলাফতে বসলেন, তার পূর্বেই ইসলাম জগতে বা রাষ্ট্রে দুষ্ট কায়েমী স্বার্থ বসে পড়েছে। তখন অনেকেই বড় বড় জমিদার ও জোতদার বা ধনকুবের। হযরত আলী (রাঃ) কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেননি। বরং যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে। যখন আঁতে ঘা লেগেছিল কপট মারওয়ান ও কুচক্রী মুয়াবিয়া প্রমুখ ব্যক্তিগণের, তখন তাঁরা হযরত আলীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তাঁরা সকলেই জানতেন হযরত আলী (রাঃ) মহানবীর (সাঃ) চিরছায়া স্বরূপ ছিলেন। চরিত্রে ব্যক্তিত্বে ছিলেন তুলনাহীন মানুষ। তবুও তাঁরা তাঁকে সহ্য করতে পারলেন না শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থেব জন্য। অন্যদিকে মহাবীর মহানুভব আলী (রাঃ) তাঁদেরও সহ্য করতে পাবলেন না শুধুমাত্র ইসলামের শান্তি ও সাম্যের জন্য। এই যুদ্ধে হজরত আলীর পরাজয়ের প্রধানতম কারণ কোথাও তিনি অসৎ, হীন ও নীচ হতে পারেননি। যে কোন পরিবেশে, যে কোন পরিস্থিতিতে হীনতা ও নীচতা কোনদিনই মহানুভব আলীর (রাঃ) এর একটি স্নায়ুবিহীন লোমকেও স্পর্শ করতে পারেনি। পরিশেষে তাঁব শাহাদাত বরণের সঙ্গে সঙ্গে মহানবী (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খলিফাগণ কর্তৃক লালিত-পালিত ইসলামের প্রকৃত সাম্যবাদ সমাধিস্থ হল, এবং কপট কুচক্রী আমির মুয়াবিয়ার হাতে ৬৬১ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম জগতে কুখ্যাত রাজতন্ত্র জন্ম নিল।

—ওসমান গনী

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ঈদ্-উল্-ফিতর

পুণ্যাত্মা

হযরত ওসমান (রাঃ)

'দারুল কুতুব' ছিল তোমারই মাকান
মসজিদে– নববী পাশে আজো বিদ্যমান।
নবীর জামাতা ছিলে নবীর পার্শ্বেতে
আবার দাঁড়াবে পাশে রোজ হাশরেতে।

হযরত ওসমান (রাঃ)

পুণ্যময় পূতময় দুই মহাজন
যাঁদের হাতেতে হলো 'কোরআন সংকলন'।
গ্লানিহীন দুটো নাম 'বকর-ওমর'
গৌরবে সৌরভে যাঁরা আজিও অমর।
'বকর ওমর' হতে আল্লাহ্‌র কোরআন
হাতে নিলেন দানবীর হযরত ওসমান।
হেফাজতে ছিল যেটি হাফ্‌সার বারে
দিলেন ওসমান হাতে কপি করিবারে।
রাখিয়া সম্মুখে ঐ 'কোরআন সংকলন'
করিলে তামাম 'কোরআন একত্রীকরণ'।
ধৈর্যশীল ক্ষমাশীল হযরত ওসমান,
জগৎ যতদিন আছে জা'মেয়ুল কোরআন।
ধরিয়া আপন হাতে বিশুদ্ধ কোরআন
বিকৃত কোরআন যত সামনে পুড়ান।
পুণ্যশ্লোক দানবীর ছিলে আমরণ
বিশুদ্ধ কোরআন তুমি করিলে বণ্টন।
তোমার পবিত্র হাতে হলো বিতরণ
তামাম জগৎ জুড়ে এলো জাগরণ।
দয়াবান ক্ষমাবান হযরত ওসমান
তোমারই অমর দান বিশুদ্ধ কোরআন।
বর্ধিত করিবারে মদীনা মসজেদ
মানো নি কাহারো কোন জেদ্ হতে খেদ্।

বাড়াতে মদীনা বুকে নবীর মসজেদ
সম-মূল্যে করিয়াছ সবার উচ্ছেদ।
মসজেদে নববী, পবিত্র কোরআন
দুটোতেই দুধ-সম হযরত ওসমান।
দানে ধ্যানে অতুল্য এমনি ধনী
আরব তোমারে দিল উপাধি গণী।
পানি নাই মদীনাতে মরুময় ধূপ।
তোমারই প্রাণের দান 'বীরে রুমা কূপ'।
তোমার বিশাল দান 'তাবুক প্রান্তরে'
এনেছে প্রচণ্ড শান্তি নবীর অন্তরে।
মহাজ্ঞানী মহাজন মহান মহৎ
নবীর জামাতা আবার নবীর উম্মৎ।
স্তব্ধ হলেও জীবনের সব লেন-দেন
এ জগতে একজনই—'জিন্নুরায়েন্'।
সবারে পারিতে তুমি শিখাতে সংগ্রাম
ভাবিয়া জাতির কথা দূর পরিণাম,
ক্ষান্ত করিয়ে দিয়ে সহস্র সেনা
প্রাণ দিয়ে রেখে গেছো আপনার চেনা।
কলহ বিদ্বেষ-বিষ করিতে হরণ
অকাতরে মৃত্যুবাণ করিলে ববণ।
বাখিতে কেবল শুধু জাতীয় সংহতি
জাতিকে করিলে দান জীবন-আহুতি।
দেখিবারে বিশ্বজোড়া জাতীয় মিলন
হাসি মুখে করিয়াছ 'শাহাদত্' বরণ।
জাতিও তোমার দান করিবে স্মরণ
যদি না করিতে পারে জাতিরও মরণ।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
জন্মবৃত্তান্ত ও বংশপরিচয়

আজ হতে দেড় হাজার বছর পূর্বে সারা পৃথিবীর ইতিহাসে লেখাপডাব চচ৴ খুব একটা ছিল না। যা ছিল তা খুবই মামুলী গোছের। ঐ পথে আগাবাব উপকরণ বা উপায়ও খুব একটা ছিল না। তখনকার দিনের মানুষ ওটার খুব একটা প্রয়োজনও বোধ করেন নি। যেখানে কোন ইতিহাসই নাই, সেখানে জন্ম-ইতিহাস বা জন্ম-তারিখ আশা করাটাও খুব সঙ্গত না। এই সমস্ত কারণে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর নিখুঁত জন্ম-তারিখটি পাওয়াও খুব সহজ না। মানুষ সাধারণত দেশের কোন বিরাট বা নাম করা কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক ছোটখাটো ঘটনাকে মনে রাখে। ঐ রীতি আজিও সর্বকালে সর্বদেশে প্রচলিত। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর জন্ম-তারিখ সম্পর্কে ঐরূপ একটা ঘটনাকে পাওয়া যায়। বাদশাহ্ আবরাহার মক্কা আক্রমণ আরব ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। ঐ সনটি আরব জাতির নিকট 'হস্তী সন' নামে পরিচিত। যেহেতু বাদশাহ বহু হস্তী সহ আক্রমণ কবেছিলেন। এমন কি এটি পবিত্র কোরআনেও 'সুবা ফিল্' নামে প্রসিদ্ধ। এই সনেই মহানবী হযরত মহম্মদ (দঃ) জন্মগ্রহণ কবেন। সনটি ছিল ৫৭০ খ্রীস্টাব্দ। এই ঘটনাব সাত বছর পর হযরত ওসমান (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন, অর্থাৎ তাঁব জন্ম সনটি ছিল ৫৭৭ খ্রীস্টাব্দ।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর পিতার নাম ছিল আফ্ফান, মাতাব নাম উরদী বেনতে কাববাজ। তিনি ছিলেন মক্কার স্বনামধন্য কোরেশ বংশেব উমাইযা শাখার সুসন্তান। পিতা আফ্ফান আরব সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন। ধনে-জনে, মানে-যশে তাঁব প্রতিপত্তির অভাব ছিল না। দুর্ভাগ্যবশত হযবত ওসমান (রাঃ) বাল্যকালেই পিতাকে হারালেন। তখন পিতৃব্য হাকামের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হতে থাকলেন। যৌবনে স্বাধীনভাবে আপন ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করে দেশ-বিদেশে পবিভ্রমণ কবতে থাকলেন। অল্পদিনের মধ্যেই স্বর্গত পিতার স্থান অধিকার কবলেন—ধনে-জনে ও খ্যাতিতে।

মহান আল্লাহ পরম করুণাবশত ওসমানকে জন্মগত ভাবেই দুটো মহাদান দিযেছিলেন। একটি তাঁব চরিত্রগত ও গুণগত দিক, অপবটি তাঁব দেহগত দারুণ সৌন্দর্য। হযরত ওসমানকে লক্ষ্য কবে সেদিনেব আবব সমাজেব অনেকেই বলতেন—নবীবব হযবত ইউসুফ ছিলেন রূপ জগতেব প্রবাদ পুরুষ,

যদি কেউ ইউসুফের রূপলাবণ্য অবলোকন করতে চায়, সে যেন একবার ওসমানকে দেখে। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর দেহ ছিল—মধ্যমাকৃতি, নাতিদীর্ঘ, সুঠাম, বর্ণ শুভ্র, সমুজ্জ্বল, রক্তিমাভ, মুখমণ্ডল গোলাকার, ললাট উন্নত প্রশস্ত, হস্তদ্বয় প্রলম্বিত, নাক উন্নত, চক্ষুদ্বয় অত্যুজ্জ্বল, দাড়ি ঘন ও বিন্যস্ত, কেশ গ্রীবাদেশ পর্যন্ত সুশোভিত। দাঁতগুলো ছিল স্ফটিকের মত উজ্জ্বল। এককথায় একজন অসাধারণ রূপবান যুবক। চরিত্রে সত্যনিষ্ঠ ও স্বল্পভাষী, আচারে বিনীত, বিচারে ন্যায়পরায়ণ, স্বভাবে লাজুক, সাহসে বিরল। এককথায় দেহ-মনে হযরত ওসমান (রাঃ) ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ মানুষ। সমাজের অসামান্য স্নেহ ও শ্রদ্ধা তাঁর জীবনকে করেছিল ধন্য।

হযরত ওসমান (রাঃ) ও মহানবী একই কোরেশ বংশের সন্তান ছিলেন। তবে দুজন দুই শাখাতে জন্ম নিয়েছিলেন। ওসমান (রাঃ) উমাইয়া শাখাতে ও মহানবী হাশিমী শাখাতে। এই দুই শাখাতে মিল অপেক্ষা গরমিলটাই বেশি ছিল। আবদ্ মান্নাফের দুই সন্তান—শামস ও হাশিম। হাশিম কনিষ্ঠ হলেও আপন যোগ্যতার জন্য পিতার মৃত্যুর পর মক্কার বা কাবার দায়িত্বভার লাভ করলেন। শামসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র উমাইয়া উত্তরাধিকার সূত্রে নেতৃত্বের দাবী করেন। আরম্ভ হল পিতৃব্য হাশিমের সাথে কলহ। কলহ রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সূচনা করলে মক্কার নেতৃবর্গ এটাকে প্রশমিত করেন, যাতে সারা দেশ জুড়ে ভয়াবহ রক্তপাত না ঘটে। মীমাংসা হলো। এতে হাশিম পেলেন—কাবাগৃহের সংরক্ষণ ও হজযাত্রীদের ব্যবস্থাপনা এবং ভাইপো উমাইয়া পেলেন—নগরের শাসন ব্যবস্থা ও যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়।

হাশিম কাবাগৃহের ভারপ্রাপ্ত হওয়ায় সারা দেশের একজন সম্মানিত ব্যক্তিতে পরিগণিত হলেন। অধিকন্তু হজের মৌসুমে প্রচুর অর্থলাভও হত। পক্ষান্তরে পৌর-শাসনে তেমন কোন অর্থাগম হত না। যুদ্ধ- বিগ্রহ কালে-ভদ্রেও ঘটত না। সুতরাং উমাইয়া দুদিক থেকেই মার খেয়ে গেলেন—অর্থ ও সম্মান। মনের দিক থেকে উমাইয়াদের ঈর্ষা ও হিংসা বাড়তেই থাকল। এদিকে হাশিমের পুত্র আব্দুল মুত্তালিবের সময় এই ব্যবধান আরো কিছুটা বেড়ে গেল। আব্দুল মুত্তালিব নিজেও একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। এগারটি পুত্রের পিতা। আবু তালিব তারই সন্তান, আলী যাঁর নাতি, স্বয়ং মহানবীই যাঁর নাতি। তিনি নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান। এবার উমাইয়াগণ অর্থ উপার্জনের জন্য অন্য পথ অবলম্বন করলেন। দেশ-বিদেশে বাণিজ্যে মনোনিবেশ করলেন। যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কূটনীতিতেও তৎপর ছিলেন। এখানে আমরা একই বংশের দুটো ধারাকে দুদিকে লক্ষ্য করছি—হাশিমীগণ কাবার পরিবেশে

ধর্মভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন, সততা সহনশীলতা তাঁদের চরিত্রের জন্মগত ভূষণে পরিণত হল। সমগ্র দেশে শ্রদ্ধার পাত্র হিসাবে পরিগণিত হলেন। পক্ষান্তরে উমাইয়ার এক পুত্র হারবের ঘরে জন্ম নিলেন আবু সুফীয়ান, অপর পুত্র আবুল আ'সের ঘরে জন্ম নিলেন—হাকাম ও আফ্ফান, এবং আফ্ফানের ঘরে জন্ম নিলেন হযরত ওসমান (রাঃ)। এই বংশের মধ্যে কূটনীতিটাই বেশি কার্যকরী ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচুর অর্থ সমাগম হতে থাকলে তাঁদের অহমিকা ও বিলাস প্রবণতাও অত্যধিক বেড়ে যায়। কিন্তু এই বংশে হযরত ওসমান (রাঃ) ছিলেন বিরল ব্যতিক্রম স্বরূপ।

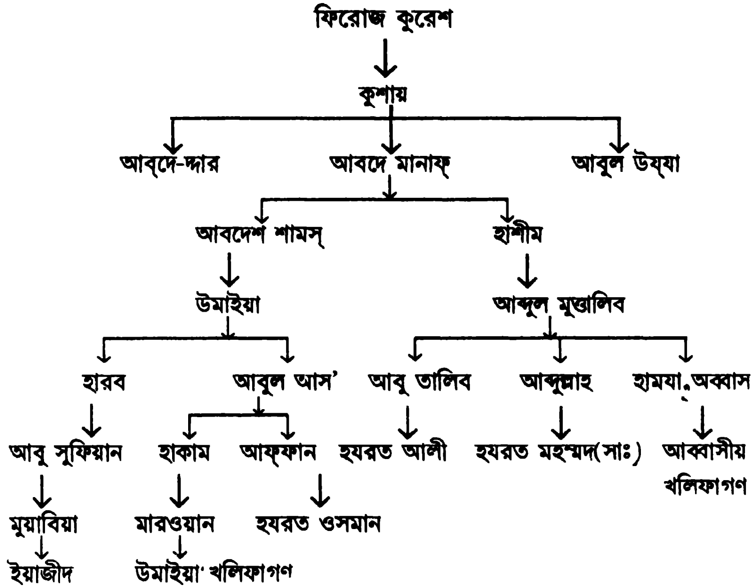
অতঃপর আমরা এখানে আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করি। হযরত আবুকরের জীবিকা ছিল ব্যবসা-ভিত্তিক ওসমানেরও তাই। আবার চরিত্রগত দিক থেকেও আমরা উভয় চরিত্রে কয়েকটি একই জিনিস লক্ষ্য করি। দুজনেই চরিত্রবান, দয়াবান, মৃদুভাষী, পরোপকারী, বিনীত, মূর্তি পূজার বিরোধী। দুজনের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো একদিন দুজনকেই পরস্পরের অত্যন্ত নিকটে এনেছিল। যার ফলে একদিন আবুবকরের মাধ্যমে ওসমান (রাঃ) ইসলামের প্রথম যুগের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে উঠলেন।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সন্তান-সন্ততি

স্ত্রী	সন্তান: কন্যা	সন্তান: পুত্র	
১। বিবি রোকাইয়া—(মহানবীর দ্বিতীয় কন্যা)	০০	১	শৈশবে মৃত্যু
২। বিবি উম্মেকুলসুম (,, তৃতীয় কন্যা)	০০	০০	
৩। বিবি ফাকতা বিনতে গিসওয়ান	০০	১	শৈশবে মৃত্যু
৪। বিবি উম্মে উমর বিনতে জানদার	১	৪	আমরু, খালেদ, আবান, ওমর, মরিয়ম
৫। বিবি ফাতেমা বিনতে ওলিদ	০০	২	ওলিদ ও সাইদ
৬। বিবি উম্মুল বিনতে আয়িনীরাহ	০০	১	আব্দুল মালেক; শৈশবে মৃত্যু
৭। বিবি রুমেলা বিনতে শায়েব	১	২	আয়েশা, উম্মে সাবান, উম্মে ওমরু
৮। বিবি নায়লা বিনতে আনহার	১	০০	মরিয়ম
*এক সাথে চারজনের বেশি স্ত্রী	৩ +	১১	
কোন সময়ই ছিল না। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর	= ১৪		জন সর্বমোট
দাসীর গর্ভজাত কোন সন্তান নাই।			

জীবনের শেষ প্রান্তে ৭৪ বছর বয়সে খ্রীস্টান মহিলা নায়লাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পূর্বেই নায়লা ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত ওসমানের ঊর্ধ্বতন বংশ তালিকা



মহানবীর আগমনের পূর্বাভাষ

স্বাগতম :

বিশ্ব ইতিহাসের প্রাচীনতম যুগ হতে আধুনিকতম কালেও আমরা একটি জিনিস লক্ষ্য করি, কোন দেশের রাজাবাদশা বা বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাশীল মানুষ যখন অন্য কোন দেশে গমন করেন, তখন তাঁর যাত্রার পূর্বে কিছু মানুষকে ঐ দেশে পাঠান হয় পরিস্থিতি ও পরিবেশকে পর্যালোচনা করে তার কাজকে কিছুটা সহজ করার জন্য বা তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য। আরবের সামাজিক অবস্থা যখন অবর্ণনীয়—পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, আচার-ব্যভিচারের মধ্যে যখন কোনরূপ পার্থক্য নাই, যখন মানুষ অবাধে সমস্ত প্রকারের পাপ করছে এবং দেব-দেবীর নিকট কিছু উপঢৌকন নিয়ে হাজির হচ্ছে, এবং সেটিকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে করছে তার সমূহ পাপ মহাপুণ্যে পরিণত হল। এই যখন আরব সমাজের অবস্থা, তখন কিছু কিছু মানুষ অন্তরে অন্তরে আর্তনাদ করছে এই পরিবেশ হতে মুক্তির জন্য।

ঠিক সেই সময় কয়েকজন মুষ্টিমেয় মানুষকে একত্রিত হতে দেখা গেল। দশ ও দেশকে মুক্তি দেওয়ার জন্য একটি আন্দোলন গড়ে তুললেন। এই চিন্তার পুরভাগে ছিলেন স্বয়ং হযরত আবুবকর এবং তাঁর পাশে ছিলেন—ওসমান, যুবায়ের, আব্দুর রহমান, সা'দ, তালহা প্রমুখ ব্যক্তিগণ। এঁদেরকে বলা হত 'হানীফ' অর্থাৎ সত্যের সন্ধানী। এই সত্যান্বেষীর দলই মহানবীকে প্রথম স্বাগতম জানিয়েছিলেন। সূর্য ওঠার পূর্বেই যেন আকাশে কিছু উজ্জ্বল নক্ষত্র ভেসে উঠল, বৃষ্টির আগমনের পূর্বেই যেন শীতল বাতাস বইতে থাকল। এরূপ অসংখ্য পূর্বাভাষ ভেসে উঠেছিল মহানবীর আগমনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তটিতে, যখন তিনি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর হিরা গুহায় প্রকাশের পূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখনই আর পাঁচজন প্রস্তুত হচ্ছিলেন তাঁকে জানাতে—স্বাগতম।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ :

আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে কেবল আরবের নয়, সমগ্র বিশ্বের সমাজ-চিত্রটি ছিল অন্যরকম। বিবর্তনশীল সমাজে সব কিছুই পরিবর্তনশীল। বিশেষ করে সেদিনের ধর্ম চেতনা ছিল একেবারেই মারাত্মক। সাধারণ মানুষ থেকে নবী পর্যন্ত রক্ষা পাননি। কখনও প্রহারে প্রাণান্ত, কখনও একেবারেই প্রাণদণ্ড। হযরত ঈসা (আঃ) হতে আরম্ভ করে সক্রেটিস, ইমাম আবু হানিফা এবং ক্ষণজন্মা পুরুষ শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব পর্যন্ত কেউই রক্ষা পাননি ধর্ম নির্যাতন হতে। আজ যেমন ব্যক্তি-মানুষের জীবনে ধর্মের স্বাধীনতা এসেছে, সেদিন এর বিন্দু বিসর্গও ছিল না। আজ যেমন সমাজের একটি সাবালিকা মেয়েও ধর্ম সম্পর্কে তার অবাধ মতামত দিতে পারে নির্ভয়ে, সেদিন কিন্তু এ কাজ করতে একটি মহাবীরকেও শতবার চিন্তা করতে হয়েছিল। কাজটি কতই কঠিন ছিল, একটি জিনিস লক্ষ্য করলে অতি সহজেই অনুমান করা যায়। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম নবী হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর নবুয়তের প্রথম তিন বছরে মাত্র চল্লিশ জন ইসলামে দীক্ষিত হতে পেরেছিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) এঁদের অন্যতম।

মহানবী প্রথম তাঁর আপন পরিবারেই ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেছিলেন। প্রথম আপন স্ত্রী বিবি খাদিজা, নাবালক হযরত আলী, আজীবন ভৃত্য যায়েদ ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরিবারের বাইরে প্রথম হযরত আবুবকর।

পরে আবুবকরের মাধ্যমে পাঁচজন আরব প্রধান হযরত ওসমান বিন আফ্ফান, যুবায়ের বিন আওয়াম, আব্দুর রহমান বিন আউফ, সা'দ বিন আবি ওক্কাস এবং তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ। এইজন্য একদিন হযরত আবুবকর বলেছিলেন—"তোমরা আমাকে আল্লাহর খলিফা বলো না, আমি আল্লাহর রসুলের খলিফা।" এখানে আরো একটি কথা অতি পরিষ্কার হয়ে গেল, স্বয়ং মহানবীকে সাধনার শত সংকটে দাঁড়িয়ে একটি একটি করে সোপান তৈরি করে ইসলামের মহাসৌধে আরোহণ করতে হয়েছিল। কোন ভেল্কী বা ম্যাজিক দেখিয়ে একদিনে বিনা আয়াশে হয়নি। আল্লাহ তাঁকে প্রভূত মোজেজা শক্তি দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তার প্রয়োগ করেন নি বললেই চলে। সব সময় বলতেন, "আমি তোমাদের মত একজন মানুষ।" কোরআন ১৮:১১০, ৪১:৬।

এই সমস্ত ঘটনা ঘটা কালে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর চিত্ত জগতেও ঘটতে থাকে এক মহা আলোড়ন। একদিন তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় শুনতে পাচ্ছেন—কে যেন বলছেন—"হে ঘুমন্ত ব্যক্তি উঠ, জাগো, দেখ—মক্কাতে আহম্মদ আগমন করেছেন।" এই ঘটনার পর হযরত ওসমান (রাঃ)-এর চিত্ত বিচলিত হয়ে উঠে। তিনি হযরত আবুবকরের সাথে মহানবীর নিকট গমন করলেন। মহানবী তাঁকে বললেন--"হে ওসমান আল্লাহর প্রেরিত সত্য গ্রহণ করো, আমি তোমাদের নবী, আমি তোমাদের পথ প্রদর্শক।" এই কথা শোনামাত্র হযরত ওসমানের চিত্ত কোন অজানা স্বর্গীয় আলোক ও অনুপ্রেরণাতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

অতঃপর আরম্ভ হলো যুগের খেলা। মহানবী মক্কার কোরেশদের বুকে আঘাত হেনেছিল ইসলামের দ্বারা। সেদিনের আরবে মক্কার কোরেশগণ ছিলেন সর্বাপেক্ষা সম্মানিত গোত্র। তাঁরাই ছিলেন মক্কার কাবা মন্দিরের মালিক। পৌত্তলিকতা ছিল তাদের বাপ-দাদার চিরাচরিত ধর্ম। মহানবীর এই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধ প্রচারে মক্কার কোরেশগণ ঘুমন্ত সিংহের ন্যায় হঠাৎ আকাশভেদী ভয়ংকর গর্জন করে উঠল। সমগ্র মক্কা কেঁপে উঠল। কোরেশদের মধ্যে দুটো গোত্র ছিল—হাশেমী ও উমাইয়া। মহানবী ছিলেন হাশেমী গোত্রের অন্তর্গত। পৌত্তলিকতার ব্যাপারে মহানবীর প্রতি আপন গোত্রে হাশেমীদের যত রাগ ছিল উমাইয়াদের ছিল তা অপেক্ষা শতগুণে বেশি। কেননা এই

দুই গোত্রের মধ্যে কোন সদ্ভাব ছিল না। তাই উমাইয়াগণ মনে করেছিলেন—যদি যে কোন ভাবে মহানবীর উত্থান ঘটে, তাহলে তা হবে উমাইয়াগণের জন্য একান্ত দুর্বিষহ ও ক্ষতিকর। যেহেতু তিনি হাশেমী গোত্রের মানুষ। অন্তর্দ্বন্দ্বের এই আভ্যন্তরীণ রহস্যটি উমাইয়াগণকে ক্ষুধার্ত বাঘ্রেব ন্যায় করে তুলেছিল। হযরত ওসমান (রাঃ) ছিলেন এই গোত্রের মানুষ। যখনই উমাইয়াগণ জানতে পারলো তাদেরই একজন ওসমান ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেছে, তখনই তারা সদলবলে ওসমান (রাঃ)-এর প্রতি নেকড়ে বাঘের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওসমান (রাঃ)-এর জীবিত চাচা গণ্যমান্য ব্যক্তি হাকামের অনুমতি পেয়ে তারা ওসমান (রাঃ)-এর প্রতি এমন কোন অত্যাচার নাই, যেটি করতে বাকি রাখল। কখন সীমাহীন নিষ্ঠুর প্রহার, কখন প্রলোভন, কখন প্রাণদণ্ডের ভীতি, কখন সেই প্রাণ অত্যাচারে ওষ্ঠাগত, কখন সবার সম্মুখে উলঙ্গ বেত্রাঘাত, কখন মক্কার পথে পথে চরম লাঞ্ছনা, কখন বিনীদ্র রজনী ধরে আবদ্ধ, কখন আফ্ফানের প্রাণপ্রিয় পুত্র ওসমান পিপাসায় মৃতপ্রায়, তবুও ওসমান (রাঃ) ইসলামের অভ্রান্ত জ্যোতিতে সদা উজ্জ্বল, সদা অম্লান, সন্তোষের চরম অনুভবে চির মহানুভব।

সেদিনের শত অত্যাচারে অবিচলিত ওসমান, অকম্পিত ওসমান, অদমিত ওসমান, অনন্যসাধারণ ওসমান পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসের মুসলিম জাহানের জিন্নুরাইন (দ্বিজ্যোতিসম্পন্ন হযরতের জামাতা) ওসমান, আশারা-ই-মোবাশশিরা(সুসংবাদ বা স্বর্গপ্রাপ্ত)ওসমান, ইসলামের পুণ্যবান তৃতীয় খলিফা ওসমান। মহানবী ইসলামের এই ধ্রুব তারকাগুলোকে সাথে নিয়ে তাঁর নবুয়তের চতুর্থ বছরে আরম্ভ করলেন ইসলামের প্রকাশ্য প্রচার। তখনকার দিনে প্রচলিত হাওয়ার বিরুদ্ধে ধর্ম সম্পর্কে কথা বলা ছিল এমনি মারাত্মক অপরাধ। তাই তখনকার দিনে নবীশ্রেষ্ঠ নবীকেও প্রকাশ্যে কথা বলার জন্য পূর্ণ তিনটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। মহানবী হঠকারিতার সাথে কোন দিনই কিছু করতেন না, স্থান-কাল-পাত্রভেদে সব কিছু ধীর ও স্থিরভাবে বিবেচনা করতেন। এবার একদিকে মহানবীর প্রকাশ্য প্রচার ও অন্যদিকে কোরেশদের প্রকাশ্য অত্যাচারের নদী অতি দুর্বার গতিতে পাশাপাশি বইতে থাকল।

বিরামবিহীন অত্যাচারে মুষ্টিমেয় প্রাণ
আকুল কণ্ঠে গাহিয়া চলে আল্লাহর জয়গান।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর বিবাহ :

এই সময় কোরেশদের আক্রোশ ও আক্রমণ ছিল তুঙ্গে। তারা মহানবীর সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করল, এমনকি মহানবীর কন্যা রোকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে তাঁদের স্বামী আতিবা ও উতাইবা বিবাহ বিচ্ছেদ করে বাবার বাড়িতে তাড়িয়ে দিল। মহানবী ও তাঁর পত্নী বিবি খাদিজা এই কাজে অত্যন্ত মনকষ্ট পেয়েছিলেন। মাত্র কতিপয় সাহাবী মহানবীকে যে যেদিকে পারছিলেন,প্রাণপণে সাহায্য করছিলেন। হযরত ওসমান এই সময় সব কিছু জেনে শুনেই কন্যা রোকাইয়াকে বিবাহ করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে মহানবী তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন—এই কাজে কতটা ঝুঁকি আছে। এতদসত্ত্বেও হযরত ওসমান নির্ভীক চিত্তে আগিয়ে গিয়ে কন্যা রোকাইয়াকে বিবাহ করে মহানবীকে কিছুটা চিন্তামুক্ত করলেন। এতে কোরেশ-কুল ওসমানের প্রতি অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। অত্যাচারের মাত্রা বহুগুণেই বেড়ে গেল।

আবিসিনিয়ায় হিজরত :

যখন অত্যাচার সীমাহীন হয়ে উঠল, মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচারে যখন বনের পশু-পক্ষীও কাঁদতে থাকল, তখন কোমল হৃদয় মহানবী তাঁর উম্মতদের অনুমতি দিলেন—অন্য কোথাও কোন দেশে হিজরত করতে। সবশেষে ঠিক হল—আবিসিনিয়া। মহানবীর অনুমতি সহ কয়েকজন পুরুষ ও কয়েকজন মহিলা আবিসিনিয়ার পথে যাত্রা করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন হযরত ওসমান ও তাঁর স্ত্রী রোকাইয়া। এঁদেরকেও পথিমধ্যে বধ করার জন্য কোরেশগণ চেষ্টার কোন কসুর করেনি। তবে ভাগ্যগুণে তাঁরা আগেই বহু দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে প্রায় নয় বছর পর তাঁরা মদীনাতে মহানবীর সাথে মিলিত হয়ে একত্রে বসবাস আরম্ভ করেন।

মদীনাতে হযরত ওসমান :

হযরত ওসমান বিবি রোকাইয়াকে নিয়ে প্রাণের দায়ে, দেশ ত্যাগ করে আবিসিনিয়াতে পৌঁছালেন। কন্যা রোকাইয়া তাঁর পিতামাতাকে মক্কায় রেখে এলেন কতকগুলো নেকড়ের সম্মুখে। দিবারাত্রি এই চিন্তা, এই ভাবনা কন্যা

রোকাইয়াকে দগ্ধ করতে থাকল। অধিকন্তু সেখানকার আবহাওয়াও তাঁর তেমন সহ্য হচ্ছিল না, আবার সংসারের অভাব অনটনও প্রায় লেগেই থাকত। নূতন দেশ, নূতন পরিবেশে হযরত ওসমানও তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যকে ভালভাবে স্থাপন করতে পারছিলেন না। সবার ঊর্ধ্বে মক্কার চিন্তা তাঁদের পাগল করে রেখেছিল। কিছুদিনের মধ্যে সংবাদ পেলেন মহানবীর একান্ত সহায়ক ও শ্রদ্ধার পাত্র আবু তালিব পরলোক গমন করেছেন। তখন তাঁদের চিন্তার ও ভাবনার কোন শেষ থাকল না। কেননা আবু তালিব ছিলেন—মহানবীর পিতা স্বরূপ এবং পুরুষকুলের শ্রেষ্ঠ সহায়ক। এই বেদনা মন হতে দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটি মর্মান্তিক দুঃসংবাদ পেলেন বিবি খাদিজার পরলোক গমনে, স্নেহময়ী মাতার মৃত্যুতে কন্যা রোকাইয়া একেবারেই বিদেশ ভূমিতে ভেঙ্গে পড়লেন। বিবি খাদিজা ছিলেন ধনবতী মহিলা। চিরদিন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটিয়েছিলেন, পরিণত বয়সে সমস্ত কিছু দান করেছিলেন ইসলামের সেবায়। সহায় সম্বলহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। সান্ত্বনা ছিল কেবলমাত্র ইসলামের সেবা করা। এই অবস্থায় কোরেশদের অমানুষিক অত্যাচার বিবি খাদিজাকে শরীরের দিক থেকে একেবারেই শেষ করে দিয়েছিল। শারীরিক ভগ্ন অবস্থায় তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। এই সমস্ত চিন্তা-ভাবনা হযরত ওসমান (রাঃ) ও বিবি রোকাইয়াকে একেবারেই চরম উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল।

মাঝে মাঝে তাঁরা কিছু লোককে আবিসিনিয়া হতে মক্কাতে পাঠাতেন পরিস্থিতি লক্ষ্য করার জন্য। যাতে তাঁরা আবার মক্কাতে ফিরে মহানবীকে সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা যে সংবাদ পেতেন, তা ছিল বড়ই ভয়াবহ, অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়তেই ছিল। ওদিকে তাঁদের ভাবনাও দিন দিন, ক্ষণে ক্ষণে বাড়তেই লাগল। সুখ, শান্তি ও স্বস্তি সবই যেন শেষ হয়ে গিয়েছিল। রাতদিন তাঁরা আল্লাহর দরবারে—সদাই আল্লাহ আল্লাহ করতেন—"কখন তোমার সাহায্যে আসবে, কখন অত্যাচার অনাচারের প্রবল বন্যা কিছুটা কমবে, কখন সত্যের আলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, কখন কোরেশকুল বুঝতে পারবে তাদের মহাভুল, কখন মজলুম নরনারী নিষ্কৃতি লাভ করবে, কখন বেদুঈন আরব নেকড়ে বাঘের মূর্তি পরিহার করবে, কখন বেলালের মত শত শত ক্রীতদাস মুসলমান মুক্তি লাভ করবে, অত্যাচারের

মহাকোপে ঘরে বাইরে সকলেই শেষ হয়ে গেল, এখন সকল অত্যাচারের একমাত্র লক্ষ্য—"মহানবী", মজলুম মহানবী, মানব-দরদী মহানবী, মহান আল্লাহর মহানবী, সমাজ সংস্কারক মহানবী, বিশ্বজগতের শেষ নবী, বিশ্বসংস্কৃতির শেষ ও শ্রেষ্ঠ সাধক। হে আল্লাহ, আমরা পারলাম না, আমরা হতাশ, আমরা আশা হত। আমরা বেদনা-ক্লিষ্ট, আমরা দেশত্যাগী, আমরা নিরাশ্রয়। হে আল্লাহ, তুমি তোমার মহান নবীকে রক্ষা করো, পথ দাও, পাথেয় দাও।"

যখন সুদূর আবিসিনিয়াতে হযরত ওসমান ও বিবি রোকাইয়া আল্লাহর দরবারে এই আকুল প্রার্থনা করছেন, তখনই মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিলেন—মক্কা ত্যাগ করতে মদীনার পথে। এবার আল্লাহর নবী তাই করলেন। মক্কা আজ নবী বিহীন হলো, হায় দুর্ভাগ্য!

মহানবী ৬১০ খ্রীস্টাব্দে নবুয়ত লাভ করে ৬২২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মক্কার মাটিতে আল্লাহর বাণী প্রচার করতে থাকেন—প্রায় ১৩ বছর। তিপান্ন বছর বয়সে জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করলেন এবং মদীনায় গমন করলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) মহানবীর কন্যাকে পত্নীরূপে বরণ করার জন্যই কোরেশদের রাগের মাত্রা তাঁর উপর একশ গুণ বেড়ে গিয়েছিল। তাই তিনি মহানবীর উপদেশ মত ৬১৪ খ্রীস্টাব্দে আবিসিনিয়াতে আশ্রয় নেন। এবং সেখানে প্রায় ৯ বছর দারুণ মনকষ্টে অতিবাহিত করার পর পুনরায় মদীনাতে মহানবীর সাথে মিলিত হন। প্রবাসে থাকাকালীন অবস্থাতে তাঁদের একটি পুত্রসন্তান জন্মে, কিন্তু শৈশবেই মারা যায়। ঐ সময় প্রায় দু শত ব্যক্তি মদীনাতে মহানবীর সাথে মিলিত হন।

মহানবী মদীনার মাটিতে কেবলমাত্র পা রেখেছেন, আ'স ও খাজরাজ গোত্রের বিবাদ চিরদিনের জন্য অবসান করলেন, ইহুদীদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করলেন, খ্রীস্টানদের সাথেও। সকলকে নিয়ে তৈরি করলেন বিশ্বের প্রথম জাতি সংঘ বা U.N.O. একটি রাষ্ট্র সংঘও তৈরি করলেন—Commonwealth. এবার তিনি মনোযোগ দেবেন আল্লাহর বাণী প্রচারে। হেনকালে দ্বিতীয় হিজরীতেই বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। কোরেশগণ ঠিক করল—মহানবীকে মদীনার মাটিতে নিরাপদে শান্তিতে তাঁর কাজ করতে দেওয়া হবে না, বরং তাঁকে জগতের বুক হতে একেবারেই সরিয়ে ফেলা হবে। মহানবী এই সংবাদ শোনামাত্র তাঁর যে কয়েকজন শিষ্য

ছিলেন, তাঁদের (৩১৩) নিয়ে বদর প্রান্তরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঠিক এই সময় বিবি রোকাইয়া মৃত্যু শয্যায় শায়িতা। তিনি আবিসিনিয়া হতেই এসেছিলেন ভগ্ন শরীরে, ভগ্ন স্বাস্থ্যে। মহানবী কন্যার এই অবস্থা দেখে জামাতা ওসমানকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করলেন, মৃতপ্রায় স্ত্রীর শয্যা পার্শ্বে থাকতে নির্দেশ দিলেন। ওসমান তাই করলেন। যুদ্ধে অন্যান্য সকলেই মহানবীর সাথে গমন করলেন। যুদ্ধ বাধল। অসম যুদ্ধ। তবুও যুদ্ধে মহানবী বিজয়ী হলেন। বাড়ি ফিরলেন যুদ্ধ জয়ের আনন্দসহ। বাড়ি ফিরে সংবাদ পেলেন—প্রিয়তম কন্যা রোকাইয়া আর ইহলোকে নাই। মহানবীর বুকে যুদ্ধ জয়ের আনন্দ চরম নিরানন্দে রূপান্তরিত হলো। হযরত ওসমান (রাঃ) বহুস্থানে বহুবার অপেক্ষা করে বলেছিলেন—"যাঁর জন্য ইসলামের প্রথম যুদ্ধে যোগদানের গৌরব হতে বঞ্চিত হলাম, তাঁকেও হারালাম। আমার এ মনোকষ্টের কোন শেষ নাই, নবী বংশের সহিত আমার আর কোন সম্পর্ক থাকল না। বদর যুদ্ধেও আমার কোন অবদান থাকল না।" মহানবী ওসমানের এই আক্ষেপ ভরা মনোকষ্টের কথা জানতে পেরে স্থির করলেন বাল-বিধবা কন্যা উম্মে কুলসুমকে তাঁর হাতে পত্নীরূপে তুলে দিতে। এবং সেই মতই কাজও করলেন। হযরত ওসমান এই বিবাহ ও মহানবীর এই তুলনাহীন মহানুভবতায় চিরদিন চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন ও নবী বংশের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারায় সীমাহীন আনন্দ পেয়েছিলেন। এই বিবাহের পর মুসলমানগণ হযরত ওসমানকে নাম দিয়েছিলেন—'জিন্নুরায়েন' অর্থাৎ যুগল নূরের অধিকারী। সেই হতে আজ অবধি হযরত ওসমানকে 'জিন্নুরায়েন ওসমান' বলা হয়ে থাকে। মহানবী হযরত ওসমান (রাঃ)-এর আচার-ব্যবহারে অত্যন্ত খুশী ছিলেন। তাই পর পর দুবার তাঁকে কন্যা দান করেছিলেন বিবাহে। এও এক চরম সৌভাগ্য!

ওহোদ যুদ্ধ: (৬২৪)

অতঃপর মহানবীর জীবনে এমন একটি যুদ্ধও ঘটেনি, যেটিতে হযরত ওসমান (রাঃ) যোগদান করেন নি। বদর যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি কোরেশদের একেবারেই হতমান ও হতবুদ্ধি করেনি, বরং তাঁদের মনের আগুনকে শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। পরাজয়ের প্রতিশোধ তাদেরকে পাগল করেছিল। তাদের পুরুষ হতে মহিলা পর্যন্ত সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল—এর যথাযথ প্রতিশোধ গ্রহণে। এমনকি বহু দুর্ধর্ষ পুরুষ ও মহিলা প্রতিজ্ঞা করেছিল—তারা এর প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্বামী, স্ত্রীর সাথে ও স্ত্রী, স্বামীর সাথে মিলিত

হবে না। কোরেশকুলের বরেণ্য নেতা আবুসুফিয়ান তিন হাজার সশস্ত্র সুশিক্ষিত বাহিনী নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওনা হল। সঙ্গে বহু মহিলা সাহায্যকারী, উৎসাহ ও উদ্দীপনা দানকারী। ওহোদ পাহাড় মদীনার ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। মহানবীর মাত্র এক হাজার সৈনিক বেশির ভাগই কেবল সাধারণ মানুষ মাত্র। তাও আবার পথিমধ্যে বিশ্বাসঘাতক আব্দুল্লাহ বিন উবাই-এর বিশ্বাসঘাতকতায় তিন শত সৈনিক মহানবীকে ত্যাগ করলো। মাত্র সাত শত মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে মহানবী তিন হাজার সশস্ত্র কোরেশদের মোকাবিলা করতে চললেন। এই যুদ্ধে তীরন্দাজদের ভুলের জন্য মুসলমানদের ভীষণভাবে আঘাত পেতে হয়েছিল, এমনকি মহানবীকেও। এই সময় হযরত ওসমান তাঁর জীবন বিপন্ন করেই মহানবীকে রক্ষা করতে এগিযেছিলেন। ইসলামেব ইতিহাসে এটা একটি দারুণ ঘটনা। যুদ্ধে মুসলমা-:দেবই পূর্ণ জয় হয়েছিল, তবে ভুলের জন্য পরিশেষে জয়-পরাজয় মিশে গিযেছিল। এটাও হয়ত মুসলমানদের প্রয়োজন ছিল।

পরিখার যুদ্ধ : (৬২৭)

এই যুদ্ধ কেন সংঘটিত হলো? ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানগণ জয়ের পর আপনাদের ভুলের জন্য মার খেয়েছিলেন। কিন্তু মার খেলেও একেবারে শেষ হযে যাননি। কোরেশ রমণীগণ তাঁদের পুরুষকুলকে ধিক্কার জানালো—তারা কি মহানবীকে জীবিত বেখে এলো? কেন তারা মদীনা পর্যন্ত ধাবিত হয়ে সকল মুসলিমদের শেষ করে এলো না। অতঃপর মক্কাব কোবেশগণ পার্শ্ববর্তী অন্যান্য সকল গোত্রগুলোকে সংবাদ দিলো মক্কাতে একত্রিত হতে। নির্দিষ্ট দিনে সকলেই একত্রিত হলো। এখানে সর্বাপেক্ষা বড় কথা মদীনার ইহুদীগণও চরম বিশ্বাসঘাতকতা সহ ঐ দিনে মক্কাব কোবেশদের সাথে যোগদান করল। সভাতে সকলেই একমত হলো—সকলে একজোটে মদীনা গমন কবত মহানবী সহ সমস্ত মুসলমানকে ধরার বুক হতে একেবাবেই নিশ্চিহ্ন কবেই তারা ক্ষান্ত হবে। এইজন্য এই যুদ্ধকে আহযাবের যুদ্ধও বলা হয়ে থাকে। আহযাব অর্থাৎ গোত্র বা দল। মক্কাব পক্ষ হতে একে আহযাবেব যুদ্ধ বলা হয়, কেননা তাবা বহুদল, বহুগোত্র একত্রিত কবেছিল। আবাব মদীনাব পক্ষ হতে একে পরিখার বা খন্দকের যুদ্ধ বলা হয। কেননা মহানবী আত্মরক্ষাব জন্য মদীনার দক্ষিণ-পূর্বে খাল খনন কবেছিলেন। এই যুদ্ধেও মক্কাব কোবেশগণকে হতমান হযে মক্কা ফিরতে

হয়েছিল। এই যুদ্ধের নামে পবিত্র কোরআনে একটি সূরাও আছে—সূবা আহ্যাব। এই ভীষণ ক্ষণে হযরত ওসমান মহানবীকে ও মুসলমানদের অভূতপূর্ব সাহায্য করেছিলেন। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য 'মহানবী গ্রন্থ'।

হোদাইবিয়ার সন্ধি ও হযরত ওসমান (রাঃ):

এই ঘটনাতে হযরত ওসমান আল্লাহর দূতের (মহানবী) দূত রূপে মক্কাতে প্রেরিত হয়েছিলেন। এবং তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করেই মহানবী অবিচলিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—অন্যায় ও অত্যাচারের যোগ্য উত্তর দেওয়া হবে। যাকে কেন্দ্র করে কোরআনে আয়াত অবতীর্ণ হয়—"বৃক্ষতলের শপথ নামে" (বাইয়াতে রিদওয়ান)। ৪৮ : ১০।

ঘটনাটি সংক্ষেপে ছিল—পরিখার যুদ্ধে ইহুদীগণ গোপনে মক্কাব কোবেশদেব সহযোগিতা করলে, যুদ্ধেব পর মহানবী তাদেব চবম বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাদের মদীনা হতে বিতাডিত করে একবার হজ করাব জন্য মনস্থ কবেন। সঙ্গে নিলেন ১৪০০ সাহাবী। কিন্তু কারো নিকট কোন রূপ যুদ্ধাস্ত্র ছিল না। কেননা উদ্দেশ্য ছিল হজপালন। এই হজ পালনের অন্য একটি কাবণও ছিল। পরপর কয়েকটি যুদ্ধ-বিগ্রহ কেটে গেল—বদর, ওহোদ, পবিখা। কোনটিতেই মুসলমানদের জয়ের কোন আশাই ছিল না। তবুও তাঁবা বিজয়ী হলেন। কে তাঁদেব বিজয়ী কবলেন, এই জিজ্ঞাসাই মহানবীকে হজ পালনে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—সবই মহান আল্লাহব দান—যার প্রকাশ্য ইঙ্গিত পবিত্র কোবআনে বহুবার দেওয়া হয়েছে—৪ : ৮০, ৮ : ১৭, ৪৮ : ১০। আল্লাহব প্রতি এই শুক্রিয়া বা কৃতজ্ঞতাবোধই মহানবীকে হজ পালনে ব্রতী কবেছিল। সুতরাং এর পেছনে অন্য কিছুই ছিল না।

মহানবী অত্যন্ত পবিত্র ও খোলামনেই হজ যাত্রায় চলছিলেন। তিনি যখন কিছুদূর অগ্রসর হলেন, তখন মক্কার কোরেশগণ জানতে পারলো—মহানবী তাঁর সাহাবী সহ সদলবলে হজ করতে আসছেন। অধিকাংশই বলে উঠল—তিনি মক্কা আক্রমণ করতে আসছেন। এবং তারা একত্রিতভাবে সিদ্ধান্ত নিল—যেমন করেই হোক মহানবীকে প্রতিরোধ করতে হবে। মক্কা প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। ওটা ছিল হজের মৌসুম। অন্যান্য নানা গোত্র ঐ সময় মক্কাতে আসতেন হজ পালন করতে। এবারও এসেছিলেন। ঐ সময় বহু উপজাতি মক্কাতে একত্রিত হতেন। এবারও হলেন। কিন্তু মহানবীকে

কেন্দ্র করে মক্কার কোরেশগণ অকারণে পরিস্থিতি ও পরিবেশকে একেবারেই বিষিয়ে তুলল। তখন উপজাতিদের দু-চার জন সর্দার মহানবীর সাথে সাক্ষাৎ করে ব্যাপারটি জানতে চাইলেন। তাঁবা মহানবীর সাথে সাক্ষাৎ করে সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পারলেন, এবং মক্কার কোরেশদেবও বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা অবুঝ। তখন উপজাতি প্রধানরা কোরেশ নেতাদেব অনুবোধ করলেন—সরাসরি মহানবীর সাথে কথা বলতে। ফলে কিছু কোরেশ নেতা মহানবীর সাথে সাক্ষাৎও করলেন, এবং মহানবী অকপট চিত্তে সব কিছু তাদের বুঝিয়ে বললেন। তারাও বুঝতে পারল। কিন্তু অধিকাংশ কোবেশ নেতা অবুঝ রয়েই গেল। তারা মহানবীকে সমূলে বিনাশ করতেই বদ্ধপরিকর ছিল।

অতঃপর মহানবী নিজেই খিরাশ নামক এক ব্যক্তিকে তাঁব মূল বক্তব্য কোরেশদের বুঝিয়ে বলার জন্য পাঠালেন। কোরেশগণ খিবাশকে কোন গুরুত্ব না দিয়েই তার উক্তিটিকে বেমালুম হজম করে দিল। আরব উপজাতিরা কোরেশদের এই নোংরামি লক্ষ্য করছিল। তারা মনে মনে বিরক্ত বোধও করছিল। ইতিমধ্যে মহানবী তাঁর দূতরূপে তাঁর জামাতা হযরত ওসমানকে পাঠালেন, হযরত ওসমান ছিলেন উমাইয়া গোত্রের গণমান্য ব্যক্তি। এই উমাইয়া গোত্রই মহানবীর সর্বাপেক্ষা বড দুশমন ছিলেন। হযরত ওসমান তাদের সাথে কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। তাঁদের সব কথা বুঝিয়ে বললেন। কিন্তু তারা ছিল চির অবুঝ। জেগে ঘুমাচ্ছিলেন। তারা হযরত ওসমানকে প্রস্তাব দিলেন—আপনি হজ পালন করুন, তওয়াফ করুন, কোন বাধা নাই, তবে মহানবীকে ও তার অন্যান্য শিষ্যদের হজ করতে দেওয়া দূরের কথা, মক্কাতে প্রবেশ করতেও দেওয়া হবে না। তখন ওসমান জানালেন—আমি মহানবীকে ও তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের বাদ দিয়ে কোন কিছুই করতে পারি না, বা করব না। তখন কোরেশ দলপতিদের রাগ সীমা ছাড়িয়ে গেল; তারা ওসমানকে বন্দী করার নির্দেশ দিলেন। এমনকি তাঁর প্রাণেরও আশঙ্কা দেখা দিল। ওসমান কিন্তু অবিচল থাকলেন। অন্যদিকে আরব উপজাতিগণ ঘটনার প্রতি তীব্র নজর রাখছিলেন। ন্যায় ও অন্যায়ের প্রতি লক্ষ্যও রাখছিলেন। সমগ্র মক্কাতে তখন তুমুল উত্তেজনা। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই মুখে—কখন কি হয়, কে বলতে পারে। কেউ বলে মহানবী আর মদীনাতে ফিরতে পারবেন না। কেউ বলে মহানবী আর মক্কাতে প্রবেশ কবতে পারবেন না, কেউ বলে—মহানবী সহজে ছাড়ার পাত্র নন।

ওদিকে মহানবীর শিবিরে প্রচার হয়ে গেছে যে হযরত ওসমানকে হত্যা করা হয়েছে। যখন এই ভয়াবহ সংবাদ মহানবীর শিবিরে পৌঁছাল, তখন মহানবী সকলকে ডাক দিলেন, সকল শিষ্য সমবেত হলেন। মহানবী এই ঘটনাতে এতই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন, তিনি সকল সাহাবীকে আপন হাতে হাত রেখে শপথ করালেন, যদি তারা নিরপরাধ ওসমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে থাকে, তাহলে আমরা এর প্রতিশোধ নেবই। তিনি এই শপথ গ্রহণ করছিলেন একটি বৃক্ষতলে। তাই পরবর্তী সময়ে বৃক্ষতলের শপথ নামে কোরআন অবতীর্ণ হয়, আয়াত ৪৮:১৮-১৯। এর মাঝে আরো একটি ঘটনা ঘটতে থাকে। আরব উপজাতিগুলো ছিল মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ। তারা মুসলমান না হলেও মহানবী যে উন্নত চরিত্রের মানুষ, একথা তাদের আদৌ অজানা ছিল না। তারা মহানবীর সৎ-উদ্দেশ্য ও কোরেশদের অসৎ-উদ্দেশ্য দুটোকেই পূর্ণভাবে অনুধাবন করেই স্থির সিদ্ধান্ত নিল এবং কোরেশদের জানিয়ে দিল যে, যদি যুদ্ধ বাধে তাহলে তারা তাদের বিশাল বাহিনীকে কোরেশদের সাথে যোগদান করতে দেবে না। আরব উপজাতিদের এই হুঁশিয়ারীতে কোরেশ নেতাদের সম্বিৎ ফিরল। তারা সন্দেহের চোখে দেখলো আরব উপজাতিদের এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের দুর্বলও ভাবলো। অধিকন্তু যখন নিরস্ত্র মহানবী ওসমান-হত্যা সম্পর্কে তাঁর স্থির সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, তখন তারা আরো আশঙ্কিত ও ভীত এবং দুর্বল হয়ে পড়ল আরব উপজাতিদের সম্পর্কে। তারা মনে করল হয়ত বা ওরা মহানবীর সাথে গোপনভাবে কোন চুক্তি সমাধা করেছে। তাই নিরস্ত্র মহানবী এতখানি দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলছেন। কিন্তু আসলে মহানবীর মনে বা পেছনে তখনও পর্যন্ত এক আল্লাহ ব্যতীত কোন কিছু ছিল না। তবে এই পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টিকারী ছিলেন একমাত্র আল্লাহ। যে পরিবেশ ও পরিস্থিতি মহানবীকে সাহায্য করল, বিজয়ী করলো বিপুলভাবে। এই পরিস্থিতিতেই কোরেশগণ তাদের ফণা নামাতে বাধ্য হয়েছিল। নচেৎ তারা এতটুকুও সন্ধি করতে সম্মত হত না।

এরই নাম মহান আল্লাহর মহাকৌশল। মানুষ মোটেই জানে না আল্লাহ কখন কার দ্বারা কোন কৌশলে কোন কাজ করিয়ে নেন। তিনি মহাকৌশলী। সকল কৌশলের উর্ধ্বে তাঁর কৌশল। কোরআন ৩:৫৪, ৮:৩০, ১৪:৪৬, ৮৬:১৫ ১৭।

দ্বীন দুনিয়ার মালিক তুমি নও শুধু এক দয়াময়
তোমার মহিমা বুঝার অতীত তোমাকে দেখি মহিমাময়।
কোন্ কৌশলে কাহার দ্বারা এই বিশ্ব করিছ চালন
মহা কুদরৎ তোমার লীলায় ফেরাউন কোলে মূসার পালন। ।
অসম্ভবও সম্ভব হল কুদরৎ তব জগৎময়।
দেখি শুধু তব শানাএলাহী কত বড় তুমি মহিমাময়,
ফেরাউন রাজে মূসার জয়। ২৮ : ৭-৯

অতঃপর আরম্ভ হলো মহানবীর সাথে কোরেশদের নূতন অধ্যায়। উপজাতিদের চাপে কোরেশকুল বাধ্য হলো হযরত ওসমানকে সসম্মানে মুক্তি দিতে ও মহানবীর সাথে আলোচনায় বসতে। অথচ মহানবী ঘুণাক্ষরেও জানতেন না, উপজাতিরা ন্যায়-অন্যায়ের ব্যবধান রক্ষা করে ন্যায়ের পক্ষে কি করছে। যাই হোক, হযরত ওসমান সশরীরে ফিরে এলেন দূতের কাজ সমাধা করে। আলোচনা আরম্ভ হলো। আলোচনায় যে সমস্ত শর্ত থাকল, তাতে লোকচক্ষুতে আপাত দৃষ্টিতে মহানবীর হার মনে হলো। কিন্তু ওতে নিহিত ছিল সুদূরপ্রসারী মহাজয়। কোরআন ৪৮ : ১। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'মহানবী'—হোদাইবিয়ার সন্ধি।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শুভক্ষণের সূত্রপাত :

হযরত ওসমানের পিতা আফ্ফানের ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলনীতি ছিল সততাভিত্তিক আদর্শ। এই আদর্শের জন্য দেশ-বিদেশে তাঁর প্রচুর সুখ্যাতি ছিল। সকল মানুষই অন্ধভাবে এই পরিবারের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে ভালবাসতেন। প্রবাদ আছে, নিজের লোকসান হলেও আফ্ফান পরিবার অপরের লোকসান চাইতেন না। এমনকি এক সময় আফ্ফানের নিকট কিছু ব্যবসায়ী কোন জিনিসের চড়া রেটে বায়না করেন। কিন্তু কয়েকদিন পর যখন মাল তুলতে এলেন, তখন ঐ জিনিসের বাজার দর খুব কম। যদিও বায়না করা ছিল পূর্ব দর অনুপাতে। কিন্তু আফ্ফান তাদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে বর্তমান দরেই মালগুলো বিক্রি করলেন। আরব ঐতিহাসিকরা পর্যন্ত আফ্ফান পরিবারের ঐ সুনাম লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কথায় আছে, পিতার পুণ্যে পুত্রের পুণ্য। পরবর্তী জীবনে সুযোগ্য পুত্র ওসমান ঐ সুনামের ফসল তুলতে পূর্ণ সক্ষম হয়েছিলেন। তবে নিজেও ছিলেন পিতার পূর্ণ অনুসারী।

আবিসিনিয়াতে নানা কারণে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা করতে না পারলেও যখনই ওসমান মদীনার মাটিতে পা দিলেন, মনের সমস্ত জড়তা দূর হলো, মহানবীকে নিকটে পেয়ে তাঁর শক্তি, সাহস, উৎসাহ ও উদ্দীপনা শতগুণে বেড়ে গেল। পুরোদামে আপন ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ওসমান মদীনার বুকে একজন ধনী ব্যক্তি বলে পরিগণিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে আপন সহজাত স্বভাবানুযায়ী দু হাতে দান-খয়রাতও আরম্ভ করলেন।

বীরে রুমা ওসমান (রাঃ)-এর অক্ষয় কীর্তি :

আরব মরুভূমির দেশ, মরূদ্যানের দেশ, পানির কষ্ট লেগেই থাকত। ওসমান যখন মদীনাতে পৌঁছলেন তখন তাঁর চোখে একটি জিনিস সর্বাপেক্ষা বেশি কষ্টদায়ক মনে হয়েছিল সেটি পানির কষ্ট। তিনি মনে মনে আল্লাহ্‌র নিকট কাতর প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—যদি কোন দিন আল্লাহ্ তাঁকে সামর্থ্য দেন, তাহলে তিনি গরিব মুসলমানদের জল-কষ্ট দূর করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলে তিনি কালবিলম্ব না করেই ইহুদীদের বীরে রুমা কূপের অর্ধেক অংশ খরিদ করে মুসলমানদের জল-কষ্ট দূর করেন। কিন্তু গোলমাল দেখা দিল। ইহুদীগণ খুবই চতুর জাতি। খরিদ করার পর ঐ কূপটির শর্ত ছিল—একদিন ইহুদীগণ এবং পরের দিন মুসলমানগণ পানি পাবেন। কিন্তু ইহুদীগণ এমনভাবে পানি তুলে নিতেন, পরদিন কিছুই থাকত না। তখন ওসমান ইহুদীদের নিকট হতে প্রচুর পয়সার বিনিময়ে সম্পূর্ণ কূপটি ক্রয় করে মুসলমানদের নামে ওয়াক্‌ফ করে দিলেন। ঐ সময়ে এক সাথে এত বেশি সংখ্যক মুসলমান এত বেশি উপকৃত হয়েছিলেন যে, ঐ সময় ইসলামের ইতিহাসে বীরে রুমার কোন বিকল্পই ছিল না। মহানুভব ওসমান মুসলমানদের উপকারে ঐ সময় নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। স্বয়ং মহানবী ওসমানের এই অযাচিত কাজে অত্যন্ত খুশী হয়েই তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন। এবং ওসমানও মদীনার সমাজে এক সম্মানিত আসন লাভ করেন। তাঁর পরবর্তী জীবনও ছিল অত্যন্ত সম্ভবনাময় ও শালীনতাপূর্ণ।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর গনী উপাধি লাভ :

নবম হিজরী, ৬৩১ খ্রীস্টাব্দে, বিশাল রোমান বাহিনী মদীনা আক্রমণের জন্য সিরিয়ার পথে প্রস্তুত। একথা মহানবীর কর্ণগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর চির স্বভাবজাত শক্তি নিয়ে সকলকে ডাক দিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল।

বালুকারাশি চারিদিকে ধু ধু করছে, দিক-দিগন্তে লু-হাওয়া বইছে। অধিকন্তু সর্বত্র জলের অভাব। গাছের ফলগুলোর পাকার মৌসুম এসে গেছে, এই সময় সাধারণত আরবগণ কোথাও বের হয় না। দুটি কারণে—প্রচণ্ড গরম ও জলাভাব, দ্বিতীয় সারা বছরের আহারের সংস্থান ফলগুলো পেকে আসে, ওগুলোকে ঘরে আনা। এই সমস্ত বিবিধ কারণে তারা কোন যুদ্ধবিগ্রহে যাওয়া তো দূরের কথা, ঘরের বাইরে যেতেও ইচ্ছুক ছিল না। কিন্তু মহানবীর মক্কা বিজয়ের পর সমগ্র আরব ভূমিতে এমন একটি মানুষও ছিল না, যে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কোন কথার প্রতিবাদ করে। সুতরাং মহানবীর ডাক পাওয়া মাত্র পিপীলিকার পালের মত মানুষ দলে দলে মদীনাতে হাজির হতে আরম্ভ করলো। পদাতিক, অশ্বারোহী, উষ্ট্র-আরোহী, তীরন্দাজ সবে মিলে চল্লিশ হাজার।

এখন মহানবী একটি কঠিন সমস্যায় পড়লেন। মানুষ মানুষের ভালবাসায় প্রাণ দিতে পারে। কিন্তু সামর্থ্য না থাকলে অর্থ দেবে কি করে। গরিব মুসলমানগণ প্রাণ দিতে আজ প্রস্তুত। কিন্তু তাদের পরিচালনা করতে এই বিশাল বাহিনীর অর্থ জোগাবে কে। নিরুপায় মহানবী তাঁর সকল উম্মাৎকে আহ্বান জানালেন—"তোমরা যে যা পারো আমাকে সাহায্য করো আল্লাহর পথে।" ছোট বড় সকলেই এগিয়ে এলেন। যার যা শক্তিতে কুলালো সাহায্য করলেন। যে মহিলার একটিমাত্র অলংকার, তাও তিনি মহানবীর হাতে তুলে দিয়ে ধন্য হলেন। মহানবী এই যুদ্ধের গুরুত্ব সকলকে এমনভাবে বুঝিয়ে দিলেন, সকলেই তখন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠল। দুর্বল-অন্ধ-খোঁড়া-নাবালক, মহিলা সকলেই যেন যুদ্ধে যোগদান করে শহীদের মর্যাদা লাভ করতে চায়। মহানবীর আহ্বান ছিল এমনি আন্তরিক, এমনি অনুভূতিময়—এমনি আল্লাহময়, যেন তাঁর একটি বার আহ্বানে ও আবেদনে বনের জীবজন্তুও সাড়া দিয়ে উঠত। মহানবী ছিলেন এই জগতের শ্রেষ্ঠতম মর্মস্পর্শী মানুষ। সবাই স্থান পেয়েছিল তাঁর অন্তরে, তাই তাঁর নিকট কারো কোন অন্তরায় বলে কিছু ছিল না। তিনি ছিলেন তাঁর আপন অন্তরে এমনি অকৃত্রিম।

বিশাল বাহিনীর জন্য বিপুল সম্ভার গড়ে উঠল। হযরত ওমর তাঁর সমস্ত সম্পদের অর্ধেক এনে হাজির করলেন মহানবীর নিকট। হযরত আবুবকর তাঁর যা কিছুই ছিল, সবই এনে মহানবীর সমীপে হাজির করলেন। হযরত ওসমান এক হাজার উট, সত্তরটি অশ্ব এবং নগদ এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দান করলেন। মহানবী অত্যন্ত খুশী হয়ে বলে উঠলেন—'ওসমান তুমি গনী। আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দেবেন।' সেই হতে হযরত ওসমান আজও

'ওসমান গনী' নামে জগদ্বিখ্যাত। বিপুল সম্পদও কোন মানুষকেই ইতিহাসে বেশি দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। তবে সামান্য সম্পদের সদ্ব্যবহারও মানুষকে এমন অমরত্ব দান করতে পারে। যা মহাকালও কোন দিন কেড়ে নিতে পারে না। হযরত ওসমান গনী সেই অমরত্বের অধিকারী, সেই অমর মানুষ, সেই জগদ্বরেণ্য দাতা, সেই দয়াশীল দীনের কাণ্ডারী।

তাবুকে রোমান শাসনকর্তার আত্মসমর্পণ :

ভরা গ্রীষ্ম, নিদারুণ গরম, ধূ ধূ বালুকারাশি মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড্য মাথার উপর যেন অগ্নি বর্ষণ করছে। এই ভয়াবহ উত্তপ্ত আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছেন—নবী মহম্মদ তাঁর ৪০ হাজার শিষ্যকে নিয়ে রোমান বাহিনীর মোকাবিলা করতে। এই প্রচণ্ড গরমে আল্লাহর নবী সকলকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হতে থাকলেন। হাতে যাঁর ইসলামের শান্তি-পতাকা, মুখে যার কলমা তৈয়ব, সেই নবী মরুভূমির পর মরুভূমি অতিক্রম করতে করতে 'তাবুক' নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে দেখলেন কোথাও কোন রোমান বাহিনীর সাড়া শব্দ নাই। রোমান সেনাপতি যখন জানতে পেরেছিল ৪০ হাজার আত্মোৎসর্গী মুসলিম শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে নবী মহম্মদ (দঃ) এগিয়ে আসছেন তাদের অন্যায় গতিকে অবরোধ করতে, হীন অভিযানকে হতভম্ব করতে, সঙ্গে আরো অসংখ্য বেদুঈন। এই সত্য সংবাদে ভীরু রোমান বাহিনী পলায়ন করেছিল। মহানবী সকলকে নিয়ে তাবুকে শিবির স্থাপন করলেন। অতঃপর রোমান বাহিনীর পক্ষ হতে ক্ষুদ্র একটি প্রতিনিধি দল মহানবীর সাক্ষাৎপ্রার্থী হলে তিনি তাঁর সহজাত ও স্বভাবজাত চরিত্রানুযায়ী তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। ক্ষুদ্র দলটি মহানবীর সাক্ষাতে আশাতীত সুন্দর ব্যবহারে অভিভূত হয়ে রোমান শাসনকর্তার নিকট ফিরে গেল। তখন বিনা দ্বিধায়, বিনা বাধায় স্বয়ং রোমান শাসনকর্তা জুহান্না-বিন্-রুবা মহানবীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর প্রজারূপে কিছু করদানে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়ে সন্ধির প্রস্তাব দিলে সন্ধিপ্রিয় মহানবী সেটাকে সাদরে বরণ করে রোমানদের সম্পত্তি ও ধর্মে কোনরূপ আঘাত না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মদীনার পথে প্রত্যাবর্তন করলেন বিজয়ী বেশে।

হযরত আলীর বিবাহে ওসমানের বদান্যতা :

ফাতেমা বিবির সাথে হযরত আলীর বিবাহে দরিদ্র আলীর জন্য বিবাহের খরচ বহন করতে তাঁর একমাত্র বর্মটি বিক্রি করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তিনি তাঁর বর্মটিকে হযরত ওসমানের নিকট বিক্রি কবার প্রস্তাব দিলে ওসমান সমস্ত ঘটনাটি জানলেন, কি জন্য বা কেন আলী তাঁর একমাত্র

যুদ্ধ-বর্মটিকে বিক্রি করছেন। বর্মটির দাম হলো চার শত ষাট দেরহাম। হযরত ওসমান হযরত আলীকে সমগ্র দাম মিটিয়ে দিলে আলী তাঁর বর্মটি ওসমানকে প্রদান করত প্রস্থান করতে প্রস্তুত হলে ওসমান আলীকে অত্যন্ত ভালবাসার সাথে দাঁড়াতে বললেন। অতঃপর আলী শ্রদ্ধাভরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষারত অবস্থায় চিন্তা করছেন—কি জানি, মূল্য কি বেশি হয়ে গেল, কি জানি উনি কি বর্মটিকে ক্রয় করতে দ্বিধাবোধ করছেন; আলী যখন এই সমস্ত নানা দুর্ভাবনাময় চিন্তা করছেন, হেনকালে মিষ্টভাষী, মৃদু ভাষী অমায়িক হযরত ওসমান বলে উঠলেন—"হে খাইবার বিজয়ী বীর, হে আসাদুল্লাহ—আল্লাহর সিংহ, হে আবু তালিবের প্রিয় পুত্র, হে মহানবীর একান্ত স্নেহধন্য মহাবীর মহাজ্ঞানী, হে জ্ঞান জগতের দরজা, হে মহানবীর ভাবী প্রিয় জামাতা, হে মুসলিম জাহানের রমণীকুলের সম্রাজ্ঞী বিবি ফাতেমার ভাবী স্বনামধন্য স্বামী, এই অতুলনীয় বর্মটি একমাত্র তোমারই মত বীরের অঙ্গে শোভা পায়, আমি এটিকে তোমাকে সসম্মানে স্নেহভরে দান করলাম।" মহানবী এই কথা শুনে কতই না খুশি হয়েছিলেন। এই সমস্ত খ্যাত-অখ্যাত বহু দানের জন্য হযরত ওসমান মহানবীর নিকট হতেই পেয়েছিলেন—গনী উপাধি। আজও তিনি মুসলিম জাহানের অতি প্রিয় 'ওসমান গনী'।

উম্মে কুলসুমের মৃত্যু :

উম্মে কুলসুমের জীবন সন্ধ্যা এবার যেন ঘনিয়ে আসছে। এই তাবুক অভিযানের বছরেই হযরত ওসমান গনী হারালেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নী—মহানবীর স্নেহধন্যা কন্যা বিবি উম্মে কুলসুমকে। এই পত্নী বিয়োগে তাঁর দুঃখ ও বেদনার যেন কোন শেষ ছিল না। তিনি অত্যন্ত শোকাভিভূত অবস্থায় বলেছিলেন—"নবী বংশের সাথে আমার শেষ বন্ধনটুকুও ছিন্ন হয়ে গেল।"এই বিবাহ শুধু মাত্র একটি বিবাহই ছিল না। ইহা ছিল নবী বংশের সাথে তাঁর এক মহান সেতুবন্ধন। এই মৃত্যু সেই মহান সেতুটাকে একেবারেই চূর্ণ করে দিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল মহান ওসমানের হৃদয়টিকেও। এই মৃত্যু শোক হযরত ওসমান তাঁর সমগ্র জীবনেও ভুলতে পারেন নি। হযরত ওসমান এমনি অমায়িক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, স্বয়ং মহানবী স্নেহময়ী কন্যা উম্মে কুলসুমের মৃত্যুতে বলেছিলেন—"আমার যদি অন্য কোন বিবাহযোগ্যা কন্যা থাকত, তাহলে তাকেও আমি ওসমানের হাতে তুলে দিতাম।" মহানবীর এই কথা হযরত ওসমানকে সারাজীবন বহু সান্ত্বনা দান করেছিল। ইসলামের ইতিহাসে ওসমানের অমায়িকতা চির প্রবাদতুল্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত ওসমানের খিলাফত লাভ

ইসলাম জগতের সর্বাপেক্ষা বড় বিপদ :

মহানবীর তিরোধানের পর ইসলাম জগতের আজ পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষতি ও বড় বিপদ ছিল—ফারুকে আজম হযরত ওমর ফারুকের অতি অতর্কিত জীবনাবসান। আজ পর্যন্ত ইসলাম জগতের উপর এতবড় কোন বিপদ আসেনি। এই বিপদই যেন ইসলাম জগতের অগ্রগতিকে বিপর্যস্ত করেছিল। ৬১০ খ্রীঃ ইসলামের যে অমিয়বাণী একদিন মহানবীর উপর নবুওত বা ঐশীবাণী রূপে অবতীর্ণ হয়েছিল; ৬৩২ খ্রীঃ মহানবীর তিরোধানে তা আঘাতপ্রাপ্ত হল। এবং ৬৪৪ খ্রীঃ হযরত ওমর ফারুকের পরলোক গমনে তা আরো ত্বরান্বিত হল। তাই ৬১০ হতে ৬৪৪ খ্রীঃ সময়কাল ছিল ইসলামের গৌরবময় যুগ। পরে ৬৪৪-৬৬১ খ্রীঃ অবধি (ওসমান ও আলীর যুগ) শ্লথগতিতে ঐ ধারা অব্যাহত ছিল। এর পর খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ শেষ হলে ইসলামের গৌরবময় যুগের অবসান হয়। অতঃপর ৬৬১ খ্রীঃ হতে আরম্ভ হল ইসলামের নামে মুসলিম যুগ। কেউ ভুলেও যেন এই মুসলিম যুগকে ইসলামের যুগ বলে পবিত্র ইসলামকে কলঙ্কিত না করেন।

বিশিষ্ট সাত ব্যক্তি :

স্বয়ং মহানবী তাঁর তিরোধান কালে কাউকেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যাননি। জনগণের উপর ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে তাঁর একান্ত অনুচর হযরত আবুবকরও ঐ পথই অবলম্বন করলেন, তবে একটু সরে এলেন, অর্থাৎ আপন ব্যক্তি মতামতটিকে জীবনের বিদায় বেলায় জনগণকে জানিয়ে গেলেন। মহানবী তাও করেন নি। এটা ছিল তাঁর ব্যক্তি অধিকার। তাই এতে কোন রূপ অন্যায় কিছু দেখা যায় না। অন্যদিকে জনগণও তাঁর অন্তিম শয়নে জানতে চেয়েছিল—তাঁর অমূল্য মতামত। তিনি তাঁর ব্যক্তি মতামত জানিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার দিয়েছিলেন জনগণের উপর। হযরত ওমর যখন গুরুতর আঘাতে জীবনের আশা ছেড়ে দিলেন, যখন বুঝতে পারলেন—জীবন-দীপ নির্বাপিত হতে

আর বেশি দেরি নাই, যখন মুসলিম জাহানের ভাবী কাণ্ডারী সম্পর্কে বড়ই বিব্রত বোধ করতে থাকলেন, যখন ইসলামের পুত পবিত্র পতাকা কার হাতে তুলে দেবেন এই চিন্তায় অধীর হয়ে উঠলেন, তখন তাঁর মনে একটি কথা বার বার উঁকি মারতে থাকল। ইসলামের গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে ইসলামকে বাঁচাতে হবে। এই চিন্তা ভাবনা নিয়েই বিগত প্রথম খলিফা আবুবকরের পথ অনুসরণ করে প্রথম বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফকে ডেকে পাঠালেন, জানতে চাইলেন—তিনি খলিফা হতে সম্মত আছেন কিনা। তাঁর ইচ্ছা ছিল—তিনি যদি সম্মত থাকতেন, তাহলে তিনিও আবুবকরের মত তাঁর আপন ব্যক্তি মতামতকে প্রকাশ করে যেতেন। কিন্তু আব্দুর রহমান সরল ভাষায় সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন—তিনি খলিফা পদের গুরু দায়িত্ব নিতে সম্মত নন। তখন খলিফা ওমরের চোখে আর একাকী কোন যোগ্য ব্যক্তি থাকল না, তাই তিনি আব্দুর রহমানকেই ভার দিলেন—সাত জনের একটি কমিটি করে খলিফা পদের সিদ্ধান্ত নিতে। ঐ সাত জন ছিলেন—১। হযরত ওসমান, ২। হযরত আলী, ৩। হযরত যুবাইর, ৪। হযরত তালহা, ৫। হযরত সা'দ, ৬। হযরত আব্দুর রহমান, ৭। হযরত আব্দুল্লাহ্।

হযরত সা'দ প্রথম দিকে এই নির্বাচনী শুরার (মজলিস) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। যখন খলিফা ওমরের দেওয়া নির্ধারিত তিনদিন সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু খলিফা পদের কোন মীমাংসা হলো না, তখন তিনি হযরত সা'দের নামও জুড়ে দিলেন। পরে এই বিশিষ্ট ছয় জন সাহাবী খলিফা ওমরকে অনুরোধ করেন—তাঁর গুণবান পুত্র আব্দুল্লাহ্‌কেও ঐ মজলিসের অন্তর্ভুক্ত করতে। খলিফা সম্মত হলেন ঐ শর্তে যে আব্দুল্লাহ্ মতামত প্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু খলিফা পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবে না। কিভাবে স্বজন পোষণ পরিত্যাগ করতে হয়, মৃত্যু শয্যায় শায়িত খলিফা ওমর বিশ্ব রাজনীতিবিদদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। এই সাতজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—হযরত ওসমান ও হযরত আলী মহানবীর জামাতা, হযরত যুবাইর হযরত আবুবকরের জামাতা, বিবি আসমার স্বামী, হযরত সা'দ, পারস্য বিজয়ী বীর সেনাপতি। হযরত তালহা মহানবীর নিকটতম সাহাবা, হযরত আব্দুর রহমান এবং খলিফা ওমরের পুত্র আব্দুল্লাহ্ খিলাফতের দাবীদারহীন বিরল বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। এই সাত জনের মধ্যে আব্দুর রহমান ছিলেন নির্বাচনী সভার সভাপতি স্বরূপ। খলিফা ওমর যখন বুঝতে পারলেন কাজ খুব একটা দ্রুতগতিতে এগাচ্ছে না, তখন তিনি কাজটিকে গতিময় করার জন্য মে'কাব

নামক এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ঐ সভার সম্পাদক রূপে নির্বাচিত করলেন। এই মে'কাবই কাজটিকে ত্বরান্বিত করলেন।

অতঃপর আব্দুর রহমান নিজেকে ও আব্দুল্লাহকে বাদ দিয়ে বাকি পাঁচজনের প্রত্যেকের নিকট পৃথক পৃথকভাবে একটা কথা অতি পরিষ্কার ভাবে জানতে চাইলেন। প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করলেন—তিনি যদি খলিফা মনোনীত হতে না পারেন, তাহলে তিনি অন্যজন কাকে খলিফা পদের বেশি যোগ্য বলে মনে করেন। প্রত্যেকেই পাশাপাশি দুটো নাম বললেন—ওসমান ও আলী। অতঃপর ওসমান ও আলীকে পৃথক পৃথক ভাবে ঐ একই কথা জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উত্তর দিলেন—একজন অন্যজনের নামকে সমর্থন করে। অর্থাৎ ওসমান আলীকে সমর্থন করলেন, ও আলী ওসমানকে সমর্থন জানালেন। অতঃপর দেখা গেল পাঁচজনের তিনজন ওসমানকে এবং দুজন আলীকে সমর্থন করলেন। তখন আব্দুর রহমান প্রথম আলীকে যাচাই করলেন খলিফা পদের জন্য। কিন্তু সকলের সম্মুখে তাঁর ইতস্তত ও ধর্মভীরু ভাব দেখে তিনি ভাবলেন এই ধর্মভীরু ও অত্যন্ত নম্র ব্যক্তি দ্বারা খলিফার গুরুদায়িত্ব চালান সম্ভব নয়। তখন তিনি ঐ একইভাবে সকলেরই সম্মুখে ওসমানকেও যাচাই করলেন খলিফা পদের জন্য। ওসমান অত্যন্ত মনোবল ও দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন। এতে জনসাধারণ খুবই মুগ্ধ হয়ে উঠলে আব্দুর রহমান তাঁকে ইসলাম জগতের তৃতীয় খলিফা বলে ঘোষণা করেন। সভা মাঝে আলীর লোকজন শঠতা—শঠতা বলে আওয়াজ তুললে, আব্দুর রহমান আলীকে বুঝিয়ে দিলেন। জ্ঞানী আলী আর কোনরূপ বাকবিতণ্ডা না বাড়িয়ে ওসমানের খিলাফতকে সম্মান জানালেন। এইভাবে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খিলাফত লাভের পর্ব চুকে গেলে। হযরত ওসমান মসজিদ-ই-নববীতে একটি ভাষণ দান করেন। যে ভাষণটিতে বিগত খলিফা ওমরের তেজস্বিতা ও তাঁর আপন নরম চরিত্রের কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন।

যাই হোক, ৬৭ বছর বয়সে ওসমানের খিলাফত লাভে তাঁর বংশ উমাইয়াগণ অত্যন্ত খুশী হয়েছিল। অপর পক্ষে আলীর বংশ হাশিমী গোত্র অনেকটা ম্রিয়মান ও নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। ইসলামের প্রথম দুই খলিফা নির্বাচনে এইরূপ একটা ভাব মোটেই পরিলক্ষিত হয়নি। এখানেই প্রমাণ হয়েছিল ইসলামের খাঁটি সোনার যুগ শেষ হয়ে গেল।

হযরত ওসমানের খিলাফতের সূচনাপর্ব

২৩ বছরের তাৎপর্য :

জিলহাজ মাস অতিক্রান্ত হলো। ২৩ হিজরীর শেষ মাস শেষদিন শেষ হলো। আরবী বছরের প্রথম মাস মহররম এসে গেল। এই দিন হযরত ওমরের জীবনাবসানে তার খিলাফত কাল শেষ হওয়ার সাথে সাথে ইসলাম হারাল তার গরিমাময় গরীয়ান রূপ ও মহিমাময় মহীয়ান ছবি। মহানবীর নবুয়ত কাল ছিল সর্বমোট ২৩ বছর। আবার এই ২৩ বছর বা ২৩ হিজরীতেই শেষ হলো নবুয়ত কালের শ্রেষ্ঠ ফসল ও সোনার ফসলের যুগ। কোন অজানা কারণে কে জানে, নিয়তি যেন বেঁধে দিয়েছিল নবুয়তের সময় সীমা ২৩ বছর। আবার নবুয়তের সোনার ফসলের সময় সীমাও বেঁধে দিল সেই ২৩ বছর। মক্কার মাটিতে ৬১০ খ্রীস্টাব্দে নবুয়তের শুভ সূচনা, মদীনার বুকে ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে একটানা ২৩ বছর পর পূর্ণতা লাভ। মদীনার বুকে ৬২২ খ্রীস্টাব্দে আরম্ভ হয়েছিল ইসলামের সোনার ক্ষেতে সোনার ফসল। একাদিক্রমে ২৩ বছর ইসলাম তার সোনার ফসল বিতরণ করার পর ৬৪৪ খ্রীস্টাব্দে হযরত ওমর ফারুকের জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ক্ষেত হারাল তার সোনার ফসলের উর্বরতা শক্তি ও সৌন্দর্য, গর্ব ও গরিমা। ইসলামের সোনার ক্ষেত তৈরি হয়েছিল মহানবীর জীবনে নবুয়তের একটানা ২৩ বছরে। আবার ঠিক ২৩ বছর সোনার ফসল দান করে ক্ষেত যেন তার ক্ষমতাকে সংযত করল। হক কথা বলতে গেলে—ইসলামের সোনার ক্ষেত সোনার ক্ষেতই আছে। নাই শুধু সেই কৃষক—'আবুবকর ও ওমর'।

'বনে যদি ফুটল কুসুম—
নাই কেন রে পাখী।'

বিচার সঙ্কট :

৬৪৪ খ্রীস্টাব্দে ৭ই নভেম্বর হযরত ওসমান খিলাফতের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তৃতীয় দিনে শুক্রবার মসজিদ-ই-নববীতে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। ওসমান ছিলেন অত্যন্ত লাজুক চরিত্রের মানুষ। অতি নম্র, অতি বিনয়ী, অতি স্বল্পভাষী মানুষ। তাই প্রথম দিনের বক্তৃতাতে অনভ্যস্ত ওসমান মাত্র কয়েকটি কথা বলেই ভাষণ শেষ করেছিলেন। অকপট চিত্তে ভাষণে স্বীকার করেছিলেন—তিনি ভাষণ দানের উপযুক্ত লোক নন, ধীরে ধীরে অভ্যাস করে নেবেন। তিনি বলেছিলেন—"ওমরের মত মানুষ চিরদিনই

বিরল, ঐ লোক আমাদের মধ্যে আর কোথায় পাবো।'' তাই শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনাতে তিনি পুরাপুরি ওমরকেই অনুসরণ করেছিলেন। তবে একথাও স্মরণ রাখতে হবে—অনুসরণ কোন দিনই উপমা সৃষ্টি করতে পারে না। কেননা সৃষ্টি চিরদিনই সৃষ্টি। অনুসরণ চিরকালই অনুসরণ। এই কারণেই বোধ হয় তিনি তাঁর খিলাফতেব মধ্যগগনে হারিয়েছিলেন লৌহ মানব ওমরের পথ। নানা কারণে মধ্যগগনে-মাঝপথে অনুসরণ সত্যের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়েছিল।

উবাইদুল্লার বিচার :

উবাইদুল্লাহ্ ছিলেন খলিফা ওমরেব কনিষ্ঠ পুত্র। যেদিন খলিফা আততায়ীর আঘাতের জন্য মারা গেলেন, সেই দিনই উবাইদুল্লাহ্ তিনজনকে বধ করেন—হরমুজান, জুফাইনা ও ফিরোজের কন্যা। যেদিন হতভাগা ফিরোজ খলিফাকে অতর্কিতে আঘাত করে, তার পূর্ব দিন উবাইদুল্লাহ ঐ তিনজনকে সন্ধ্যাবেলায় একটি নির্জন স্থানে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে ফিস্‌ফাস করতে দেখে কৌতুহলবশত তাদের নিকটে গিয়া হাজির হন। সঙ্গে সঙ্গে তারা উঠে দাঁড়ালে একটি তীক্ষ্ণ ধারাল ছুরি নিচে পড়ে যায়। উবাইদুল্লাহ্ ছুরিটিকে দেখে জিজ্ঞাসা করেন—এটা দ্বারা কি করবে। তারা আবোল তাবোল একটি উত্তর দেয়। তাদের উত্তরে উবাইদুল্লাহ্ খুশী হতে পারলেন না। কিন্তু চলে এলেন। তবে তাঁর মনে হলো—এরা কোন নিন্দনীয় কাজ করার জন্য এখানে একত্রিত হয়ে পরামর্শ বা ষড়যন্ত্র করছে। পরদিনই অঘটন ঘটে গেল। হত্যাকারী ফিরোজ ধৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মহত্যা করে। কিন্তু তার ছুরিটিকে উদ্ধার করা গেল এবং উবাইদুল্লাহ ঐ ছুরিটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন—ঐ ছুরিটি সহ তিনি গতকাল ঐ তিনজনকে একত্রে পরামর্শ কবতে দেখেছেন। ফলে উবাইদুল্লাহর আর কোনরূপ সংশয়ই থাকল না। পিতার হত্যাকারী কে বা কারা। তাই পিতার পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গেই চরম রাগ বশত বিচারের অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে পড়েছিলেন ওদের হত্যা করতে। এবং তাদের হত্যা করলেন।

কিন্তু এই হত্যা বিচার ব্যবস্থানুযায়ী হয়নি। তাই কথা উঠলো উবাইদুল্লাহ্‌র বিচার হওয়া প্রয়োজন। খলিফা ওসমান খিলাফতে বসামাত্রই এই মহাসঙ্কটে পড়লেন। নানা জনে নানা কথা বলতে লাগল। খলিফা অত্যন্ত ধীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি প্রবীণ সাহাবীদের ডাক দিলেন, সবার সাথে খোলামনে

আলোচনা করলেন। ঘটনার স্থির বিন্দুতে পৌঁছতে চেষ্টা করলেন। অতঃপর লক্ষ্য করলেন—বিচারাসনে বসে বিচার করলেও ওদের প্রাণদণ্ডই হতো। তবে প্রাণদণ্ডটা বিচারের পূর্বেই হয়ে গেছে। তিনি লক্ষ্য করলেন—কাজটা ঠিকই হয়েছে। তবে কাজের পথ ও পদ্ধতিটা ঠিক হয়নি। এই পথ ও পদ্ধতিটা উবাইদুল্লাহ নিজ হাতে নেওয়ার জন্য খলিফা তাঁর অর্থদণ্ড করলেন। এবং ঐ অর্থদণ্ডটা নিজেই দিয়ে দিলেন। হযরত ওসমানের এই সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিতে সকলেই খুশী হয়েছিলেন।

ভাতাবৃদ্ধি :

হযরত ওসমান খলিফা ওমরকে অনুসরণ করেছিলেন ঠিকই। তবে চরিত্রের দিক থেকে দুজন দুই মেরুতে দাঁড়িয়েছিলেন। ওমর ছিলেন খুবই কঠোর বা কঠিন চরিত্রের মানুষ, এবং ওসমান ছিলেন নরম মেজাজের দয়ালু মানুষ। এই চরিত্রগত কারণেই দুজনের দৃষ্টিকোণ ছিল মূলত দুদিকে। হযরত ওমর বলতেন—আরব যতদিন তার সরল ও সহজ জীবন রাখবে, ততদিন তার বিজয় অব্যাহত থাকবে। যখনই তারা ওটা হারাবে, তখনই তারা ভাগ্য-বিপর্যয়ের শিকার হবে। এমনকি একবার পারস্যের বিপুল ধনরত্ন আরবে আসতে দেখে ক্রন্দনরত অবস্থায় ওমর বলেছিলেন—পারস্য হতে শুধু ধন-রত্ন এলো না, তার সাথে এলো আরব জাতির ধ্বংস-বীজ।আড়ম্বর অমিতব্যয়িতাকে ওমর মানব জীবনের উন্নতির পথে চরম প্রতিবন্ধক বলেই মনে করতেন।

ওসমান এখানে ততখানি কঠোর হতে পারেননি। তিনি খিলাফতে আসীন হওয়ার পর দেখলেন—মদীনাবাসীদের আহার-বিহারে খুবই কষ্ট হচ্ছে। দয়ালু প্রাণ খলিফা জনসাধারণের ঐ কষ্টকে লাঘব করার জন্য নাগরিকদের ভাতা এক শ দিরহাম করে বাড়িয়ে দিলেন। এতে জনসাধারণ অত্যন্ত খুশী হয়েছিল, যদিও কেউ কেউ মৃদু সমালোচনাও করেছিল। মানবদরদী দয়ালু খলিফা ঐ সমালোচনাকে কোনরূপ গুরুত্ব দেননি।

খলিফা কর্তৃক ফরমান জারী (Orders):

সবেমাত্র সূর্য অস্তমিত। পশ্চিম দিগন্ত তখনও রক্তিমাভ রঙে রঞ্জিত। তখনও খিলাফতের আকাশে-বাতাসে লৌহমানবের তেজদীপ্ত ব্যক্তিত্ব বিরাজমান। তখনও খরদীপ্ত মনস্বী হযরত ওমরের নাম সর্বত্র আন্দোলিত। তখনও

বাঘ-বকরী যেন এক ঘাটেই জল খাচ্ছে। তখনও ওমরেব নামে বিশাল সাম্রাজ্য প্রকম্পিত। হঠাৎ খলিফা ওসমানের কানে এল বাতাস যেন উল্টো দিকে প্রবাহিত হতে চলেছে। একটি বিশাল নামকবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্দান্ত প্রতাপশালী হেডমাস্টার তাঁব বিদ্যালয হতে অন্য কোথাও চলে গেলে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক ও ছেলেমেযেদেব অবস্থা যা দাঁড়ায, হযবত ওমবের পর খিলাফতের অবস্থা কিছুটা ঐরূপই হয়েছিল। অনেকেই যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। অনেক অসৎ অত্যাচারী উঁকি-ঝুঁকি মাবতে আরম্ভ করেছিল। অনেকেই শিথিল ও অলসতার দিকে ঝুঁকে পডছিল। খিলাফতেব এই অবস্থাও খলিফার দৃষ্টি এড়ায়নি।

প্রথম ফরমান: প্রথম ফর্মানটিতে খলিফা তাঁর প্রশাসনকে জানিয়ে দিলেন তাঁদের কর্তব্য কি—"সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ তাঁর খলিফাদের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁর সৃষ্টিকুলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, তাদেরকে হয়রান করার জন্য নয়। আজ পর্যন্ত নবীর উম্মতের উপর যাঁরা পরিচালক রূপে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন উম্মতের মহান রক্ষক, কেউই ভক্ষক ছিলেন না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি বর্তমানে শাসকগণ তাঁদের মহান দায়িত্ব বা ভূমিকা হতে দূরে সরে যাচ্ছেন, এমনকি কেউ কেউ শোষকের ভূমিকাও গ্রহণ করছেন। যদি এইরূপ চলতে থাকে, তাহলে প্রশাসনের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা উঠে যাবে। তখন অন্যায় অবিচারে আর কারো লজ্জা বোধ থাকবে না। তোমরা মনে রেখো—জনগণের সেবা ও তাদের ন্যায্য দাবীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা ও তার সদ্ব্যবহার করাটাই প্রশাসনের প্রধান ও পবিত্রতম কাজ। তোমরা যথাযথভাবে তাদের দাবী পূরণ করো, এবং তাদের নিকট হতে প্রশাসনের যেটুকু প্রাপ্য, সেটুকুও তাদের দিতে বাধ্য করো। এইভাবে শাসক-শাসিতের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করো। অতীব নিষ্ঠার সাথে এই কাজ সমাধা করো। তখন তোমরা দেখবে সর্বত্র তোমরাই জয়ী।" এখানে আমরা লক্ষ্য করলাম—খলিফার ফরমানটি ছিল—কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাব ফরমান।

তব হাতে নাহি কোন ক্ষীণ পরাজয়
বিবেকেতে থাকে যদি ইন্‌সাফের জয়।
ঈমান ইন্‌সফ্ সহ তোমার আমান
তোমাকে করিবে দান জগৎ সম্মান।
তব হাতে কিছু নয় বিশ্বের বিজয
থাকে যদি অন্তরেতে ঈমানেব জয।

দ্বিতীয় ফরমান : খলিফার দ্বিতীয় ফরমানটি ছিল—রাজস্ব আদায়ের প্রতি তাগিদ—"আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তাঁর নিকট হক বা সত্যই একমাত্র গ্রহণীয়। সুতরাং তোমরা তোমাদের রাজ্যের হক আদায় করো এবং অন্যের হক অন্যকে পরিশোধ করো। রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাষ্ট্রকে পেতে দাও, জনগণের প্রাপ্য জনগণকে পেতে দাও। এই কাজে যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তাহলে আগামী দিনের মানুষও তোমাদের অনুসরণ করবে। তখন তোমরা আল্লাহর নিকট তোমাদের ও তাদের পাপের জন্যও দায়ী হবে। সুতরাং সততার প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখো। কখনও কোথাও যেন অনাথ ও জিম্মী (অমুসলমান)-দের উপর অত্যাচার করবে না। যদি তোমরা এর অন্যথা করো, স্বয়ং আল্লাহ্ তখন প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।"

এখানে খলিফা সকলকে বুঝিয়ে দিলেন—একটি রাষ্ট্র জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি ব্যতীত বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না।

তৃতীয় ফরমান : খলিফা ওসমান যখন খেলাফতে এলেন, তখন ইসলামি রাষ্ট্রের বয়স খুব বেশি নয়। চারিদিকে বড় বড় শত্রু। কেউ বা রাজ্য দখল করতে চায়, কেউ বা ধর্ম দখল করতে চায়। কেউ বা সংস্কৃতি দখল করতে চায়। নানা স্থানে নানা রকমের শত্রু: এই সমূহ দিক বিবেচনা করে খলিফা সেনা বিভাগে একটি ফরমান জারী করলেন—"যাবতীয় প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য। তোমরা মুসলিম রাষ্ট্রের অতন্দ্র প্রহরী। তোমরা জাতির দেশরক্ষী। তোমাদের কর্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার পূর্ববর্তী খলিফা হযরত ওমর সেনাবাহিনীর জন্য বেশ কিছু মূল্যবান নীতি নির্ধারণ করে গেছেন। এবং ঐ নীতি নির্ধারণে তিনি তোমাদের সাথে পরামর্শও করেছিলেন, তোমরা তাঁকে সাহায্যও করেছিলে সর্বান্তকরণে। সুতরাং আমি চাই—তোমরা ঐ নীতিগুলো সর্বান্তকরণে মেনে চলো। যদি তোমরা উক্ত নীতিগুলো হতে পদস্খলন করো, বা তাদের রদবদল করো, তাহলে জেনে রেখো আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন না। তোমাদের স্থলে অন্যদের বসাবেন। আমার তোমাদের প্রতি শেষ কথা—তোমরা তোমাদের মহান কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখো, আমিও আমার কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখছি। মনে রেখো—আমাদের সকলকেই আপন আপন কর্তব্যের জন্য আল্লাহর নিকট একদিন জবাবদিহি করতেই হবে।"

হযরত ওমরের মত বিরল ব্যক্তিত্বের অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুকুল যেন তাদের মানসিক শক্তি বহুগুণে ফিরে পেয়েছিল। খলিফা ওসমান অনতিবিলম্বে এটাকে অনুধাবন করেই সেনাবাহিনীকে জরুরী এক সতর্ক ও সাবধান বাণী পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে আরম্ভ হলো—সেনাবাহিনীর মহড়া।

চতুর্থ ফরমান: এই ফরমানটি ছিল—জাতির প্রতি আবেদন। খলিফা সতর্কবাণী উচ্চারণ কবে জাতিকে সতর্ক করতে চেয়েছিলেন এবং বুঝাতে চেয়েছিলেন—আল্লাহ কেন তাদের উত্থান দিলেন, এবং কেন একদিন পতন ঘটাবেন। ''সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। হে মুসলমানগণ! তোমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের পথ অনুসরণ কবার জন্য আল্লাহ তোমাদের এই দুনিয়ার বুকে অতি মর্যাদার আসন দান করেছেন। সাবধান! তোমরা যদি ঐ পথ হতে বিচ্যুত হও, আল্লাহ তোমাদের আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেবেন। যে সমস্ত প্রধান কারণে তোমাদের পদস্খলন ঘটবে, আমি তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তোমাদের সম্মুখে তুলে ধরছি। ১। মুসলমানদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণ, ২। আজকের বিদেশিনী বন্দিনী দাসীগণের গর্ভজাত সন্তানগণ একদিন বয়োপ্রাপ্ত হয়ে তোমাদের সমাজ জীবনে মিশে গিয়ে এক মিশ্রিত জাতির সৃষ্টি করবে, যাদের ঈমান-আমান ও খাঁটি আরবীয় তেজ বলতে আর কিছুই থাকবে না। ৩। অনারব মুসলমানগণ কোরআন পাঠ করবে, ভুলভাবে পাঠ করবে, মর্ম উদ্ধার করতে পারবে না। ৪। অনারব অনেক মুসলমান তারা তাদের পৌত্তলিক মনোভাব ত্যাগ করতে সক্ষম হবে না।

এককথায় খলিফা মুসলমানদের বুঝাতে চাইলেন—কতকগুলো বাঁধা বুলি শিখে বা আয়ত্ত করে মুসলমান হওয়াটাই বড় কথা নয়। ইসলামের মূল বক্তব্যকে আপন আপন জীবনে প্রয়োগ করাটাই ইসলামের মূল আবেদন। বিরাট শক্তিধর বিশাল ইরান ও রোমের যে কারণে অধঃপতন হয়েছিল বা হচ্ছিল, খলিফা চোখে আঙ্গুল দিয়ে মুসলমানদের ঐগুলোকে দেখিয়ে দিতে চাইলেন। সেনা ও সম্পদ কোন জাতিকেই রক্ষা করতে পারে না, যতক্ষণ না ঐ জাতি তার জাতীয় চরিত্রকে রক্ষা না করে। খলিফা এই কথাটিই জাতিকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোন ফব্মানেই খলিফাব চারিত্রিক দৃঢ়তা ফুটে উঠলো না। উপদেশ ও আদেশ এক নয। [বিস্তাবিত দৃষ্টব্য—'মহানবী' গ্রন্থ। মহানবীর কৃতকার্যতার অন্তরালে কি ছিল।]

সীমান্ত বিদ্রোহের আগুন

(Revolt in border countries)

খিলাফতের দ্বিতীয় বর্ষ, ২৫ হিজরী, ৬৪৭ খ্রীঃ

আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের বিদ্রোহ ও বশ্যতা স্বীকার :

হযরত ওমরের মৃত্যুর পর অনেকেই মাথা চাড়া দিল। তাদের মধ্যে সিরিয়ার আর্মেনিয়া ও ইরাকের আজারবাইজান প্রথম। আর্মেনিয়া চিরদিনই ছিল চিরদুর্ধর্ষ। চিরদিন শির উঁচু করে পার্বত্যময় এলাকায় উচ্চ শিবিরে বসবাস করত। মাঝে মাঝে পরাধীনতার গ্লানি বিশাল শক্তি পারসিক ও গ্রীকদের দ্বারা আস্বাদন করত। কিন্তু এ গ্লানি দীর্ঘদিন স্থায়ী হতো না। এখানেই ছিল তাদের বীরত্বের চাবিকাঠি। যখন ইসলামের বিজয় বাহিনী সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী নদীর মতো অতি বেগমান গতিতে ধাবমান হতে থাকল, তখন সেই অভিযানের হাত থেকে আর্মেনিয়ার পাহাড়-পর্বতও নিষ্কৃতি লাভ করেনি। দুর্ধর্ষ আর্মেনিয়া ভেবেছিল এটা বোধ হয় পারস্য ও গ্রীকদের মত সাময়িক সম্পদলাভের সংগ্রাম। সম্পদের ক্ষুধা মিটলেই তারা চলে যাবে। ইসলামের জেহাদ কোনদিনই কোথাও রাজ্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়নি, তার মূলে ছিল এক মহান আদর্শ—সাম্য ও শান্তিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা।

খলিফা ওমরের মৃত্যুর পরই এই দুই সীমান্ত রাজ্য মদীনায় কর পাঠান বন্ধ করে। ঘটনাটি খলিফার গোচরে এলো। তিনি জানতে পারলেন—তারা কেবলমাত্র করই বন্ধ করেনি, আরো অনেক কিছু করছে। অর্থাৎ চরম বিদ্রোহে মেতে উঠেছে। তাদের ইন্ধন জোগাচ্ছে পারস্য ও গ্রীকগণ। এককথায় সীমান্তে ভেসে উঠেছে কালো মেঘের কুৎসিত ছায়া। এই সীমান্ত এলাকাগুলো ছিল সিরিয়ার গভর্নর মোয়াবিয়ার অধীনে। মুয়াবিয়া খলিফার দরবারে সমস্ত ঘটনা একের পর এক সবিস্তারে তুলে ধরলে খলিফা কালবিলম্ব না করেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। আর্মেনিয়া আজারবাইজানের স্বাধীনতা লাভের মোহ এবং গ্রীকগণের মুসলিম সাম্রাজ্য অধিকারের স্বপ্ন সকল কিছুকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করেই খলিফা গভর্নর মোয়াবিয়াকে ঐ বিপজ্জনক অঞ্চলের জন্য স্থির ও ধীর পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিলেন। মুয়াবিয়া এই নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খলিফার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন—সম্মুখ সমরে এগিয়ে যেতে। খলিফা তাঁব প্রার্থনা মঞ্জুর করে কুফার সেনাপতি

সলমন বিন রুবায়াকে আট হাজার সৈন্যসহ মুয়াবিয়ার সাথে মিলিত হতে নির্দেশ দিলেন। সলমন অবিলম্বে আর্মেনিয়ার পথে সিরীয় বাহিনীর সাথে মিলিত হলেন।

বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা, ধ্বনিত হলো জেহাদের তকবির—'আল্লাহু আকবর'। আকাশ-পাতাল, গিরি-গুহা প্রকম্পিত হয়ে উঠল। ওসমানের খেলাফতের দ্বিতীয় বর্ষের শেষ ভাগ। খলিফার খেলাফত জীবনের প্রথম জেহাদ। সমগ্র পার্বত্য-এলাকা যেন আজ ভয়াবহ কম্পনে কম্পবান। দুর্ধর্ষ আর্মেনিয়ানগণ প্রচণ্ড রণ-হুঙ্কারে নেমে এলো মালভূমিতে। যাদের সকলেরই একটিই সঙ্কল্প—আজ সম্মুখ সমরে আরবীয় মুসলমানদের সম্পদ-সাধ চিরদিনের জন্য মিটিয়ে দেবে। আর্মেনিয়ানদের ভুল ওখানেই হয়েছিল। আরবদের সাধ কোনদিনই সম্পদে ছিল না, ছিল নবীজীর মহান আদর্শে। বন-জঙ্গল হতে যেরূপ হিংস্র প্রাণী ভয়াবহ রূপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, আর্মেনিয়ানবাসীরাও ছিল ঐরূপ বন্য শার্দুলের ন্যায় মত্ত উন্মত্ত। উপত্যকার কঙ্কর মালভূমি কি ভীষণ দৃশ্য সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিল, তা শুধু চিন্তার বিষয়, বর্ণনাতীত। অবশেষে আর্মেনিয়ানদের যুদ্ধের হুঙ্কার মুসলমানদের জেহাদের তক্‌বিরের নিকট মাথা নত করল। আর্মেনিয়ানগণ বুঝল—এটা পারস্য ও গ্রীক বাহিনী নয়। এঁরা আরবের মোজাহিদ, এঁরা ইসলামের শাহাদতকামী সেনা। তাদের ভুল ভাঙ্গল, স্বপ্ন ভঙ্গ হলো, খলিফা ওমর মারা গেছেন। কিন্তু তাঁর অজেয় সেনাবাহিনী আজও বেঁচে আছে। যাঁরা সম্পদের জন্য, সাম্রাজ্যের জন্য সংগ্রামে নামেন না, সংগ্রাম তাঁদের—সততার জন্য, শান্তির জন্য, সাম্যের জন্য, আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য। আর্মেনিয়ার বহু বীর অকারণে প্রাণ দিলেন। বহু মাতা বহু সন্তান হারাল, বহু সন্তান তাদের পিতাকে হারাল, বহু রমণী বিধবা হলো। কিন্তু আর্মেনিয়াকে আরবের বশ্যতা স্বীকার করতেই হলো। আর্মেনিয়ার সেনাপতি ও অসংখ্য সেনা যখন মুসলিম শিবিরে মৃত্যুর জন্য মুহূর্ত গণনা করছে, তখন খলিফার নিকট হতে ফরমান এলো—"সকলকেই ক্ষমা করো, সবাইকে ইসলামের সৌন্দর্য বুঝতে দাও।" খলিফাব সেনাবাহিনী দ্বারা আর্মেনিয়ার সেনাবাহিনী বিজিত হয়েছিল। কিন্তু খলিফার এই অপূর্ব ফরমান দ্বারা আর্মেনিয়ার অন্তরজগৎও বিজিত হলো।

দেখিয়াছ ঘৃণাভরে রাজ্য-ভাঙ্গাগড়া
দেখনি মানুষ তার মনুষ্যত্ব ছাড়া।

গ্রীক শহর তিফ্‌লিশ ও লেভাস্ট জয় :

অতঃপর খলিফা জানতে চাইলেন—ঐ অঞ্চলের সীমান্ত বিদ্রোহের মূল কোথায়, কি রহস্য কাজ করছে। তাকে চিরতরে স্তব্ধ করার নিমিত্ত খলিফা বিশেষ দূত প্রেরণ করে সকল রহস্য উদ্‌ঘাটন করার পর মুয়াবিয়াকে নির্দেশ দিলেন যথাযথভাবে সৈন্য পরিচালনা করতে। মুয়াবিয়া খলিফার নির্দেশ মত বিজয়ী সেনাবাহিনীকে ইঙ্গিত দিলেন গ্রীক অধিকৃত তিফ্‌লিশ শহর অধিকার করে একেবারে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তথায় সৈন্য শিবির স্থাপন করতে। আরম্ভ হলো অভিযানের পর অভিযান। শুরু হলো গ্রীকদের সাথে সংঘর্ষের পর সংঘর্ষ। গ্রীক শক্তি বারে বারে পর্যুদস্ত হতে থাকল। অবশেষে মুসলিম বাহিনী খলিফার পরিকল্পনা মত কৃষ্ণ সাগরের তীরে উপনীত হয়ে শিবির স্থাপন করল সগৌরবে।

সেনাবাহিনী বুঝতে পারল—এখন খলিফার পরিকল্পনামাফিক কার্যসিদ্ধ হয়নি। প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে রোমানগণ ভূমধ্যসাগর হতে সিরিয়ার পশ্চিম উপকূল মুসলিম এলাকাগুলো একের পর এক অতর্কিতে আক্রমণ করত। এই আক্রমণের মূল ঘাঁটি ছিল লেভাস্ট শহর। যার অবস্থান ছিল এশিয়া মাইনর ও ভূমধ্যসাগর এলাকার সংযোগ স্থলে। সুতরাং খলিফার উদ্দেশ্য ছিল ঐ শহরটিকে উড়িয়ে দিতে হবে, কিংবা অধিকার করতে হবে। এইবার আরব বাহিনী তাদের গতি পরিবর্তন করল—কৃষ্ণসাগর হতে শহর লেভাস্টের দিকে। যার অবস্থান ছিল ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে। ভূমধ্যসাগর ছিল রোমানদের হেঁশেল বা ভাত-ঘর। সুতরাং আরব বাহিনীর জন্য ঐ শহর উড়িয়ে দেওয়া বা অধিকার করা, কোনটাই সহজসাধ্য ছিল না, বরং তাকে কব্জা করা কল্পনারও অতীত কাহিনী ছিল। ইসলামের মহামন্ত্র বলে এই কল্পনাতীত কাজ সমাধা হলো—শহর লেভাস্টকে উড়িয়ে দিতে হলো না, অধিকারই হলো। ফলে গ্রীক স্থলবাহিনীর সাথে গ্রীক নৌবাহিনীর যোগাযোগ হলো বিচ্ছিন্ন এবং সিরিয়ার মুসলিম পশ্চিম উপকূল হলো সুরক্ষিত, খলিফার উদ্দেশ্য সাধিত হলো।

পারস্য বিদ্রোহ (Revolt in Persia):
(প্রাচীন সাসানীয় রাজবংশের চির অবসান)

হযরত ওমরের সময় পারস্য জয় হয়েছিল, তবে পারস্যের শক্তি ও সামর্থ্য একবারে শেষ হয়নি। যার জন্য কেউবা মাথা তুলছিল, কেউবা মাথা নাড়ছিল। খলিফা ওমরের মৃত্যুর পরই পারস্য আবার উত্তাল তরঙ্গে নেচে উঠল। পারস্যের সেনাবাহিনী পরাস্ত হয়েছিল। কিন্তু পারস্যের মাটি তখনও আরবের বিরুদ্ধে ছিল। ইরান চিরদিনই আরবকে অসভ্য জানত। তাই তারা কোনদিনই মনেপ্রাণে অসভ্য আরবকে আলিঙ্গন কবতে পারেনি। অসভ্য আরবের হাতে সভ্যতার যে পিলসূজটি প্রজ্জ্বলিত হচ্ছিল, তারা তাদের ঈর্ষা, হিংসা ও সংকীর্ণতাবশত সেটাকে দেখেও দেখেনি। পাবসিকগণ স্বাদেশিকতায অন্ধ হয়ে বলের বন্যায় ইসলাম ধর্মকে ভাসাতে চেয়েছিল। এই সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কি চমৎকাব কথাই না বলেছেন -

"লজ্জা শরম তেয়াগি—
জাতি প্রেমনাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চায় বলের বন্যায়।"

তখনকার দিনে পারস্যেব জনগণ এক একটি জমিদার-নবাব বা ভূ-স্বামীর অধীনে ছিল। যখনই ধীরে ধীরে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা কায়েম হতে থাকল এবং একটা নীতির উপর কর ধার্য হতে থাকল, সমগ্র সমাজ ব্যবস্থায় একটা আমূল পরিবর্তন আসতে থাকল, তখনই ভূ-স্বামীগণ জনগণকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইসলামের সুশাসনের বিরুদ্ধে চরমভাবে উত্তেজিত করল। সমগ্র দেশ পুনরায় উত্তরে কাস্‌পিয়ান হতে দক্ষিণে আরব সাগর পর্যন্ত আরব জাতির বিরুদ্ধে ও বিদ্বেষে নব তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। তারা ঘরে ঘরে প্রচণ্ড আকারে আন্দোলন গড়ে তুলল ইসলামের বিরুদ্ধে। পারস্যের ভূ-স্বামীগণ বুঝতে পারল—ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন হলে, তাদের কায়েমী স্বার্থ চিরতরে খতম হয়ে যাবে। তারা মুসলমানদেব বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলল—মুসলমানগণ তাদের স্বাধীনতা হরণ করেছে, তাদের ধর্মকে নষ্ট করেছে। তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টিকে ধ্বংস করেছে। সুতরাং তারা পুনরায় পারস্যের পরাজিত ও পলাতক সম্রাট ইয়াজ্‌দিগার্দকে সিংহাসনে বসাতে চায়। এই কথা পারস্যের প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল, আন্দোলন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সম্রাট ইয়াজ্‌দিগার্দ তখন তস্কর বেশে আপন বাজোই এক দুর্গ হতে অন্য দুর্গে, এক শিবির হতে অন্য শিবিবে দিবাবাত্রি স্থানান্তবিত

হচ্ছেন। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস! সম্রাট একটির পর একটি দুর্গ বা শিবির ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এবং সেগুলো একের পর এক মুসলমানদের হস্তগত হচ্ছে।

সর্বশেষে সম্রাট বড়ই বিব্রত অবস্থায় ইরানের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও সুরক্ষিত প্রদেশ খোরাসানে আশ্রয় নেন। মুসলিম বাহিনী সন্ধান পাওয়া মাত্র খোরাসান অভিমুখে যাত্রা করেন। শোনামাত্র হতভাগ্য সম্রাট শেষ আশ্রয়, আপন দেশ, আপন সাম্রাজ্য চোখের জলে ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। খোরাসানও মুসলমানদের হস্তগত হলো। সম্রাট বহু কষ্টে প্রাণের দায়ে ভিখারির বেশে জৈহুন নদী অতিক্রম করে তুর্কিস্তানে আশ্রয় নেন। অতঃপর বহু কষ্টে মধ্য এশিয়ার দুস্তর মরুভূমিকে পাড়ি দিয়ে ফরগানায় উপস্থিত হয়ে তাতারদের সাহায্য ভিক্ষা করেন। ফরগানাধিপতি তার্খান নিরাশ্রয় বিব্রত হতাশাগ্রস্ত সম্রাটকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলে অসহায় সম্রাট কিছুটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পান এবং আপন সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তাতার বাহিনী-সহ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু একটা কথা আছে—অভাগা যেদিকে যায়, সাগর শুকায়ে যায়। সম্রাটের জীবনেও তাই হলো। যাত্রাকালে পথিমধ্যে অতর্কিতে এক অজ্ঞাতপরিচয় তাতার কর্তৃক সম্রাট নিহত হন। হতে পারে এটা তাতার সম্রাটের রাজনীতি বা কৌশল। তিনি হয়ত চাননি—বাঁশ ঝাড়ে কেন, বুকে আয়। কেননা তাতার সম্রাট অতি সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন—বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য যেখানে হাবুডুবু খাচ্ছে, ইসলামের সেই অথৈ জলে তাতার বুদ্‌বুদ্ মাত্র। তাই কৌশলে কাজ সেরে দিয়েছিলেন। এই প্রাচীন সাসানীয় রাজবংশ, বিশ্ববিশ্রুত খসরু রাজত্বের পৃথিবীর বুক হতে চির অবসান হলো—৩১ হিজরী, ৬৫১ খ্রীঃ। পারস্যকে সম্পূর্ণভাবে পদানত করতে খলিফা ওসমানের সর্বমোট আট বছর সময় লেগেছিল। খলিফা ওসমান পারস্যের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রথম পবিত্র কোরআনের ঐ অংশটি পাঠ করে মহান আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জানান—"হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক তুমি। তুমি যাকে খুশী রাজত্ব দান করো এবং যার কাছ থেকে খুশী রাজত্ব কেড়ে নাও।" কোরআন—৩ : ২৬, ১১ : ৬৭-৬৮, ২৮ : ৬, ৯৪-১০১।

আল্লাহ চির ক্ষমাশীল, তবে যে কোন বিষয়ে সীমালঙ্ঘনকারীকে তিনি পছন্দ করেন না। মানুষ মাত্রেই ভুল-ভ্রান্তি করবেই, তবে কেউ যেন সীমালঙ্ঘন না করে। কোরআন—২ : ১৯০, ৫ : ৮৭, ৭ : ৫৫, ১১ : ৪৪, ২৫ : ১৯, ২৭ : ৫২, ৩৭ : ৩০, ৬৬

অনাচার অবিচার দে'খে সব ঘেরি
বাজাতে শেষেব ঘণ্টা নাহি কর দেরি।

প্রশাসনে রদ্-বদল

খিলাফতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষ
২৫-২৬ হিঃ, ৬৪৭-৪৮ খ্রীঃ

আমর ইবনুল আ'সের প্রথম পদচ্যুতি ও আলেকজান্দ্রিয়া হস্তচ্যুত (Dismissal of Amar and its effect) :

মিশরের বিভ্রাট খোলা কথায় বলতে গেলে খলিফা ওসমানের সৃষ্টি। সকলেই জানেন মিশর ছিল পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। যার রাজধানী ছিল বিখ্যাত আলেকজান্দ্রিয়া। খলিফা ওমরের সময় উমাইয়া বংশের বিখ্যাত সেনাপতি আমর ইবনুল আ'স এই দেশ জয় করে খলিফা ওমরের চির আস্থা লাভ করেন। তিনি শুধু যে ক্ষণিকের জন্য দেশ জয় করে কিছু অস্থায়ী সম্পদ নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন, তা নয়। তিনি স্থায়ীভাবেই দেশটাকে জয় করেছিলেন এবং জয় করেছিলেন তার বিখ্যাত রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া। তবে তিনি তাঁর রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া হতে নূতন প্রতিষ্ঠিত শহর ফুস্‌তাত বা ফাসতাদে স্থানান্তরিত করেন। আজকের কায়রো শহর তখনও জন্মগ্রহণ করেনি। এই দেশ জয়ে আমর এতখানি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন যে, খলিফা ওমরের মত মানুষও মুগ্ধ কণ্ঠে তাঁর যোগ্যতার প্রশংসা করে তাঁকেই ওখানকার স্থায়ী শাসক নিযুক্ত করেন। এককথায় মিশরবাসীদের নিকট 'মিশর নীলনদের দান'। এবং মুসলিম জগতের নিকট 'মিশর আমরের দান'।

হযরত ওমরের সময়ে আমর ছিলেন সমগ্র মিশরের গভর্নর বা শাসক। এবং আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ ছিলেন মিশরের পোর্ট সাঈদ ও তৎসংলগ্ন উপকূল অঞ্চলের সামরিক শাসনকর্তা। উপকূলের রাজস্ব তিনিই আদায় করতেন। কিন্তু খলিফার দরবারে সামগ্রিকভাবে সমগ্র মিশরের রাজস্ব পাঠাতে হতো গভর্নর আমরকে। সা'দ আমরকে রাজস্ব মিটিয়ে দিতেন। এবং আমর খলিফাকে মিশরের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতেন। এই নিয়ম ওমরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। হযরত ওসমান (রাঃ) খলিফা হওয়ার পরই সা'দ তাঁর রাজস্ব যথানিয়মে আমরকে না পাঠিয়ে সরাসরি আপন দুধ-ভাই খলিফা ওসমানকে পাঠাতে থাকলেন। কখনও বা বন্ধ করলে নিরুপায় আমর তাঁর অংশটুকু খলিফার দরবারে পাঠিয়ে দিতেন। তখন খলিফা আমরের নিকট পূর্ববৎ রাজস্ব দাবী করলে আমর খলিফাকে সবিনয়ে জানিয়ে দিলেন—"উষ্ট্রী এর বেশি দুধ দিতে পারবে না।" তখন খলিফা এক ফরমান বলে আমরকে পদচ্যুত করে সাদকে মিশরের গভর্নর পদে নিযুক্ত করলেন। খলিফার এই আকস্মিক ফরমানে

মিশরের তামাম মানুষ বিস্ময় বোধ করলেন। কেননা প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি প্রাণকেন্দ্র মিশর ছিল নিঃসন্দেহে আমরের অবদান। বিশাল রোমক বাহিনীর হস্ত হতে মিশরকে ছিনিয়ে নেওয়া যে কতখানি কঠিন কাজ ছিল, তা সম্যকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন হযরত ওমর। সেদিন বিশাল রোমক বাহিনী অগ্রাহ্য করে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার মাথার উপরে ইসলামের শান্তি পতাকা উড্ডীয়মান শুধু আমরের বাহুবলে হয়নি, ছিল দারুণ বুদ্ধিবলও। সেই ক্ষুরদীপ্ত বুদ্ধিমান মানুষটিকে আজ মিশর হারাল—খলিফার এক ফরমান বলে। এবার আমরা খলিফার ফরমানের পরিণতি লক্ষ্য করবো। পরিণতি কি হয়েছিল—মিশর হারিয়েছিল আমরকে এবং মুসলিম জাহান হারিয়েছিল মিশরকে এবং ইসলাম হারিয়েছিল তার শান্তি পতাকাকে। এই হয়েছিল করুণ পরিণতি।

২০ হিজরী ৬৪০ খ্রীস্টাব্দে সুদক্ষ সেনাপতি আমর ইসলামের মহামন্ত্র বলে দুর্জয় গ্রীক শক্তিকে এক দুর্নিবার গতিতে দুর্বার স্রোতে ভাসিয়ে দিলেন। বিজিত হলো মিশর, বিজিত হলো রোমকগণের অতি সাধের আলেকজান্দ্রিয়া। একের পর এক পাঁচ বছর কেটে গেল। গ্রীকগণ তাঁদের হৃত গৌরব ফিরে পেতে আর সাহস করে না, দূর হতে চোখের জলে আলেকজান্দ্রিয়াকে জানায় অভিবাদন। অমিত শক্তিধর সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর অতি সাধের স্বর্গপুরী-স্বপ্নপুরী আলেকজান্দ্রিয়ার পতনে এতই আঘাত পেয়েছিলেন যে, সে আঘাত তিনি আর মোটেই সহ্য করতে না পারায় তাঁর শরীর ও মন দুই-ই ভেঙে যায়। তিনি তাঁর মৃত্যুর মহামুহূর্তেও আলেকজান্দ্রিয়ার শোক কোনমতেই ভুলতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর যুবরাজ কনস্টানটাইন পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েই আলেকজান্দ্রিয়াকে পুনরুদ্ধার করার জন্য গভীরভাবেই চিন্তা করতে থাকেন। কিন্তু চিন্তা করলে কি হবে। হরিণ তো বাঘের সামনে বাঁধা। হঠাৎ সুযোগ এসে গেল।

খলিফার ফরমানই সেই সুযোগ এনে দিল। মিশর বিজয়ী বীর আমর আজ পদচ্যুত। গ্রীকগণ আনন্দে আত্মহারা। রোমক সাম্রাজ্যে উৎসব পালিত হলো। সম্রাট কনস্টানটাইন সুযোগের অবহেলা না করে সেনাপতি ইমানুয়েলকে নির্দেশ দিলেন সমস্ত প্রকারের প্রস্তুতি-সহ আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করতে। উদ্দেশ্য ছিল শহর সহ সমগ্র মিশরকে পুনরুদ্ধার করা। আশ্চর্যের কথা, বলতে গেলে রোমকগণ বিনা বাধায় শহর আলেকজান্দ্রিয়া দখল করলেন। এখানে একটা কথা মনে স্বাভাবিকভাবেই সাড়া তোলে, কেন বিনা বাধায় গ্রীকগণ তাদের গন্তব্যস্থলে এসে গেল। তাহলে খলিফার মুসলিম

বাহিনী কোথায় ছিল? খুবই সরল উত্তর, মুসলিম বাহিনী খলিফার অবিবেচনাপূর্ণ ফরমানটির সুযোগ বুঝে তাঁর মুখের উপর শক্ত উত্তরটি ছুঁড়ে দিল। সেনাবাহিনী খলিফাকে বুঝিয়ে দিল—তারা কোন মানুষের বাহিনী নয়, তারা ইসলামের খেদমতে আল্লাহ্‌র বাহিনী।

আমরের সেনাপতি রূপে পুনর্বহাল ও আলেকজান্দ্রিয়া উদ্ধার :

খলিফা ওসমান অতি দ্রুত সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁব পূর্ব আদেশ রদ করলেন। সুদক্ষ রণকৌশলী বীর আমরকে তাঁর যথাযথ সম্মান দিয়ে আবার অনুরোধ করলেন—ইসলামের শান্তি পতাকাকে আবার তুলে ধরতে। একদিন রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস আলেকজান্দ্রিয়াকে হারিয়ে যে কষ্ট পেয়েছিলেন, সেই বহু কষ্টে অর্জিত আলেকজান্দ্রিয়া মুসলমানদের হস্তচ্যুত হলে মিশর বিজয়ী বীর আমর ইবনুল আ'স তদপেক্ষা কম কষ্ট পাননি। তবে বিচক্ষণ বীর আমর জানতেন—ঘটনার স্রোতে খলিফার বোধোদয় হবে এবং আলেকজান্দ্রিয়া আবার ফিরে আসবে।

রোমান সেনাবাহিনীর আজরাইল আমর ইবনুল আ'স বিদ্যুৎবেগে মিশরের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েই গ্রীক বাহিনীর অন্তর জগৎকে কাঁপিয়ে তুললেন—এক আল্লাহ্‌র মহান তক্‌বির ধ্বনিতে। এই ধ্বনিতেই একদিন ধরণীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত থরথর বেগে কেঁপে উঠেছিল। এই ধ্বনিতেই একদিন আরব বেদুঈন বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। মহাবীর অজেয় বীর খালেদ-বিন-ওয়ালিদের কণ্ঠে এই ধ্বনিই একদিন রোমান অধিকৃত মুতা প্রান্তরকে ভূকম্পনে পরিণত করে শত সৈনিকের বুকে লক্ষ সৈনিকের শিহরণ জাগিয়ে তুলেছিল। যাকে বলে বিনা মেয়ে বজ্রাঘাত। সেই আঘাতে সেনাপতি আমর উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রোমান বাহিনী ধরাশায়ী হলো। আলেকজান্দ্রিয়ার মাথায় আবার ইসলামের শান্তি পতাকা উড্ডীয়মান হলো।

খলিফা ওসমানের মত এই একই ভুল একদিন করেছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী খলিফা ওমর মহাবীর খালিদের ব্যাপারে। যাঁকে স্বয়ং মহানবী 'সাইফুল্লাহ্‌' আল্লাহ্‌র তরবারি উপাধি দান করেছিলেন। তবে পর্বতসময় ব্যক্তিত্ব থাকার জন্য মহান খলিফা কোন রকমে পার পেয়েছিলেন। কিন্তু খলিফা ওসমান সেই পার পেলেন না। তাঁকে ভুলের সংশোধন করতেই হলো অতি সত্বর। খলিফা ওমর তাঁর ভুলের সংশোধন করেছিলেন একটু দেরিতে খালিদের কবর প্রান্তে দাঁড়িয়ে শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করে। এবং মহান আল্লাহকে বলেছিলেন :

ভুলে ভরা এ জীবন, ভ্রান্তি নাহি নিও
দয়া করে ক্ষমা করে, রেহাই দিও।
কোরআন—২ : ২৮৬

মুসলমানদের এই সমস্ত অগণিত অকল্পনীয় বিজয়ের মূলে কি ছিল? সে সম্পর্কে অধ্যাপক হিট্টি বলেন—

"তাঁরা অস্ত্রবলে বলীয়ান না হলেও ইসলামের মহান তকবির 'আল্লাহু-আক্‌বার' ধ্বনি ছিল তাঁদের এক মহামন্ত্র। এই ধ্বনি তাঁদের অন্তরে আনত বিশ্বাস, দেহে আনত বল, দুর্বার বেগে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিত দ্বিধাহীন চিত্তে এবং শত্রুর মনোবলকে করত ক্ষয়। এই অমোঘ মন্ত্র বলেই তাঁরা ২০ হিজরীতে ৬৪০ খ্রীস্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার দুর্বার ও দুর্জয় গ্রীক শক্তিকে শোচনীয়ভাবেই পরাস্ত করেছিল।"

সুতরাং মুসলমানদের শক্তি ছিল—সৈনিকের অঙ্কে নয় ঈমানে, সমর ছিল শাহাদত প্রাপ্তির সুবর্ণ সুযোগ। জিতলে গাজী, মরলে শহীদ। গগনভেদী আল্লাহু-আক্‌বার তকবির ধ্বনি ছিল—আল্লাহর অপরিমিত শক্তির আধার ও আগমন বার্তা।

পারস্য বিজয়ী সা'দ এবং ওলিদ: (সা'দের অপসারণ) (Dismissal of Saad):

হযরত ওমর-চরিত্রের কয়েকটি বিশেষ দিক ছিল, যেগুলোর উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর মহান জীবনের গতি ও নীতি নির্ধারণ করতেন। এই দিকগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল—মুখের উপর সত্য বলা, অন্যায়কে নির্মম হস্তে দমন করা, অমিতব্যয়িতা ও বিলাসিতাকে জীবনের ও সমাজের শত্রুরূপে চিহ্নিত করা, দলাদলি-ভাঁড়ামি-ভণ্ডামি-অতিরঞ্জন ইত্যাদিকে কখনও বরদাস্ত করতেন না। জীবনের এই দৃষ্টিভঙ্গি হতেই তিনি একদিন বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত সা'দ বিন আবি ওক্কাসকে কুফার গভর্নর পদ হতে অপসারিত করে মুগিরা বিন শায়েবাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। অতঃপর খলিফা ওমর অনুসন্ধান করে জানতে পারেন যে, তিনি সা'দকে যে গুরুতর শাস্তি দিয়েছেন, তা তাঁর প্রাপ্য নয়। তাই তিনি তাঁর অন্তিম শয়নে ভাবী খলিফার জন্য নির্দেশ রেখে যান—সা'দকে যেন তাঁর পূর্বপদে পুনর্বহাল করা হয়।

তাই ওসমান খলিফা হওয়ার পরই পূর্বতন খলিফার নির্দেশমত সা'দকে

তাঁর আপন পদে বহাল করেন। পারস্য বিজয়ী বীর সা'দ যখন রাজধানী মাদাইন দখল করেন, তখন কুফা ছিল একটি গ্রাম্য বাজার বা হাট মাত্র। খলিফা ওমর সর্বদা সৈনিকদের স্বাস্থ্যের জন্য সেখানকার জলবায়ুর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন ও রাখতে নির্দেশও দিতেন। এই নির্দেশানুযায়ীই সেনাপতি সা'দ লক্ষ্য করলেন—রাজধানী মাদাইন মরুবাসী আরবদের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থান নয়। সুতরাং তিনি খলিফার অনুমতি সহ সেদিনের হাট কুফাকে আজকের জগদ্বিখ্যাত কুফাতে পরিণত করেন। সুতরাং কুফানগরীর ইতিহাস কোনদিনই সেনাপতি সা'দের অবদানকে অস্বীকার করতে পারে না। সা'দ তাঁর পূর্বপদ ফিরে পেলেন। কিন্তু তাঁর আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের কোন পরিবর্তন হলো না। তিনি আপন পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইতুল মাল হতে বিরাট একটি ঋণ গ্রহণ করলেন। অতি সজ্জন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ ছিলেন তখন সরকারি কোষাগারের কোষাধ্যক্ষ। তিনি সা'দকে যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে তাগিদ দিলেন। সা'দ তাঁর কথা রক্ষা করতে না পারায় কোষাধ্যক্ষ খলিফাকে জানাতে বাধ্য হলেন। খলিফা আবার তাঁকে পদচ্যুত করলেন। তখনও তাঁর পুনর্বহাল হওয়ার পর এক বছরও পূর্ণ হয়নি। সা'দের এই পদচ্যুতির সত্বরতাকে অনেকেই একটু সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। বিশেষ করে তাঁর পদে যখন খলিফার দুধ-ভাই ওলিদ বিন ওকবাকে নিযুক্ত করা হলো। যাই হোক, মহামতি সা'দ এই ব্যাপারে কোনদিনই খলিফার বিরুদ্ধাচরণ করেন নি। খলিফার বিরুদ্ধ-গোষ্ঠীতে যোগদানও করেন নি। এমনকি তিনি বলেছিলেন—"যতদিন জিহাদের প্রয়োজন ছিল, ততদিন তাঁর তরবারি ছিল কোষমুক্ত। আবার জিহাদের প্রয়োজনেই কেবলমাত্র কোষমুক্ত হবে। অন্য কোন কারণে নয়।" এখানেই মহাবীর সা'দ ছিলেন অনন্যসাধারণ বীর দেহ ও মনে।

ওলিদ বিন ওকবা ঃ

মহাবীর সা'দের স্থানে যিনি এলেন তাঁর নাম ওলিদ বিন ওকবা। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের মানুষ, এবং খলিফা ওসমানের দুধ-ভাই। ইসলামের প্রথম যুগে যে কয়েকজন ব্যক্তি মহানবীর সাথে দুশমনী ও ভীষণ শত্রুতা করার জন্য ইসলামের ইতিহাসে আজও চিরস্মরণীয়, ওলিদের পিতা ওকবা তাদের অন্যতম। একটি যুদ্ধক্ষেত্রে ওকবার মহানবীর মুখের উপর থুতু নিক্ষেপণ আজও ইতিহাসে কুখ্যাতির উচ্চশিখরে অবস্থান করছে। দয়ার নবী, ক্ষমার নবী, করুণার নবী, মহানবী মানুষকে শাস্তি দিতেন না। এমনকি অনেক

ক্ষেত্রে তিনি রেহাই দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে জানিয়ে দিতেন—'এক্ষেত্রে তুমি শাস্তি দিতে পারতে।' এইরূপই ছিল তাঁর চরিত্র। এহেন মানুষ কতখানি বিষণ্ন ও বীতশ্রদ্ধ না হলে একবার প্রাণদণ্ড জারী করেছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়।

কুফাবাসীরা যখন শুনতে পেল ওলিদ কুফার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছেন। তখন তারা রাগে ও ক্ষোভে ফেটে পড়ল। বার বার খলিফার দরবারে অভিযোগ-অনুযোগ পাঠাল। কিন্তু কোন কাজ হলো না। ওলিদ কার্যভার গ্রহণ করলেন। ওলিদের একটি বিশেষ গুণও ছিল বীরত্ব। আবার আরব দুনিয়া চিরদিনই বীরের অকৃত্রিম পূজারী বা ভক্ত। এই দিক থেকে কিছুদিনের মধ্যে উভয় পক্ষেই একটা সামঞ্জস্যময় ভাবের সৃষ্টি হলো। ওলিদ শাসনে-প্রশাসনে আচারে-বিচারে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তাঁকেও একদিন মহাবীর সা'দের পথ অনুসরণ করে ৬৫২ খ্রীস্টাব্দে পদচ্যুতির গ্লানি হজম করতে হয়।

মিশর বিজয়ীবীর আমর বিন্ আল্ আসের দ্বিতীয়বার অপসারণঃ

মহাবীর আমর-বিন্-আল-আ'স তাঁর অভূতপূর্ব বীরত্বের দ্বারা মিশরকে ক্ষান্ত করলেন, শান্ত করলেন, আলেকজান্দ্রিয়াকে উদ্ধার করলেন। ইসলামের ইতিহাসে, মুসলিম বীরের ইতিহাসে চির অমরত্ব লাভ করলেন। খলিফা ওসমান মদীনাতে বসে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকলেন—কি করে চিরতরে গ্রীকগণকে ঠেকানো যায়, কি করে আমরবিহীন মিশরকে রক্ষা করা যায়। কেননা আমরকে মিশরে পুনঃ-প্রেরিত করে খলিফাকে তার ফরমান রদ করতে হয়েছিল। তিনি এটা ভোলেন নি। তাই তিনি মনোনিবেশ করলেন মিশরকে শত্রুশূন্য করতে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন—শত্রুর উৎপত্তি কোথায়। পশ্চিম আফ্রিকা এই সময় বহু ছোট বড় রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এবং তারা আপন আপন দলপতি দ্বারা শাসিত হত। বিপদটা ছিল অন্যত্র। ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর অনুরাগ বা আনুগত্য বলে যা কিছু ছিল, সেটি ছিল রোমানদের প্রতি। যেহেতু প্রাচীনকাল হতে তাদের সাথে একটা নাড়ির সম্পর্ক ছিল, সেজন্য তারা ত্রিপলিতে রোমানদের সাথে মিলিত হয়ে হৃদয়ের আদান-প্রদান করতো ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতো। খলিফা এটাকে একেবারেই ধ্বংস স্তূপে পরিণত করতে চাইলেন। ওটা ছিল শত্রুগণের মহাঘাঁটি ও শিবির।

ঐরূপ একটা বাসনা নিয়ে খলিফা ২৬ হিঃ ৬৪৮ খ্রীস্টাব্দে একটি আরব বাহিনী আব্দুল্লাহ্-ইবনে-যুবায়েরের নেতৃত্বে আফ্রিকাভিমুখে যাত্রা করতে নির্দেশ দিলেন। এই বিশাল বাহিনী আলজিরিয়া ও মরক্কো পর্যন্ত বিপুল বিজয় মাল্য টেনে নিয়ে মরক্কোর দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়ে স্পেনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। সেখানে সমুদ্র তাদের গতিরোধ করে। অভিযানও সমাপ্তি পর্ব লাভ করে। কিন্তু এই অভিযানে একটি রহস্য যেন কোথায় রয়ে গেল। যে রহস্যটি মিশর বিজয়ী বীর আমরকে বার বার দংশন করছিল।

মিশর প্রথমে বিজিত হয়েছিল আমর-কর্তৃক। পরে খলিফার মনোনীত গভর্নরের বাহিনীকে পরাস্ত করে গ্রীকগণ বিনা বাধায় আলেকজান্দ্রিয়া কেড়ে নেয়। তদানীন্তন গভর্নর আব্দুল্লাহ্ বিন-আবি-সাবাহ্‌র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকান ছাড়া আব কোন গত্যন্তর ছিল না। অবশেষে খলিফা আবার আমরকে অনুরোধ করলেন—উদ্ধার করতে। আমর অবলীলাক্রমে অবহেলায় হারিয়ে যাওয়া ধনকে উদ্ধার করলেন। অথচ আজ যখন এই মিশরকে কেন্দ্র করেই অভিযান প্রেরিত হলো, তখন মিশর বিজয়ী, মিশর উদ্ধারকারী আমর এতটুকুও কিছু জানতে পারলেন না। কি অদ্ভুত! এই ঘটনাটিও নিয়মের একটা চরম ব্যতিক্রম ছিলো। কেননা কোন দেশেরই গভর্নরকে না জানিয়ে বা তাঁকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব না দিয়ে কোন অভিযান দেশে প্রেরিত হতো না। এই ছিল রহস্য। খলিফার এই আচরণে সেনাপতি আমর মনে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছিলেন।

খলিফা যখন আমরকে মিশরের গভর্নরের পদ হতে অপসারিত করেন, তখন মিশরের রাজস্ব অফিসার খলিফার আপন দুধ-ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন-আবি সারাহ্‌কে উক্ত পদে বহাল করেন। সম্প্রতি আমর আবার খলিফা কর্তৃক পুনঃনির্বাচিত হয়ে প্রবেশ করেছেন। আব্দুল্লাহ্ তাঁর গভর্নর পদ ছাড়তে নারাজ। দুজনার মধ্যে আরম্ভ হল ঠাণ্ডা লড়াই। দুজনেই খলিফার নিকট অভিযোগ পাঠালেন। খলিফা সব কিছু দেখে রায় দিলেন—আবদুল্লাহ্ গভর্নর থাকুন। এবং আমর ওখানে সেনাপতি থাকুন। খলিফার এই নতুন প্রস্তাবে বিজয়ী আমর, তেজস্বী আমর অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে খলিফার আদেশ অগ্রাহ্য করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে মদীনাবাসীদের নিকট খলিফার বিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। মদীনাবাসীগণ সকলেই জানতে পারলেন খলিফা ওসমান যেন-তেন প্রকারেণ আপন দুধ-ভাই আব্দুল্লাহ্‌কে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। এর জন্য খলিফাকে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হল।

আব্দুল্লাহর প্রথম জীবন ছিল অত্যন্ত কদর্যময়, গ্লানিময়। হযরত ওসমান এই আবদুল্লাহকে প্রথম মহানবীর নিকট নিয়ে আসেন, এবং ইসলামে দীক্ষা দেন। মহানবী তাঁকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ 'ওহি' (কোরআন) অনুলিখনের দায়িত্ব দেন। এই কাজে তিনি চরম বিশ্বাসঘাতকের পরিচয় দিলেন। মহানবী তাকে তাড়িয়ে দেন। তখন এই আব্দুল্লাহ্ আবার কোরেশ দলে ভিড়ে গিয়ে মহানবীর বিরুদ্ধে এমন কোন হীন ষড়যন্ত্র নাই,যা করেন নি। এমনকি মক্কা বিজয়ের পর মহানবী যে কয়েক জনের চরম পাপের জন্য মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আব্দুল্লাহ্ ছিলেন তাদের একজন। তখন এই আব্দুল্লাহকে হযরত ওসমান আপন ঘরে বেশ কয়েকদিন লুকিয়ে রেখে পরে মহানবীর সামনে নিয়ে গিয়ে প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করেন। মহানবী ওসমানের বিশেষ অনুরোধে প্রাণভিক্ষা মঞ্জুর করেছিলেন। তবে সতর্ক ও সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, ''ঐ ব্যক্তি কোনদিনই যেন তাঁর সম্মুখে না আসে।'' এ হেন পাপীকে, পাপাত্মাকে অভিশপ্ত দুরাচারকে যার মুখ দেখতেও স্বয়ং মহানবী অনিচ্ছুক ছিলেন। সেই ব্যক্তিকে খলিফা কোন্ কারণে কিসের জন্য আমরের মত বিশেষ ব্যক্তিকে বসিয়ে দিয়ে মিশরের মত দেশে গভর্নর পদে স্থলাভিষিক্ত করলেন—একথা আজও রহস্যাবৃত।

আমরা দূর ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে যা পাই, তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি, বিশ্লেষণ করি। আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে কি ঘটেছিল, কোন পরিস্থিতিতে কি দাঁড়িয়েছিল, তা সবই আজ অজ্ঞাত ও রহস্যাবৃত। তবে একথাও মনে সাড়া দেয়—আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী ওসমান, মদীনার বুকে বীরে-রুমার ওসমান, জিন্নুরায়েন ওসমান, তাবুক অভিযানের ওসমান, হোদাইবিয়ার ওসমান, কোরআন একত্রকারী ওসমান, দশজন সুসংবাদ প্রাপ্ত জনের একজন ওসমান, ইসলামের পুণ্যাত্মা খলিফা ওসমান একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন ও অবিবেচক মানুষ ছিলেন না।

সমাজব্যবস্থার উন্নতিকরণ (Social development)

খলিফা ওসমান জীবনের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে ৬৭ বছর বয়সে খেলাফতের ভার নিয়েছিলেন, যখন তিনি বয়সের ভারে নত, জ্ঞানে ও গুণে উন্নত, অভিজ্ঞতায় আচরণে সমুন্নত। যাঁর নিকট হতে খেলাফতের ভার নিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন এই পৃথিবীর এক মহা ক্ষণজন্মা পুরুষ হযরত ওমর। খলিফা ওসমান দিবারাত্রি চিন্তা করতে থাকলেন—কি করে কোন উপায়ে বিগত খলিফার খরস্রোত বেগবান ধারাকে অটুট ও অক্ষুণ্ন রাখবেন। দুই হাত দুদিকে দিলেন, দুই চোখ দুদিকে দিলেন। একদিকে থাকল দেশ, অন্যদিকে থাকল বিদেশ। একদিকে থাকল রাজ্যবৃদ্ধি, অন্যদিকে থাকল রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি।

ইসলামের ইতিহাসে সকলেই জানেন মহানবীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের তরী কতখানি বিপদাপন্ন হয়েছিল। সেই ডুবুডুবু তরীকে অত্যন্ত যোগ্যতায় তীরে এনেছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর। অতঃপর দ্বিতীয় খলিফা ওমর যে যোগ্যতার পরিচয় দিলেন, কোন ঐতিহাসিকের পক্ষেই তা লিখে শেষ করা সম্ভব নয়। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সময় রাজ্যসীমা ব্যাপক আকারে বাড়তে থাকল। আরব অভিযানে যেন বাঁধভাঙা এক জোয়ার এসে গেল। সকল বাধাবিপত্তি যেন খড়কুটোর মত ভেসে গেল। খলিফা এই সময় অতি ধীর ও স্থিরভাবে রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সুখ-শান্তিতে, সমাজব্যবস্থার উন্নতিকরণে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেন। এটা ছিল খলিফার সুদূরপ্রসারী দূরদর্শিতার ফল।

কূপ খনন :

জীবনের অপর নাম জল, এবং জলের অপর নাম জীবন। সুতরাং মানুষের জীবনে জলের প্রয়োজন। সকল প্রয়োজনকে চিরদিনই অনায়াসে অতিক্রম করেছে। একথা সর্বজনবিদিত। আরব মরুভূমির দেশ, কিছু কিছু স্থানে মরূদ্যান। জল নাই, আছে লু-হাওয়া। মাটি নাই, আছে পাথর, কাদা নাই, আছে বালুকারাশি, খাল নাই, বিল নাই, আছে ছোট ছোট পাহাড়; নদী নাই, নালা নাই, আছে কংকরময় ঢিবি। তাই বেদুঈন জলহীন আরবাসীকে আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বেহেশতের যে বর্ণনা দিলেন, সেখানে আরব মরুবাসীকে সহজেই প্রলুব্ধ করা হলো—'নদী দ্বারা', যেখানে ছিল তাদের প্রাণের তৃপ্তি। ২ : ২৫, ৫৭ : ১২।

খলিফা ওসমান মানুষেব সেই প্রয়োজনটাই প্রথম অনুধাবন কবার চেষ্টা করলেন। তাই তাঁব প্রথম কাজ ছিল মদীনার বুকে মুসলমানদের পানির হা-হা-কাবকে প্রথম দূব কবা। রুমা কূপ তাঁর জ্বলন্ত প্রমাণ। খলিফা হওয়ার পর তাঁব এই প্রচেষ্টা শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি তাঁব বিশাল সাম্রাজ্যেব

সর্বত্র প্রথম লক্ষ্য করলেন—কোথায় মানুষ দিবারাত্রি পানির অভাবে কষ্ট পাচ্ছে। ঐ অভাব দূরীকরণে তিনি অসংখ্য কূপ খননের ব্যবস্থা করে প্রজাবৃন্দের চির কষ্ট লাঘব করত আবালবৃদ্ধ-বনিতার প্রশংসা ও পরম শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হন।

চারণভূমি :

মনুষ্য জগতের বেঁচে থাকার জন্য যে কয়েকটি বিশেষ বস্তুর প্রয়োজন, জীবজগতেও তার কয়েকটি একান্ত দরকার। এই জগৎগুলো একে অপরের পরিপূরক। মনুষ্যজগৎ জীবজগৎ ব্যতীত টিকতে পারে না, আবার জীবজগৎ উদ্ভিদজগৎ ব্যতীত টিকে থাকতে পারে না। আবার উদ্ভিদজগৎ জড়জগৎ ব্যতীত থাকতে পারে না। তাই একে অপরের পরিপূরক। খলিফা দৃষ্টি দিলেন জীবজগতের প্রতি। তাদের চারণভূমিগুলো ঠিকমত আছে কিনা তার জন্য ব্যবস্থা নিলেন। এমনকি 'বাকি' নামক বিশাল চারণভূমিকে তিনি যখন অধিগ্রহণ করলেন, তখন একদল মানুষ তাঁর নিন্দায় মত্ত হয়েছিল। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—এটাতে তিনি বা তাঁর আত্মীয়-স্বজন চারণ করবেন না। এটাতে সরকারি পশুগুলো চারণ করবে। ইসলামের নবী পশুপক্ষীদের প্রতিও কেমন আচরণ করতে হবে, তা তাঁর উম্মতকে শিখিয়ে গেছেন। এইভাবে খলিফা সারা দেশজুড়ে পশুপক্ষীদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তারা যেন কোথাও অহেতুক কষ্ট না পায়। খলিফা বলতেন—তিনি শুধু মানুষের খলিফা বা প্রতিনিধি নয়, সবার প্রতিনিধি। মানুষ সৃষ্টি-জগতের প্রতিনিধি। ২ : ৩০, ৩৮ : ২৬।

খরা ও বন্যা প্রকল্প :

খলিফা মরুময় দেশ আরবের খরাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যতটুকু যেখানে যা করার প্রয়োজন ছিল, তা করতে এতটুকুও কসুর করেননি। কেননা তিনি বারবার বলতেন—রাজ্যবিস্তার বড় কথা নয়। রাজ্যে মানুষের সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করাটাই বড় কথা। খলিফা ওমর দেশে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসকে ঠেকাতে সুয়েজ ক্যানেলের প্রবর্তন করেছিলেন, খলিফা ওসমান এত বড় কোন প্রকল্প না নিলেও ছোটখাটো বহু প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন। যার ফলে বহু কৃষক বহুভাবে উপকৃত হয়েছিল। দেশেও শস্যভাণ্ডার বেড়ে গিয়েছিল। আবার তিনি বিপরীত পদক্ষেপও নিয়েছিলেন। একটি দেশের জন্য অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি দুই-ই অভিশাপ। অনাবৃষ্টি সম্পর্কে নানা প্রকল্প নেওয়ার পর খলিফা মনোনিবেশ করলেন অতিবৃষ্টি বা বন্যা সম্পর্কে। আরবে কিছু কিছু দোয়াব বা নিম্নভূমি আছে। এই দোয়াবগুলোতে কৃষককুল নানা জাতীয় শস্যাদির আবাদ করত, যেমন—গম, ফুটি, তরমুজ, কাঁকুড়, শশা ইত্যাদি। কিন্তু মাঝে

মাঝে খাইবারের দিক হতে বন্যার জল এই দোয়াবগুলোকে ভাসিয়ে মদীনা পর্যন্ত ধাওয়া করত। দোয়াবের এই শস্যক্ষেত্রগুলোকে রক্ষা করার জন্য খলিফা স্থায়ী প্রকল্প গ্রহণ করে আরবের বহু কৃষককে বন্যার অভিশাপ থেকে রক্ষা করে দেশের ধনভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি এই দুটো ক্ষেত্রেই খলিফা ওসমানেব অবদান অবিস্মরণীয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা :

ইসলামি খেলাফত ও ইসলাম সাম্রাজ্য একদিন শূন্য হতে আরম্ভ হয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। মদীনা ছিল যার প্রাণকেন্দ্র। এই মদীনাকে কেন্দ্র করেই একদিন বিশ্ব আলোড়ন আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল। বিরাট ও বিশাল দুই বিশ্ব-শক্তি তাসের ঘরের মত ভূমিকম্পের মুখে পড়ল। এ যেন কোন মহাপ্রকৃতির মহাগ্রাস। সকল শক্তিই তার সম্মুখে নিজেকে বারে বাবে অসহায় বোধ করল। বারে বারে বিজয়ী হলো ইসলামের মুজাহেদবাহিনী, বারে বারে উড্ডীয়মান হলো ইসলামের শান্তির পতাকা। সাম্রাজ্যের সীমা যেন উপচিয়ে পড়ল। বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল মদীনা। সবার দৃষ্টি মদীনার দিকে। সবাই দেখতে চায় মহাশক্তির কেন্দ্রভূমি মদীনাকে। মদীনার বুকে অগণিত মানুষের ভিড় দিন দিনই বাড়তে থাকল। খলিফা সম্যকভাবেই উপলব্ধি করলেন—যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অতি সত্বর গড়ে তুলতে হবে। যেন মানুষ বিশাল সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে অতি অনায়াসে চলাফেরা করতে পারে। আরম্ভ করলেন অসংখ্য রাস্তা, রাস্তার পাশে সরাইখানা। সরাইখানার পাশে কূপ ও মসজিদ। কোথাও মসজিদের পাশে মক্তব। ফুলের মত সাজিয়ে তুললেন বিশাল সাম্রাজ্যকে। মানুষ দিবা নাই, রাত্রি নাই, যখন যার ইচ্ছা. তখনই সে সেখানে নিরাপদে চলে যেতে পারছে। এই যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে কেবলমাত্র জনসাধারণই যে বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছিল তা নয়, প্রশাসনও দারুণভাবে প্রাণ পেয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যও দুর্বার গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। পথিক পেল পথ, পিপাসার্ত পেল পানি, নিরাশ্রয় পেল আশ্রয়, ব্যবসায়ী পেল ব্যবসা, প্রশাসন পেল প্রাণশক্তি। এককথায় এই যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে সারা দেশে প্রাণের সাড়া জেগে উঠেছিল। এখানে প্রবীণ খলিফা তাঁর প্রবীণত্বে প্রাণের সাড়া রেখে গেছেন।

অভাবগ্রস্তকে সাহায্যদান :

খলিফা ওসমান (রাঃ) ছিলেন আরবের একজন খ্যাতনামা দানশীল ব্যক্তি, এ কথাটি কোন ঐতিহাসিকের বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর দান-খয়রাত ছিল প্রবাদস্বরূপ। খলিফা হওয়ার পর বিভিন্ন রাজ্য থেকে বহু ধনরত্ন আসতে থাকে। বাইতুল মাল উপচিয়ে উঠতো। খলিফা তাঁর সারা দেশে কোথায় কোন গরিব দীন-দুঃখী অনাথ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অন্ধ পঙ্গু আছে তার একটা তালিকা তৈরি করলেন। অতঃপর সরকারি কোষাধ্যক্ষকে ফরমান দিলেন সকলকে সাহায্য করতে নিয়মিতভাবে। এমনকি কোষাগার থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রসার লাভ ঘটানোর জন্য ব্যবসায়ীগণকে ঋণ দানেরও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। সরকারি সম্পদকে মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করার নিমিত্ত তিনি তার দুহাতকে সদাই বাড়িয়ে রাখতেন। একদিন ইসলামের জন্মই হয়েছিল সাম্যকে কেন্দ্র করে। গড়ে উঠেছিল সাম্যভিত্তিক ইসলামি সাম্রাজ্য। যদি কোন দেশের সম্পদের সমবণ্টন হয়, তাহলে সে দেশে অশান্তি থাকতে পারে না। যদি এক শ্রেণীর মানুষ না খেয়ে মরে যায় এবং আর এক শ্রেণীর মানুষ বিলাসবহুল জীবনে বল্গা হারা ঘোড়ার মত চলতে থাকে, তাহলে সে দেশে, সে সমাজে একদিন অশান্তির আগুন জ্বলতে বাধ্য। খলিফা ওসমান সেই দিকেই লক্ষ্য রেখে সম্পদের সহজ ও প্রয়োজন মাফিক সমবণ্টন আরম্ভ করেছিলেন। খলিফার এই দানের অধ্যায়ে সমাজের গরিব ও অসহায় মানুষই ছিল মূল লক্ষ্য বস্তু। এই শ্রেণীকে সাহায্য করার জন্য ইসলামের চার খলিফাই অপব্যয়ী ও অমিতব্যয়ীকে কোনদিনই ক্ষমার চোখে দেখেননি। কোরআন—৪ : ৩৭, ৬ : ১৪১, ৭ : ৩১, ১৭ : ২৭, ২৯। ২ : ৩, ২১৫, ২৫৪, ২৬১-৬৪, ২৭০, ৩ : ৯২, ৪ : ১১৪, ৯ : ৩৪, ৩৫, ৬০, ৭৯, ১০৩, ৫৭ : ১৮, ৫৮ : ১২, ৯৩ : ১০, ১০৭ : ১-৭।

মসজিদে নববীর সূচনা ও সম্প্রসারণ :

যখন মহানবী মদীনার বুকে এলেন, তখন তাঁর আপন ঘরবাড়ি বলতে কিছুই ছিল না। আবু আইয়ূবের ঘরে আশ্রয় নিলেন। মসজিদ-ই-নববীর স্থান ঠিক হলো। স্থানের মালিকগণ বিনা পয়সায় স্থান দিতে সম্মত হলেন। কিন্তু মহানবী বিনামূল্যে নিতে সম্মত হলেন না। পরিশেষে হযরত আবুবকর দশ স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে স্থানটি ক্রয় করে মহানবীকে চিন্তামুক্ত করলেন। সুতরাং মসজিদে নববীর সূচনাতে আবুবকরের দান, পরে তার সম্প্রসারণে ওসমানের

দানও অবিস্মরণীয়। যখন মসজিদ-ই-নববীব সম্প্রসাবণ প্রযোজন হলো, তখন আব মহানবী নাই, আবুবকব নাই। যাঁদেব কথা শুনা মাত্রই মানুষ সব কিছু কবতে ও ত্যাগ কবতে কাল বিলম্ব কববে না। আজ মদীনাব পরিস্থিতি পবিবেশ সব কিছুই যেন পবিবর্তিত। এই প্রতিকূল পবিবর্তিত পবিবেশে মসজিদ-ই-নববীকে সম্প্রসাবিত কবতে খলিফা ওসমানকে কত যে বেগ পেতে হযেছিল তা চিন্তা কবা যায না। সমস্ত ঝুঁকি মাথায নিযে তিনি সম্প্রসাবণ কবেছিলেন। তাই মুসলিম জাহানেব অতীব প্রিয প্রাণকেন্দ্র মসজিদ-ই-নববীর সাথে যে তিনজনেব পবিত্র স্মৃতি চিব বিজড়িত খলিফা ওসমান তাঁদের অন্যতম।

ব্যবসা-বাণিজ্য :

আরব চিরদিনই ব্যবসাকেন্দ্রিক দেশ, কৃষিভিত্তিক নয। এ: ব্যবসা-তেজাবতি সম্পর্কে কোবআনে বহু স্থানে, বহুবাব বলা হযেছে বাংলাব জনপ্রিয় প্রবাদ—বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। খলিফা ওসমান নিজেও ছিলেন একজন বড ব্যবসায়ী মানুষ। তিনি ব্যবসা বুঝতেন, এবং জানতেন ব্যব ব্যতীত মানুষ ধনী হতে পাবে না। তাই তিনি তাঁব দেশকে সমৃদ্ধিশালী কবাব জন্য দেশবাসীকে ব্যবসায় উৎসাহ দিতে থাকলেন। যাতে তাঁবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে পাবে। যখন দেখলেন সবকাবি কোষাগাবে অর্থের অভাব নাই, তখন তিনি দেশেব বড বড ব্যবসাযীকে দেশ বিদেশে বাণিজ্য করাব জন্য তাগিদ দিলেন। বিদেশে বাণিজ্য সম্ভাব চালাতে গেলে বেশ কিছু অর্থের প্রয়োজন। খলিফা তাঁদেব ডাক দিলেন, কোথায কি অসুবিধা জানতে চাইলেন। সকলের সুবিধা-অসুবিধার কথা খোলা প্রাণে শুনে যা যতটুকু প্রয়োজন, সবার জন্য বাইতুল মাল হতে ঋণেব ব্যবস্থা কবে দিলেন। খলিফার এই ব্যবস্থার ফলে দেশে প্রচুব অর্থ সমাগম হতে থাকলো। তিনি তাঁর এই অভিনব চিন্তা দ্বারা আরব বাণিজ্য ও আর্থিক কাঠামোতে বাস্তবভিত্তি আমূল পরিবর্তন সূচিত করলেন। এই ক্ষেত্রে প্রবীণ খলিফা দারুণ প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন।

তখনকার দিনে আরব বাণিজ্যের দুটো প্রধান পথ দুদিকে প্রবাহিত ছিল। (১) এডেন হতে লোহিত সাগব ভাযা নীলনদেব উত্তব মোহনা পর্যন্ত। (২) পারস্য উপসাগর হতে ফোরাতের পথে উত্তর সিরিয়া ভাযা ভূমধ্যসাগবেব উপকূল পর্যন্ত—ত্রিপলী, বার্কাবন্দব।এই দুই পথেবই শেষ প্রান্তে জড়ো হতো

ইউরোপীয় বাণিজ্য জাহাজগুলো। এই উভয় পথের মাধ্যমে ভারত-সিংহল, জাভা-বোর্নিও, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানের উৎপন্ন দ্রব্যগুলো ইউরোপের বাজারে পৌঁছত। খলিফা ওসমানের উৎসাহ অনুপ্রেরণা এবং অনুদানে আরব বণিকগণ এই উভয় পথেই একনিষ্ঠভাবে ব্যবসা-ব্যাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে একদিন আরব-অর্থনৈতিক কাঠামোটিকে সতেজ ও সবল করে তুলেছিল। যার মূলে ছিল খলিফা ওসমানের চিন্তাপ্রসূত অফুরন্ত অবদান।

পবিত্র কোরআন ও খলিফা আবুবকর, ওমর, এবং ওসমান: কেন হযরত ওসমানকে জা'মেউল কোরআন বলা হয়?

(Why Hazrat Uthman is called 'J'ameul Quran?)

পবিত্র কোরআনের কথা উল্লেখ করতে যে সাহাবার কথা প্রথম মনে সাড়া দেয়, তিনি হযরত যায়েদ বিন সাবিত। মহানবীর কয়েকজন ওহী লেখক ছিলেন, যাঁদের মধ্যে যায়েদ ছিলেন প্রধান। কোরআন সঙ্কলন ও একত্রীকরণ সম্পর্কে যায়েদ বলেন—"মহানবীর তিরোধানের অল্পকাল পরেই খলিফা আবুবকরকে ভণ্ডনবী মুসাইলামার বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করতে হয়। ইমামা নামক স্থানে উভয় পক্ষের এক রক্তক্ষয়ী ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে বহু হাফেজ শাহাদত বরণ করেন। এবং তখনও পবিত্র কোরআন হাফেজগণের কণ্ঠে একত্রিত মাত্র। বিভিন্ন অংশগুলো তখনও পুস্তক আকারে একত্রিত বা একখণ্ডে করা হয়নি। এই কারণে হযরত ওমরের মনে ভয় হলো, যদি এইরূপ ভয়াবহ যুদ্ধ পর পর হতে থাকে, তাহলে একদিন বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এবং এক খণ্ডে একত্রিত কোরআনকে পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়বে। তাই তিনি গভীর উদ্বেগের সাথে খলিফা আবুবকরের নিকট গেলেন, এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন বিক্ষিপ্তভাবে লিখিত কোরআনের অংশগুলোকে হাফেজের কণ্ঠের সাথে মিলিয়ে এক খণ্ডে একত্রিত করতে। প্রথম দিকে খলিফা আবুবকর একটু ইতস্তত করলেন, কেননা যে কাজ স্বয়ং মহানবী করে যাননি, সেটা করা ঠিক হবে কি, এই চিন্তা করছিলেন। পরে হযরত ওমরের সাথে আলোচনান্তে ঠিক করলেন পবিত্র কোরআনের চির হেফাজতের জন্য তাকে এক খণ্ডে একত্রিত করতেই হবে। তখন খলিফা আমাকে (যায়িদ) ডেকে নির্দেশ দিলেন—কোরআনের লিখিত অংশগুলোকে অনুসন্ধান করতে এবং একখণ্ডে একত্রিত করতে। এবং আমি অত্যন্ত কম্পিত হৃদয়ে বললাম— এই কাজের পরিবর্তে যদি আমাকে একটি পাহাড় সরাতে বলা হত, সে কাজকে আমি

এর অপেক্ষা কঠিন মনে করতাম না। কিন্তু পবে আমি খলিফার অনুরোধে সম্মত হই। ''বোখারী শরীফ''।

অতঃপর খলিফা একটি ফরমান জারী করেন যে, যাঁরা মহানবীর জীবিতকালে তাঁর নিকট হতে কোন ওহী (প্রত্যাদেশ) লাভ করেছেন, তাঁরা যেন ঐগুলোকেযায়েদেরনিকট উপস্থিত করেন। মহানবীর জীবিতকালে ঐগুলো সাধারণত চামড়া, বৃক্ষ-পত্র, পাথর বা ঐ জাতীয় কোন কিছুতে লেখা হতো। খলিফা সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি ফরমান জারী করলেন যে, যে কেউ ওহী আনবেন, তাকে দুজন সাক্ষীও আনতে হবে, তাঁরা যেন সাক্ষী দেন, ওটা মহানবীর নিকট হতে পাওয়া। অন্যথায় ওহী গ্রহণ করা হবে না। অতঃপর যায়িদ তাঁর মহান কাজ আরম্ভ করলেন। সাহাবা যায়িদের পক্ষে এই কাজ কবাটা একটা সুবিধাজনক দিক ছিল। মহানবীর নির্দেশে যায়িদ যেভাবে কোরআন সাজিয়ে ছিলেন, সূরাগুলোকে বিন্যস্ত করেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই হাফেজগণও মুখস্থ করেছিলেন। এবং হযরত যায়িদ নিজেও কোবআনেব হাফেজ ছিলেন। এককথায় মহানবীর তত্ত্বাবধানে যায়িদ কোরআনের বিশারদ ছিলেন। অতঃপর যায়িদ কোরআনেরই লিখিত অংশগুলোকে সংগ্রহ করতে থাকলেন। মহানবী নিজেও পনের জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কোবআন পরিষদ গঠন করেছিলেন, যাঁদের কাজই ছিল কোবআন লিপিবদ্ধ করা ও মহানবীকে দেখান। মহানবী দেখে দিতেন। সেগুলো সবই ছিল, তবে একসাথে একত্রিতভাবে ছিল না।

এইভাবে হযরত যায়িদ অতীব সযত্নে পবিত্র কোরআনেব একত্রীকরণেব কাজ অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে সমাধান কবলেন। অতঃপর সংকলিত কোরআনটিকে খলিফা আবুবকরের নিকট জমা দিলেন। আবুবকর জীবনেব অন্তিমকালে ওটাকে হযরত ওমরের নিকট জমা দিলেন। এবং হযবত ওমরও তাঁর অন্তিম শয়নে ওটাকে তাঁর আপন কন্যা ও মহানবীর পত্নী বিবি হাফসাব নিকট জমা দিলেন। হযরত ওসমান পর্যন্ত পবিত্র কোরআনের সংকলনটি বিবি হাফসার নিকটই জমা ছিল। এবং এই কোরআন হতেই পরবর্তীকালে কোরআন লেখা হত, বিতরণ করা হতো। পরবর্তীকালে খলিফা ওসমান কোরআন সম্পর্কে যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, সেটা অন্য কিছুই না, কেবলমাত্র তিনি কোরআনের বিশুদ্ধতাকে অটুট ও অক্ষুন্ন রাখতে আম ভাবে সকলকেই বাধ্য করেছিলেন—বিবি হাফসাব নিকট সংরক্ষিত কোরআনের ঐ সঙ্কলনটিকে অনুসরণ করতে। এর জন্য যে ব্যবস্থা তাঁকে নিতে হয়েছিল, তিনি তা অতীব নির্মম ও নিষ্ঠুর হাতে অতি কঠোর ও

কঠিন হাতে নিয়েছিলেন—কেবলমাত্র পবিত্র কোরআনের পবিত্রতাকে বিশুদ্ধতাকে সংরক্ষণ করতে।

পরবর্তীকালে সমগ্র দেশে কোরআনের এই সঙ্কলনটি কিভাবে প্রচারিত হলো, আমরা এই অধ্যায়ে সেইটি দেখবো। কিভাবে হযরত ওসমান (রাঃ) কোরআনের সাথে জড়িয়ে গেলেন—ওটা আমরা দেখবো। এতক্ষণ আমরা দেখলাম—আবুবকর ও ওমর কিভাবে কোরআনকে সংকলন ও সংরক্ষণ করলেন। এবার দেখবো কিভাবে ও কেন ওসমান সারা দেশে ওটাকে তুলে ধরলেন।

হযরত আনাস বিন মালিক বলেন—''হুযাইফা নামক এক ব্যক্তি খলিফা ওসমানের নিকট আসলেন। সিরিয়াতে আর্মেনিয়া যুদ্ধে আর্মেনিয়া জয়ের সময় তিনি ছিলেন সেনাপতি। এবং ইরাকে আজারবাইজান জয়ের সময়ও তিনি ছিলেন সেনাপতি। তিনি ঐ সমস্ত অঞ্চলের লোকদের বিভিন্ন প্রকারে কোরআন পাঠ করতে দেখে অত্যন্ত ভয় পেলেন। (একই ভাষা একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে কথিত, লিখিত ও পঠিত হতে থাকে। যেমন বাংলা ভাষা। বিভিন্ন জেলাতে বিভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয। এমন কি বাঙ্গালী হয়েও চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর ভাষা বুঝাই যায় না। অথচ তারা বাংলা ভাষাতেই কথা বলে।) সেনাপতি খলিফা ওসমানকে বললেন—''হে আমিরুল মুমেনিন! এইসব লোকদের এইভাবে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কোরআন পড়া বন্ধ করুন। নচেৎ ইহুদী ও খ্রীস্টানদের মত আমাদেরও অবস্থা হবে।'' তখন খলিফা সেনাপতির কথার মর্ম যথাযথভাবে উপলব্ধি করেই সঙ্গে সঙ্গে বিবি হাফসার নিকট হতে ঐ সংকলিত কোরআনটি চেয়ে পাঠালেন, এই বলে যে, কাজ সারার পর তাঁর জিনিস তাকে ফেরত দেওয়া হবে। বিবি হাফসা কোরআন পাঠিয়ে দিলেন। খলিফা তখন যায়িদ বিন সাবিত, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের, সা'দ ইবনুল আ'স, এবং আব্দুর রহমান বিন হারিসকে কোরআনের সাতটি অনুলিপি করতে নির্দেশ দিলেন। খলিফা তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, কোরআন মক্কার কোরেশদের ভাষাভঙ্গিতে আরবীতে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তাঁরাও যেন সেদিকে লক্ষ্য রাখেন। সাতটি খণ্ড তৈরি হওয়ার পর খলিফা বিবি হাফসার কোরআন তাঁকে ফিরিয়ে দেন। এবং পরে আরো কতকগুলো অনুলিপি তৈরি করেন।

অতঃপর দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ফরমান পাঠান—যাঁর নিকট যে কোরআন আছে, তিনি যেন তা তথাকার গভর্নরের নিকট জমা দেন ও রসিদ নেন। বিলম্ব করলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। এবং গভর্নরকে ফরমান দিলেন যে, যে সমস্ত ব্যক্তি কোরআন জমা দেবে, তাঁদেরকে যেন খলিফার প্রেরিত

কোরআন হতে নকল করে কপি দিয়ে দেওয়া হয়। এবং আরো ফরমান দিলেন—জমাকৃত কোরআন যেন কোন প্রকারেই আর কারো হস্তগত না হয়। ওগুলিকে যেন অনতিবিলম্বে পুড়িয়ে তাদের অস্তিত্বকে যেন একেবারেই বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। এবং খলিফার ফরমান মোতাবেকই কার্য করা হয়েছিল। খলিফা এই কোরআন সংক্রান্ত ব্যাপারে যা কিছু করেছিলেন, তা করেছিলেন—সমস্ত প্রবীণ সাহাবীদের মতামত নিয়েই। এই সম্পর্কে কোরআনের হাফেজ হযরত আলী বলেন—"তোমরা কেউই কোরআন সম্পর্কে খলিফা ওসমানের প্রশংসা ব্যতীত নিন্দাসূচক কোন কথাই আমাকে বলো না। কেননা তিনি দেশজুড়ে কোরআনের ব্যক্তিগত কপিগুলোকে জমা দেওয়ার ফরমান আমাদের সাথে পরামর্শ না করে দেননি। এবং আমাদের সাথে পরামর্শ না করে ঐ জমা কপিগুলোকে পোড়াবার বা ধ্বংস করবার ফরমানও দেননি।"—বোখারী শরীফ।

খলিফা প্রথম যে চারজনকে কোরআনের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, পরে কাজের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি আরো আটজনকে তাঁদের সাথে জুড়ে দেন। যাঁদের মধ্যে ছিলেন—আনাস বিন মালিক ও আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাসও। কিন্তু সব সময় এই সভার সভাপতি ছিলেন হযরত যায়িদ বিন সাবিত, যাঁকে স্বয়ং মহানবী (সাঃ) নিজেই পবিত্র কোরআনের ওহি লেখক হিসাবে সব সময়ই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দান করেছিলেন। খলিফা ওসমান দেশ জোড়া সকল মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারভুক্ত কোরআনকে জমা করেছিলেন— বিকৃত বা নকলকে রুখতে, অবিকৃত বা আসলকে রাখতে। সেই আসল কোরআন আজও বিদ্যমান। এইজন্যই হযরত ওসমানকে জামেয়ুল কোরআন বা কোরআন একত্রকারী বলা হয়ে থাকে। খলিফার বিরুদ্ধে আরববাসীদের যে অনুযোগ বা অভিযোগ ছিল, তা ঐগুলোকে বিলুপ্ত করার জন্য নয়, ঐগুলোকে পুড়িয়ে বিলুপ্ত করার জন্য। তাদের বক্তব্য ছিল—পবিত্র কোরআনকে পোড়ানো অসম্মান, তাকে কবর দেওয়া উচিত ছিল। কোরআনের শুদ্ধি, সঙ্কলন ও সংরক্ষণতা সম্পর্কে কোরআন: ২:২, ৬:৩৪, ১৫:৯, ১১৫, ১০:৬৪, ১৮:২৭, ২১:১০, ৫০, ৪৫:২০, ৫৪:২২, ৪০, ৫৬:৭৭, ৮০-৮১, ৬৮:৫২। দ্রঃ কোরআন বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা পূর্বাভাষ।

তৃতীয় অধ্যায়

সাম্রাজ্য বিস্তার

হযরত ওসমানের কৃতিত্ব (Achievements of Osman)

৬৪৯ খ্রীঃ ২৭ হিঃ, খেলাফত : ৪র্থ বর্ষ

রোমান সাম্রাজ্যের ঘাঁটি ত্রিপলী বিজয় :

মিশরের রাজনৈতিক আকাশে আমর ইবনুল আ'স ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু সারার অন্তর্দ্বন্দ্বে কালো মেঘের সঞ্চার হল। আমরের পেছনে ছিল জনসমর্থন, এবং আব্দুল্লার ছিল খলিফার সমর্থন। এখানে রাজশক্তি ও রাজ আদেশ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। যাই হোক, গ্রীকগণ এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগটা নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। উত্তর আফ্রিকায় তাদের প্রধান সামরিক কেন্দ্র ছিল ত্রিপলী। মিশর আক্রমণের জন্য তারা ত্রিপলীতে বিপুল পরিমাণ সমরায়োজন করতে থাকে। মিশরের নবনিযুক্ত গভর্নর আব্দুল্লাহ গৃহ্ বিবাদের জন্য প্রথম দিকে প্রমাদ গুনলেন। পরে খলিফার পরামর্শ ও সাহায্য প্রার্থনা করলেন। খলিফা কাল বিলম্ব না করেই আব্দুল্লাহকে সাহায্য দান করলেন। যদিও নবনিযুক্ত আব্দুল্লাহর তেমন কোন খ্যাতি ছিল না। কিন্তু যোগ্যতা ও সাহস ছিল। আমর মিশর জয় করে যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তিনি সমগ্র উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা জয় করে সমধিক খ্যাতি অর্জন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। তিনি বিগত ২৫ হিজরীতে ত্রিপলী জয়ের যে প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন, তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল নিজেদের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য। এবারের অভিযান ছিল নেহাত আক্রমণ নয়, আত্মরক্ষাও বটে। বিপুল রোমান বাহিনী দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছে মিশর দখল করতে। এবার আব্দুল্লাহ্কে শত্রুর সেই বিপুল সমরায়োজনকে বাধা দিতে হবে, বাধ্য করতে হবে। আব্দুল্লাহ্র সেনাবাহিনীও যেন পতঙ্গের ন্যায় ধাবিত হতে থাকে। গতি এত বেগবান ছিল। বিনা বাধায় বার্ক অধিকার করে মুসলিম বাহিনী ত্রিপলীর মাটি স্পর্শ করা মাত্র নামাযান্তে তক্‌বির ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে।

ত্রিপলীর গভর্নর গ্রিগোরিয়াস যখন এই সংবাদ অবগত হলেন, তখন তিনি বাইজানটাইন সম্রাটের নিকট আরো সৈন্য সাহায্য চাইলেন। সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে আরববাহিনীর গতিরোধ করার জন্য সেনাপতির প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। এবং সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন যেমন করেই হোক ত্রিপলীর

মাটিতে আরব দুষ্কৃতীদের যথোচিত শিক্ষা দিতে হবে। যেন জীবনে তারা আর এইরূপ না করে। গভর্নর তথা সেনাপতি গ্রিগোরিয়াস সম্রাটের এই কথায় অপরিসীম আনন্দ ও উৎসাহ্ পেয়ে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী সহ্ আরবদের গতিরোধ করলেন। তাঁর আশা অসভ্য আরবদের সমর সাধ মিটিয়ে দেবেন। আফ্রিকার রোমান সাম্রাজ্য আবার উদ্ধার করবেন। দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে অটুট মনোবল, অদম্য উৎসাহ, অগণিত সেনাসহ গ্রিগোরিয়াস বিষধর সাপের ন্যায় কখনও ফুঁসছে, কখনও মাথাতে ফণা তুলছে। বিশাল সৈন্যবাহিনীর মাঝে এ যেন দেখার মত এক অপূর্ব দৃশ্য। পিতার পার্শ্বে সর্বদাই তাঁর পরমা সুন্দরী বিদুষী কন্যা ব্যক্তিগত সচিবের পদে অধিষ্ঠাতা। সেদিনের যুদ্ধে এও ছিল এক আকর্ষণীয় কৌশল সেনাবাহিনীদের উৎসাহিত ও উত্তেজিত করতে।

উভয় পক্ষের রক্তক্ষয়ী প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হলো। দিনের পর দিন, এমন কি মাসের পর মাস যুদ্ধ চলতে থাকল। কিন্তু কোন পক্ষেরই জয়-পরাজয় স্থির হলো না। উভয় পক্ষই তখন চিন্তিত। উভয় পক্ষই তখন রণকৌশলে নূতন নূতন চিন্তাভাবনা করেছেন। সেনাপতি গ্রিগোরিয়াস হঠাৎ ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি আরব সেনাপতি আব্দুল্লাহর মাথা তাঁকে উপহার দিতে পারবে, তিনি তাকে তাঁর পরমা সুন্দরী কন্যা সহ্ এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দেবেন। এই ঘোষণাটিতে দু শিবিরে দু রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। রোমান শিবিরে উৎসাহ্ ও উত্তেজনার চরম রূপ দেখা দিল। আরব শিবির যেন অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ল। হেনকালে ভাগ্যক্রমে খলিফার নিকট হতে এক তেজস্বী যুবক যুবাইর কিছু দুর্ধর্ষ সেনা সহ্ আরব বাহিনীতে যোগদান করলে আরব বাহিনীতে এক নূতন প্রাণ সঞ্চার হলো। যুবাইর যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন সেনাপতি আব্দুল্লাহ্ কোথায়। সেনাবাহিনী জানালো তিনি তাঁদের পরামর্শমত শিবিরে আছেন। বীর যুবাইর উত্তর দিলেন, শিবির কি আরব বাহিনীর সমরক্ষেত্র, তখন তাঁরা সেনাপতি গ্রিগোরিয়াসের ঘোষণার কথা উল্লেখ করলেন। যুবাইর সঙ্গে সঙ্গে আব্দুল্লাহ্কে অনুরূপ ঘোষণা করার জন্য পরামর্শ দিলেন। আব্দুল্লাহ্ বললেন, তিনি পরমা সুন্দরী কন্যা কোথায় পাবেন। যুবাইর বললেন—ঐ একটি সুন্দরী দ্বারাই উভয় পক্ষের কাজ সমাধা হবে। অতঃপর তেজস্বী ও প্রতিভাবান যুবাইরের পরামর্শ মত সেনাপতি আব্দুল্লাহ ঘোষণা করলেন—"হে আরব বীর সেনাবাহিনী, তোমাদের মধ্যে যে কেউ রোমান সেনাপতি গ্রিগোরিয়াসের মাথাটি আমাকে উপহার দিতে পারবে, আমি তাকে এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা সহ রোমান সেনাপতির ঐ পরমা সুন্দরী কন্যাকে উপহার দেবো।"

অতঃপর ভীষণভাবে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হলো। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই যুদ্ধ রুদ্ররূপ হারাল। স্বয়ং সেনাপতি গ্রিগোরিয়াস বধ হলেন মহাবীর যুবাইরের হাতেই। পিতার পরমা সুন্দরী কন্যা বন্দী হলেন। মহাবীর যুবাইর ইচ্ছা করলে ঐ একই স্থানে পিতার সাথে কন্যাকেও পরপারে অবলীলাক্রমে পাঠিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু ইসলামের যুদ্ধ নীতিতে ওটা একেবারেই নিষিদ্ধ। এই গ্রীক পরমা সুন্দরী কন্যাটি কেবলমাত্র উত্তাল যৌবনের রূপে ও রসে ভর্তি ছিলেন না, তিনি ছিলেন যুদ্ধবিদ্যায় চরম পারদর্শিনী মহিলা, কখনো রূপে, কখনো রসে, কখনো গুণে, কখনো জ্ঞানে, কখনো কলাতে, কখনো কৌশলে, কখনো চক্ষে, কখনো বক্ষে, কখনো কণ্ঠে, কখনো কলমে, কখনো সুরে, কখনো সঙ্গীতে, কখনো প্রেমে, কখনো প্রীতিতে, কখনো শ্রদ্ধায়, কখনো স্নেহে, কখনো আলোতে, কখনো আঁধারে, এককথায় তাঁর শরীরের এমন অঙ্গ ছিল না, যে অঙ্গ দ্বারা তিনি রণরঙ্গিনী বেশে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় একটি রোমান সেনাকে শত সেনার শক্তি দান করতে পারতেন না। এ যেন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা, মহানবীর বিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে যার উলঙ্গ হতেও বিবেকে বাধেনি।

পিতার মৃত্যুতে তিনিও ভেঙে পড়লেন। সেনাবাহিনী হল হতাশ। রোমান শিবিরে নিমিষে নৈরাশ্য নেমে এল। আজকে আর গ্রীক বালার, গ্রীক সুন্দরীর অনুপম রূপরাশি, নিরুপম রূপছায়া, তেজদীপ্ত বাক্যরাশি পিতার পার্শ্ব থেকে রোমান সেনাবাহিনীকে যুদ্ধরত অবস্থায় উদ্দীপ্ত করে না। সকলেই পলায়নপর, সকলেই সফেতুল্লাহ শহরে আশ্রয় নিল। সেটাও আরব বাহিনীর করতলে এসে গেল। নিরুপায় রোমান বাহিনী আত্মরক্ষায় কোন উপায়ান্তর না দেখে মুসলিম সেনাপতির নিকট সকলেই এক সাথে প্রাণভিক্ষা কামনা করে প্রার্থনা জানালে সেনাপতি আব্দুল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে সন্ধির ও আত্মসমর্পণের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। ত্রিপলীতে ইসলামের শান্তি পতাকা উড্ডীয়মান হলো (৬৫২ খ্রীঃ)

যুদ্ধে জয় হলো। কিন্তু গ্রীক সুন্দরীকে নিয়ে বড়ই সমস্যা দেখা দিল। গ্রীক সমরের সুন্দরী আজ বন্দিনী বেশে সেনাপতি আব্দুল্লাহর সমীপে হাজির। আব্দুল্লাহ্ বারবার আহ্বান জানাচ্ছেন—কে আছো সেনাপতি গ্রিগোরিয়াসের হত্যাকরী। তিনি যেন এগিয়ে আসেন, আমি আমার কথামত এই সুন্দরীকে তাঁর হাতে সমর্পণ করতে চাই। কিন্তু একজন সেনাও তাঁর নিকটে এলো না। নিরুপায় আব্দুল্লাহ্ পরামর্শের জন্য ডাক দিলেন মহাবীর যুবাইরকে। যুবাইর আসা মাত্র গ্রিগোরিয়াস কন্যার চেহারা একেবারেই বিবর্ণ হয়ে গেল। ভীষণভাবে আর্তনাদ করে উঠলেন। সেনাপতি আব্দুল্লাহর আর বুঝতে বাকি রইল না, কে এই সুন্দরীর পিতৃহন্তাকারী। তখন আব্দুল্লাহ বীর যুবাইরকে অনুরোধ করলেন—স্বর্ণমুদ্রা ও এই সুন্দরীকে উপহার স্বরূপ গ্রহণ করতে।

যুবাইর সোজাসুজি উত্তর দিলেন—না। আব্দুল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন—কেন? যুবাইর উত্তর দিলেন—"স্বর্ণমুদ্রা ও কোন সুন্দরীর জন্য আমি যুদ্ধ করি না। যুদ্ধ করি ইসলামের জন্য।" আব্দুল্লাহ তখন এই সুন্দরীকে নিয়ে খুব সমস্যায় পড়লেন। এই ব্যাপারে আর কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। কেউ কেউ বলেন, আব্দুল্লাহ তাঁকে আপন শিবিরে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, কেউ বলেন অন্য এক আরব যুবকের হাতে অর্পণ করেছিলেন, কেউ বলেন সুন্দরী আত্মহত্যা করেছিলেন। যাই হোক, এই সুন্দরী গ্রীক বালার ভাগ্যে কি ঘটেছিল—তা আর সঠিকভাবে বলা যায় না। একটি বড় বিজয়ের পর খলিফার দরবারে ঐ সংবাদটি পৌঁছিয়ে দেওয়া একটি বড় গৌরবের জিনিস ছিল। সেনাপতি আব্দুল্লাহ বীর যুবাইরকে ঐ গৌরবজনক দায়িত্বটি দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করলেন। বীর যুবাইর বীর বেশেই মদীনায় ফিরে গেলেন। মুসলিম বীরদের অমিত শক্তির রহস্য ছিল 'ইসলাম'।

ত্রিপলীতে গ্রীকদের শোচনীয় পরাজয়ের পর ওখানকার আমির ২৫ লক্ষ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিয়ে আরব সেনাপতির সাথে সন্ধি স্থাপন করে তাঁদের প্রজা-সত্ত্বে স্বাক্ষর দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপলীর অন্যান্য ছোট ছোট রাজন্যবর্গ আপনা হতেই আরবদের বশ্যতা স্বীকার করে বসবাস করতে থাকলেন।

অতঃপর আব্দুল্লাহ আলজিরিয়া ও মরক্কো জয়ের জন্য খলিফার নির্দেশ চেয়ে পাঠালে খলিফা আব্দুল্লাহ বিন হাসীন ও আব্দুল্লাহ বিন কায়েসকে ঐ দুই অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা সার্থকভাবে নেতৃত্ব দিলেন। আলজিরিয়া এবং মরক্কো দুটোকেই অধিকার করলেন। আরো কিছু কিছু নূতন এলাকা অধিকৃত হলো। মরক্কোর উত্তরে আর একটি স্বর্গপুরীর অবস্থান। যেখানে মরুময় ধু ধু বালুকারাশির পরিবর্তে সুজলা সুফলা, শস্যশ্যামলা স্পেন রাজ্য। এবার আরবগণ স্পেনের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। বিশাল সমুদ্র বাধ সাধল। অত:পর আরব অভিযান আপাত স্থগিত রইল। সেনাপতি আবদুল্লাহ এই সমস্ত নূতন বিজিত দেশগুলোর জন্য আবদুল্লাহ বিন কায়েসকে তথাকার গভর্নর নিযুক্ত করে বিজয়ী বেশে আপন দুর্গ মিশরে ফিরে এলেন।

ফলাফল

মুসলমানদের জন্য ত্রিপলী বিজয় ছিল সুদূর স্পেন বিজয়ের দ্বারোদ্ঘাটন। ত্রিপলী বিজয়ে রোমানদের মিশর উদ্ধাবের স্বপ্ন দিবাস্বপ্নে পরিণত হয়। ত্রিপলী বিজয় মুসলমানদের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে শতগুণে বৃদ্ধি করে রোমানদের

মনোবলকে পূর্ণভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। ত্রিপলী বিজয়, সেনাপতি আবদুল্লাহকে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতিব গৌরবে গবীযান ও অসামান্য মান-সম্মানে মহীয়ান করে তোলে। ত্রিপলী বিজয়ে আবব শক্তি কত অনিবার্য ও অমোঘ তা রোমানদের সম্যকভাবেই বুঝিয়ে দেয়। ত্রিপলী বিজয় সমগ্র ইউরোপে আরব বীরত্বকে প্রবাদতুল্য করে তোলে। ত্রিপলী বিজয় আরবকে দান করেছিল অপরিমিত ধন-রত্ন, অপবিমিত মান-সম্মান, অপরিমিত মনোবল, অপরিমিত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অপরিমিত ভবিষ্যৎ। সেইজন্যই ইসলামের ইতিহাসে এই যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। এই যুদ্ধ ছিল মুসলমানদেব জন্য বহির্বিশ্বে বীরত্বের প্রথম পদক্ষেপ।

এই যুদ্ধে জয়লাভ করলে খলিফা সেনাপতি আবদুল্লাহকে কিছু পুবস্কাবের কথা দিয়েছিলেন। ইসলামে জেহাদের নিয়ম ছিল যুদ্ধে জয়লাভ হলে যুদ্ধলব্ধ ধনরাশির ১/৫ অংশ সরকারি কোষাগারে জমা পডবে এবং ৪/৫ অংশ সেনাবাহিনীর মধ্যে বিতরণ করা হবে। খলিফা কথা দিযেছিলেন যুদ্ধে জিতলে বাইতুল মালের (১/৫) অংশ হতে সেনাপতিকে ১/৫ অংশ পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হবে। কিন্তু ওটা দেওয়ার সাথে সাথে জনসাধারণ তীব্রভাবে খলিফার সমালোচনা আরম্ভ করলে খলিফা বাধ্য হলেন ঐ সম্পদরাশি সাধারণের কোষাগারে ফিরিয়ে দিতে। সেনাপতি আবদুল্লাহ্ জলযুদ্ধে অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারে খলিফা ওসমানের খেলাফতকে চরম গৌরব দান করলেও আপন দুধ-ভাই আবদুল্লাহকে কেন্দ্র করে খলিফাকে কম অশান্তি ও দুর্নাম পেতে হয়নি।

মুসলিম নৌবাহিনীর ইতিহাস

(খলিফার কৃতিত্ব)

(History of Muslim Nave and its impact)

৬৪৯ খ্রী: ২৮ হিজরী-খিলাফতকাল-৪র্থ-৫ম বর্ষ

এই বিশ্বে, এই সংসারে যা কিছু ঘটে প্রয়োজনের তাগিদে। মুসলিম নৌবহরও একদিন গড়ে উঠল তাঁদের প্রয়োজনের তাগিদে। তখন খলিফা ওমরের খেলাফতকাল। সিরিয়াতে আমির বা গভর্নর মুয়াবিয়া। দূরদর্শী গভর্নর গ্রীক আক্রমণ হতে মুসলিম দেশগুলোকে রক্ষা বা নিরাপদ করার তাগিদে ভূমধ্যসাগরে মুসলিম অধিকার স্থাপন করার প্রয়াসে মুসলিম নৌবহর গড়ার প্রয়োজন ভীষণভাবেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন

স্থলযুদ্ধে মুসলিম বাহিনী সারা বিশ্বে অজেয় প্রতিপন্ন হলেও জলযুদ্ধে তাঁদেব এখনও হাতে-খড়ি হয়নি। এই উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করার মহালক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমির মুযাবিয়া খলিফা ওমরকে বার বার বুঝাবার চেষ্টা করলেন মুসলিম নৌবহরের প্রয়োজন কত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য দেশ জয় করা অপেক্ষা আপন দেশকে রক্ষার্থেই এটার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

আমিব মুয়াবিয়া খলিফাকে জানালেন গ্রীকদের লেভাস্ট শহর সিরিযার মুসলমানদের জন্য কত বিপজ্জনক । শহরটি সিরিয়ার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। ওখানে গ্রীকদের স্থলবাহিনীব অন্যতম সেনানিবাস তথা জনযুদ্ধের জন্য শক্তিশালী নৌবহর ছিল। এই শহর হতেই তাঁরা সমগ্র সিরিয়ার পশ্চিম উপকূল ও এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ উপকূল মহাদর্পে শাসন করত। এই অঞ্চলে কারোও মাথা তোলার উপায় ছিল না। আমির মুয়াবিয়া অত্যন্ত অনুনয়-বিনয় ও যথাসম্ভব গুরুত্ব দিযে খলিফাকে বুঝালেন দ্বীপটি আমাদেব এত নিকটে যে, ভোরের বেলায় আমরা তথাকার মোরগের ডাক্ ও কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনতে পাই এবং এই দ্বীপের পার্শ্বে বিশাল সমুদ্র বক্ষ, যেখানে মুসলমানদের জন্য তিলার্ধ পরিমাণ স্থান নাই। অথচ এই পৃথিবীব দু ভাগই জল। জলভাগে যদি মুসলমানগণ অধিকার বিস্তাব করতে না পারে, তাহলে তাদের জয় চিরদিনই অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। এককথায় আমির মুয়াবিয়া খলিফাকে মুসলিম নৌবহরের গুরুত্ব বুঝাতে তাঁর সর্বরকমের চেষ্টা করেছিলেন। যাতে ঐ দ্বীপটি অধিকার করা যায়। খলিফা আমিরের সমস্ত কথা শুনে মিশরের আমির আমর-ইবনুল আ'সের পরামর্শ চাইলেন। আমর খলিফাকে অন্যরকম বুঝিযে দেওয়ায় খলিফা আমির মুয়াবিয়ার শত ইচ্ছা সত্বেও তাঁকে নৌবহরের বা নৌযুদ্ধের জন্য কোন অনুমতি দিলেন না। ফলে আমির মুয়াবিয়ার মনেব ঘোড়া মনেই বন্দী রয়ে গেল। কেউ কেউ মনে করেন—আমর ঈর্ষাবশত খলিফাকে সঠিক পরামর্শ দেন নাই। আমিব মুয়াবিয়া তাঁর মনের অদম্য ইচ্ছাকে মনেই চেপে রাখলেন।

অতঃপর এসে গেল হযরত ওসমানের খেলাফত কাল। তখন তাঁর খেলাফতের দ্বিতীয় বর্ষ। ২৫ হিজরী, ৬৪৭ খ্রীঃ। এবার মুয়াবিয়া তাঁর মনের দুরন্ত ঘোড়াটিকে দ্রুত বেগে ছুটাবার সুযোগ পেলেন। খলিফার অনুমতি কামনা করার সাথে সাথেই খলিফা অনুমতি দিলেন. সাহায্য দিলেন, প্রচুর সেনাও দিলেন। আ'মির মুয়াবিয়া ঝড়ের গতিতে এবার আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, তিফালিশ শহর অধিকার করে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত লেভাস্ট

শহরের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়ে শহরটিকেও অধিকার করে মুসলিম অঞ্চলকে বিপদমুক্ত করলেন। আমির মুয়াবিয়ার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হলো। মুয়াবিয়ার দূরদর্শিতা সত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো।

কাজ কি করে করতে হয়, কি করে করাতে হয়, এই অধ্যায়ে আমির মুয়াবিয়ার কোন তুলনা ছিল না। সবেমাত্র ২৭ হিজরী পড়েছে। আমির খলিফার নিকট অনুমতি চাইলেন—বিশাল নৌবাহিনী প্রস্তুত করতে। উদ্দেশ্য এবার সাইপ্রাস। সাইপ্রাস ছিল আরববাসীদের নিকট এতদিন স্বপ্নের দেশ। আমির খলিফাকে জলযুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভয়শূন্য করার চেষ্টা করলেন, নানা যুক্তি, নানা উপমা, নানা ঘটনা, নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি খলিফাকে মুগ্ধ ও সম্মত করতে সক্ষম হলেন। খলিফা আমিরকে এই বলে অনুমতি দিলেন—"তোমার কথা যদি সত্য হয়, তা হলে সাইপ্রাস অভিযানে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে আমি তোমাকে শর্ত ও সতর্ক করে দিলাম,—যারা স্বেচ্ছায় জলযুদ্ধে যোগদান করতে চায়, তুমি কেবলমাত্র তাদেরকেই সেনাদলে ভর্তি করবে। একজনকেও জোর করে ভয় দেখিয়ে যোগদান করতে বাধ্য করবে না। আমার ফরমান সকলকে পড়ে শুনিয়ে দেবে।"

আমির মুয়াবিয়া খলিফার অনুমতি লাভ করে অতি আনন্দ ও উৎসাহের সাথে নৌ-বাহিনী গঠনে তৎপর হয়ে উঠলেন। সমগ্র রাজধানীতিতে সাজ্ সাজ্ সাড়া পড়ে গেল। আরব বীরের জাতি, দুঃসাহসিক কাজে যারা চির অভ্যস্ত, বিপদসংকুল যাত্রা যাদের আনন্দের অভিযান, মারো কিংবা মরো—এই যাদের জন্মগত অভিলাষ, সহজাত প্রকৃতি, সেই বীরের জাতি আরব দলে দলে মুসলিম নৌবহরে যোগদান করে জাতীয় জীবনে নৌবহরের দ্বারোদঘাটন করলেন—প্রাণের উচ্ছ্বাসে, হৃদয়ের উদ্বেগে, মনের আনন্দে, শরীরের শিহরণে নিত্য নতুন নব নব জাগরণে।

স্বপ্নের সাইপ্রাস জয় :

এইভাবে হিজরীর ২৮ সনে ৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে গড়ে উঠল বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম নৌবহর। এই নৌবহরের সাথে যে দুটো নাম অমর হয়ে থাকল—খলিফা ওসমান ও আমির মুয়াবিয়া। আব্দুল্লাহ বিন কায়েস আল হারিসের নেতৃত্বে গড়ে উঠল আরব নৌবহর। খলিফা যার অনুমতি দিলেন, আমির তার আদেশ দিলেন, আব্দুল্লাহ তা গড়ে তুললেন। এটা ছিল মুসলমানদের জন্য বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন ও সূচনা অধ্যায়।

নূতন এক নৌবহর নিখিল বিশ্বে এগিয়ে চলল—নিখিলের কানে এক

নতুন আওয়াজ তুলে—'আল্লাহু আকবর্'। এই তকবির ধ্বনিটি মুসলিম বাহিনীকে বিপদে দিয়েছিল মহাশক্তি, আমোদে দিয়েছিল শুক্রিয়া (আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ)। মহানবী তাঁর উম্মতদের এমন একটি মহান মন্ত্র দিয়ে গেছেন—যা তাঁদের আনন্দে ও নিরানন্দে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। যেমন মুসলমানদের মিলাদ শরীফ। ৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম রণতরী নিরাপদে সাইপ্রাসে পৌঁছাল। সাথে সাথে তথাকার গ্রীক বাহিনী তাঁদের গতিরোধ করলেন। আরম্ভ হলো ভীষণ যুদ্ধ। নৌযুদ্ধে অনভ্যস্ত আরব দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত গ্রীকদের সাথে তালে তাল দিয়ে যুদ্ধ চালাতে থাকল। হঠাৎ সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন কায়েস গুরুতরভাবে আঘাত প্রাপ্ত হলে সুফইযান্ বিন আউফ্ নামক অন্য বীর পতাকা হাতে নিলেন। ভীষণ যুদ্ধ ভয়াবহ গতিতে চলতে থাকল। তখনও জয় পরাজয় অনিশ্চিত। ইতিমধ্যে আমির মুয়াবিয়ার অনুবোধক্রমে খলিফার অন্য একটি সুদক্ষ বাহিনী আব্দুল্লাহ ইবনে আবু সারার নেতৃত্বে এসে যোগদান করল।

সাথে সাথে যুদ্ধের গতি অন্য দিকে মোড় নিল। সম্মিলিত বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে গ্রীকগণ দিকভ্রান্ত হয়ে সমরক্ষেত্র ত্যাগ করল। বিজয়ী আরব বাহিনী সাইপ্রাস অধিকার করল। বহু গ্রীক সেনা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। বহু মারা যায়। সর্বশেষে সাইপ্রাসে অধিবাসীগণ কয়েকটি শর্তে মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে। আমির মুয়াবিয়ার নির্দেশক্রমে সাইপ্রাসের শাসনকর্তা বার্ষিক ৭০ হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) কর আদায়ের শর্তে সন্ধিতে স্বাক্ষর করলেন। এখানে আমির মুয়াবিয়া জানিয়ে দিলেন দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা তাঁরাই পরিচালনা করবেন। তবে বিদেশী নীতি নির্ধারিত হবে মুসলমানগণ কর্তৃক। আমির মুরাবিয়া তাঁদের উপর অতিরিক্ত কোন জিজিয়া করও নির্ধারণ করলেন না। যেহেতু কোন শত্রু হঠাৎ তাদের আক্রমণ করলে তাদেরকেই মোকাবিলা করতে হবে, তখন মুসলিম বাহিনী তাদের নিকট সব সময় থাকবে না। তাদের ধর্ম, কর্ম, আচার ব্যবহারে কোনরূপই হস্তক্ষেপ করা হয়নি।

মুসলিম নৌবহরের ইতিহাসের সাথে এই অভিযানের প্রথম সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন কায়েসের নাম চির বিজড়িত হয়ে আছে। মুসলিম নৌবহর তাঁরই অমরকীর্তি। এই অনন্যসাধারণ বীর গ্রীকদের সাথে এক যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন আবু সারাহও এই অধ্যায়ে কম খ্যাতি অর্জন করেন নি। এমনকি তিনি যদিও স্থলযুদ্ধে অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন, তবুও তিনি ইসলামের ইতিহাসে নৌবহরেই অসামান্য বীররূপে বেশি পরিচিত।

সাইপ্রাসের ইতিকথা :

সাইপ্রাস দ্বীপের গ্রীক নাম ছিল—কাইপ্রস্ (Kypros)। এই কাইপ্রস্‌কে আরবগণ 'কব্‌রস' নামে ডাকত। ইহা সিরিয়াব ৬০ মাইল দূরে অবস্থান করছিল। বর্তমানে এই দ্বীপের লোকসংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ। যারা জাতিতে অধিকাংশই গ্রীক, মুসলমান এক লক্ষের মত। মাউন্ট ওলিম্পিস্ ওখানকার বিখ্যাত পর্বত। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে এখানকাব 'তামা' জগদ্বিখ্যাত। তাই কাইপ্রস শব্দটি হতেই কপার (copper) শব্দটি জন্ম নিয়েছে। সাইপ্রাস বহু প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। এই দ্বীপটিকে গ্রীকগণ অধিকার করে খ্রীস্টের জন্মেরও প্রায় দেড হাজার বছর আগে। তখন হতেই এখানে গ্রীক সভ্যতা গডে ওঠে। খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতকে ফিনিশীয় নামক একজাতি এখানে বসবাস আরম্ভ করে। এই দ্বীপ বহুজনের দ্বারা হাত বদল হলেও এখানে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন এখানকারই রাজাগণ। খ্রীস্টপূর্ব ৩০৩ সনে ইহা গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডারের অধিকারে আসে। পরে মিশরের অধীনে দেখা যায়। খ্রীস্টপূর্ব ৫৩৮ সনে রোমানগণ ওখানে ঔপনিবেশ গড়ে তোলেন। সর্বশেষ মুসলমানগণ ৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে যখন এই দ্বীপ অধিকার করেন, তখনও ওটি পূর্ব বোমান (বাইজানটাইন) সম্রাটেব অধীনে ছিল।

মধ্য এশিয়ায় বিদ্রোহ, পদচ্যুতি ও পদোন্নতি

কুফা ও বসরা :

ইসলামেব ইতিহাসে মক্কা ও মদীনাকে বাদ দিয়ে যে কয়েকটি শহরের মান ও মর্যাদা আজও অম্লান, ইরাকেব বসরা ও কুফা তাদের অন্যতম। সেদিনের ইতিহাসে উত্তর ইরাকেব রাজধানী ছিল কুফা, এবং দক্ষিণ ইরাকের রাজধানী ছিল বসরা। কুফা মদীনার পর হযরত আলীর যুগে ইসলামি সাম্রাজ্যের রাজধানী হওয়াব গৌবব লাভ কবে। বসরা ছিল ইরাকের দক্ষিণে এবং আরব ও আযমের মিলন মোহনায়। সেদিনের কুয়েতও ছিল দক্ষিণ ইরাকের শাসনাধীনে। হযরত ইব্রাহিমের যুগ হতে ইমাম আবু হানিফা পর্যন্ত বহু নবী বহু মনীষার পদস্পর্শে ধন্য ইরাকের প্রাচীন কুফা ও নবীন কুফা নগরী। আবার বসরাও স্বনামধন্য সূফী সাধক হযবত হাসান বসরী ও হযরত আবেদা রাবেয়ার পুণ্যময় স্মৃতিতে চিরধন্য। একদিন ইসলাম জগতে মুক্তি চিন্তার যে বেগবান স্রোত প্রবাহিত হযেছিল, তা এখানেই গতি লাভ কবেছিল।

ইসলামের দ্বিতীয খলিফা হযবত ওমবের যুগে এই বসরা শহব একদিন আন্তর্জাতিক বন্দরে পরিণত হয। সেদিনের বসরা ইসলামের সূফী সাধকেব পুণ্যতীর্থ হতে পৃথিবীব অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। বসরা জন্ম দিয়েছিল একদিকে আধ্যাত্মিক ও সূফী জগতেব সুমহান ব্যক্তিদেব যাঁদেব স্মৃতি ইসলাম জগতে আজও অম্লান, আবার তুলে ধবেছিল সংসারক্ষেত্রে সফলতার চূড়ান্ত বাহন ব্যবসা-বাণিজ্য। সুতবাং সেদিনেব বসবা দ্বীন ও দুনিয়াকে এক সাথে তুলে ধবাব অসাধারণ শক্তি ধাবণ কবেছিল। আবার প্রকৃতি জগতেও তাব অবদান ছিল প্রবাদতুল্য —বসরার গোলাপ।

মূসা-আল্-আশারীর পদচ্যুতি :

হযরত ওমর ফারুক মূসা-আল্-আশারীকে বসবাব গভর্নর নিযুক্ত কবেছিলেন। মূসা তাঁব খেলাফতকালে খুবই যোগ্যতার পরিচয দিযেছিলেন। হযরত ওমর ফারুকের সময় যে সমস্ত রাজকর্মী যোগ্যতার মানদণ্ডে অতি উচ্চমানের পরিচয় দিয়েছিলেন তার পেছনে একটি রহস্য লুকিয়েছিল। কেননা তাঁব খেলাফতকালে দেখা গিয়েছিল প্রায় সকলেই যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। আবার ঐ একই রাজকর্মচারীবৃন্দ যখন অন্যজনের খেলাফতকালে এলেন, তখন দেখা যাচ্ছে তাঁদেব অধিকাংশই অযোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন। এখানে দেখা যাচ্ছে—হযবত ওমরের মত বিরাট ব্যক্তিত্বশালী মানুষের সম্মুখে খোঁড়া মানুষকে ও খাড়াভাবে দাঁড়িযে থাকতে হয়েছে। আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অন্যের সম্মুখে সুযোগ বুঝে ভাল মানুষও খোঁড়া হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এগুলো ঘটে থাকে ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও ব্যক্তিত্বের অভাবে। হযরত ওমরের পব ইসলামি সাম্রাজ্যে ও মুসলিম প্রশাসনে আমরা এই তত্ত্বটি ভালভাবেই উপলব্ধি করলাম। চারজন খলিফার পর যে ব্যক্তিটি ইসলামের সাম্রাজ্যের কর্ণধার রূপে পরিগণিত হলেন তিনি আমির বা গভর্নর মুযাবিয়া। তখনকার দিনে ইসলামি সাম্রাজ্যে যতগুলো গভর্নর ছিলেন, মুয়াবিয়া ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিধর। এই মুয়াবিয়াকে তাঁর সর্বনিম্ন ভৃত্য যতটা ভয় করতেন, মুয়াবিয়া তা অপেক্ষা শতগুণে ভয় করতেন ফারুকে আযম হযরত ওমব ফারুককে। শাসনের শরীর এখানেই প্রাণ পেয়েছিল। এইটিই ছিল শাসন রহস্য।

মূসা-আল-আশারী প্রশাসনে অত্যন্ত যোগ্যতাব পবিচয় তুলে ধরেন। পরবর্তীকালে কয়েকটি বিশেষ কারণে তাঁর চরিত্রে কিছুটা পরিবর্তন এসে যায়। যেমন দীর্ঘদিন একই পদে একই স্থানে ছিলেন। যার ফলে কিছু সংখ্যক মানুষ তাঁর একান্ত আপন বা পেটোয়া হয়ে যায়। এবং কিছু সংখ্যক তাঁব চোখেব বালিতে পবিণত হয়। যার ফলে প্রশাসনে দেখা দেয দলবাজি।

তিনি প্রভূত শক্তি হাতে পেয়ে নিজেকে লাগাম ছাড়া ঘোড়ার মত করে ফেলেন। আত্মম্ভরিতাও বেড়ে যায়। এমনকি হযরত ওমরের সময় হতেই এই দোষ-ত্রুটি দুর্বলতা তাঁর চরিত্রে ফুটতে থাকে। কিন্তু ওমরের ন্যায় মানুষ খলিফা থাকার জন্য তাঁকে সদাই সতর্কও থাকতে হতো। কেননা হযরত ওমর কোন একজন গভর্নরকে তাঁর পদস্খলনের জন্য গো-সেবকের পদে নিযুক্ত করেন। প্রশাসনে পৃথিবীর ইতিহাসে এই দৃষ্টান্তটির দ্বিতীয় উপমা আজও খুঁজে পাওয়া যায় না। গভর্নর মূসা সেটা ভালভাবেই জানতেন। কিন্তু হযরত ওমরের পর গভর্নর মূসার ব্যবহার আচরণ সব কিছুই যেন দায়বদ্ধতার উর্ধ্বে চলে গেল। জনগণ খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। বিশেষ করে কারদুন নামক অঞ্চলের মানুষ প্রকাশ্যে গভর্নরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো।

এই বিদ্রোহ ঘোষণা একটি জিনিসকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল। একদিন গভর্নর মূসা মসজিদে জেহাদ সম্পর্কে একটি জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। তিনি সকলকে সম্বোধন করে বললেন—'আল্লাহর পথে জেহাদে কোন মানুষের লোভ লালসা থাকা ঠিক না, ভোগ-বিলাসের আশা থাকা উচিত না। যুদ্ধযাত্রাকালে উট, ঘোড়া প্রভৃতির দাবী করা অনৈসলামিক। পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করতে যাওয়াটাই সর্বাপেক্ষা উত্তম যাত্রা। মানুষ জেহাদে যত কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করবে,জেহাদ তার নিকট ততই মূল্যবান হয়ে উঠবে। আল্লাহর নিকট সে তার মহান প্রতিদান পাবে। এই যুদ্ধযাত্রার আগের দিন তিনি এরূপ একটি সার-গর্ভ বক্তৃতা দান করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর ভাষণ অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে শুনলেন। এবং সঠিক জবাব দেওয়ার জন্যও তৈরিও হলেন। তাঁরা গভর্নর মূসাকে সম্যকভাবে জানতেন। তাই নীরবে অপেক্ষা করছিলেন মূসার ব্যক্তি আচরণকে লক্ষ্য করার জন্য।

পরদিন প্রভাতে সকলেই হাজির হয়েছেন গভর্নর মূসার সাথে যুদ্ধযাত্রা করতে। গভর্নর মূসা তাঁর বিরাট রাজপ্রাসাদ হতে বের হচ্ছেন—একটি অসাধারণ সুন্দর তুর্কী ঘোড়াতে চেপে, এবং পেছনে সারিবদ্ধ ৪০টি গাধা ও মালবাহী খচ্চর, যারা মূসার আসবাবপত্র বহন করছে। বিশাল জনগণ সঙ্গে সঙ্গে মূসার সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন, মূসা ভাবলেন তাঁরা তাঁকে কুর্নিস যোগে সালাম দেবেন। কিন্তু তা হলো না। জনগণ পবিত্র কোরআনের সূরা সাফার কিছু অংশ তাঁর সম্মুখে তুলে ধরে বুঝিয়ে দিতে বলেন, "হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যা করো না, তা তোমরা কেন বলো? তোমরা যা করো না তা তোমাদের বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক। যারা আল্লাহর পথে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের ন্যায় সংগ্রাম করে, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন"—কোরআন ৬১ : ২ – ৪।

গভর্নর মূসা তখন নীরব। কিন্তু জনগণ তখন সরব। এবার জনগণ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন—"যে কাজ করেন না, সে কথা কেন বলেন। আপনার কথা ও কাজে এত পার্থক্য কেন, বুঝিয়ে দিন। না বুঝিয়ে দিতে পারলে, জেহাদ প্রথম আপনারই বিরুদ্ধে হবে। কেননা ইসলামের জেহাদ কোন মানুষ, কোন সমাজ বা কোন দেশের বিরুদ্ধে নয়। ইসলামের জেহাদ হবে কেবলমাত্র অন্যায়ের বিরুদ্ধে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে।" এই মুহূর্তে গভর্নরের পায়ের বিষ মাথায় উঠেছে। জেহাদও মাথাতে উঠেছে। কিন্তু করার কিছুই ছিল না, কেননা ইসলাম দীনাতিদীন ভিখারীকেও দিয়েছে চরম বাকস্বাধীনতা, স্বয়ং সম্রাটের বিরুদ্ধেও। (আজকের চরম সভ্যতার যুগেও মানুষ ঐ স্বাধীনতার এক শ' ভাগের এক ভাগও ভোগ করতে পারছে না।)

যাই হোক, জনগণ নাছোড়বান্দা। তাঁরা গভর্নরের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ ভাবেই খলিফা ওসমানের দরবারের মদীনাতে হাজির হলেন। খলিফা সমস্ত কাহিনী শুনলেন। জনগণের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন। ২৯ হিজরীতে খলিফা ওসমান গভর্নর মূসার ব্যবহারে খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পদচ্যুত করে তাঁর স্থলে আব্দুল্লাহ বিন আমরকে গভর্নর নিযুক্ত করলেন।

আব্দুল্লাহ বিন আমর বসরার মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানের উপযুক্ত গভর্নর ছিলেন না। তাই অল্পদিনের মধ্যেই খলিফাকে আবার তাঁর স্থলে অন্যজনকে গভর্নর নিযুক্ত করতে হয়। যাঁর নাম ছিল আব্দুল্লাহ বিন আমীর, যিনি ছিলেন খলিফার আপন মামাতো ভাই। এখানে খলিফার বিরুদ্ধে স্বজন-পোষণের প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। .এমনকি হজর গোত্রের লোকেরা খলিফাকে বিদ্রূপ করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"আপনার কি কোন তরুণ পুত্র নাই, যিনি এই ভারী গুরুত্বপূর্ণ পদটি অলংকৃত করতে পারেন?" খলিফা এর কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি। তবে একথাও সত্য যে নূতন গভর্নর ভীষণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন, আবার দুর্নামও অনেক কুড়িয়েছিলেন—আপন লোকজনদের বড় বড় পদে বসিয়ে। এটা ছিল উমাইয়াদের বিরুদ্ধে খুব বড অভিযোগ। খলিফা ওমরেব আমলে একথা কেউ মুখেও আনতে পারেনি।

মধ্য এশিয়ার বিদ্রোহ দমন

খোরাসান বিদ্রোহ :

খোরাসান ছিল—পূর্বাঞ্চলের একসাথে উন্নত, সমৃদ্ধ ও বিপজ্জনক প্রদেশ। বসরার শাসনকর্তাকেই এই পূর্বাঞ্চল শাসন করতে হতো। আজ আর খলিফা ওমর নাই। গভর্নর মূসা নাই, সুতরাং খোরাসান যে বিদ্রোহ করবে, এটা মোটামুটি সবাই জানতো। হিজরী ৩০ সনে আবু মূসাব বিদায় গ্রহণের সুযোগে খোরাসান তার আপন স্বভাবজাত শক্তিতেই স্বাধীন মনোভাবের পরিচয় দেয়। নূতন ও নবীন গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন আমীর, সাঈদ বিন-আল-আ'স্‌কে সেনাপতি নিযুক্ত করে খোরাসান অভিযানে নির্দেশ দেন। ওদিকে স্বয়ং খলিফা ওসমান মদীনা হতে একটি দলকে খোরাসানের পথে প্রেরণ করেন। এই দলে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন—ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইব প্রমুখ। আনন্দের কথা সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন আমীর খোরাসানে পৌঁছবার পূর্বেই মুসলিম বাহিনী খোরাসানে আবার ইসলামের শান্তি পতাকা উত্তোলন করেন। এইভাবে খোরাসান-জর্ডন ও তাবারিস্তানের বিদ্রোহ দমিত হয়।

নিশাপুর বিদ্রোহ :

অতঃপর সেনাপতি সাঈদ বিন আল আস অন্যান্য বিদ্রোহ ও বিজযের দিকে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত তিনি এই অভিযান পরিচালনা কবতে পাবেন নি। কেননা ইতিমধ্যে খলিফা কুফার গভর্নরকে পদচ্যুত করে সেনাপতি সাঈদকে ওখানকার গভর্নর নিযুক্ত করলে তিনি রণাঙ্গন হতে বিদায় নিয়ে কুফাতে হাজির হন। এই পরিস্থিতিতে বসরার গভর্নর আব্দুল্লাহকে নিজেই নিশাপুর অভিযান পরিচালনা করতে হয়। আব্দুল্লাহ অনুধাবন করতে পেবেছিলেন—দুর্ধর্ষ তুর্কী জাতিকে পরাস্ত না করা পর্যন্ত বিজয় সম্পূর্ণ হবে না ও বিদ্রোহও থামবে না। এই চিন্তাধারাতেই তিনি তুর্কীস্থান বিজয়ের নিমিত্ত হিরাট ও সাজিস্তান জয় করে নিশাপুরের দিকে অগ্রসর হন। কয়েক মাস নিশাপুর অবরুদ্ধ করার ফলে তারা খলিফাকে বার্ষিক ৭ লক্ষ দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) কর দানে সম্মত হযে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন আমীর মাউরাউন নাহারের দিকে অগ্রসব

হলেন, এবং আব্দুল্লাহ বিন কায়েসকে সরখাসের দিকে প্রেরণ করেন। উভয় অভিযানই সম্পূর্ণভাবে সফলতা লাভ করে। এই দুই অভিযানে মুসলিম বাহিনী প্রচুর ধন-সম্পদও লাভ করেছিলেন। খলিফা ওসমানের খেলাফতকালে আব্দুল্লাহ বিন আমীর একজন সুদক্ষ গভর্নর ও দুর্ধর্ষ সেনাপতির পরিচয় দেন। তবে তাঁর চরিত্রে স্বজন-পোষনের মাত্রা একটু বেশি ছিল। এই কারণে খলিফাকেও বহু নিন্দার ভাগী হতে হয়েছিল।

উত্তর সীমান্তে বিদ্রোহ দমন :

খলিফা একটির পর একটি বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহের গভীর জঙ্গলে একটির পর একটি বিদ্রোহী-বৃক্ষ জন্ম নিতেই থাকে। খলিফা ওমরের সময় বিদ্রোহের এই জন্ম-হারটা অনেকটাই কমে গিয়েছিল। আর্মেনিয়া বশ্যতা স্বীকার করলেও কোন কোন অঞ্চল বিদ্রোহ করতে বিরত ছিল না। খলিফা ৩১ হিজরীতে সিরিয় সেনাপতি হবীব বিন মুসলিম ফাহ্‌রী দ্বারা এই বিদ্রোহের মূল্যোৎপাটন করেন। অতঃপর ৩২ হিজরীতে খলিফাকে বিদ্রোহ দমনে বেশ কয়েকটি নূতন পদক্ষেপ নিতে হয়। অতি আকস্মিকভাবেই কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরবর্তী তুর্কী অঞ্চলে বিদ্রোহ আরম্ভ করেই একটি বর্বরোচিত দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়ে তথাকার সামান্য দেশরক্ষী আরব বাহিনীকে অতীব নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই অভাবনীয় কাহিনী খলিফার কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তিনি আর কালবিলম্ব না করেই সিরিয় বাহিনীকে তাঁদের সাহায্যার্থে যাওয়ার নির্দেশ দিলে সিরিয় বাহিনী অতি দ্রুততার সাথেই মেসোপটেমিয়া অতিক্রম করে তাইগ্রীস নদীর তীর ধরে রণাঙ্গনে উপনীত হয়। অতঃপর যা ঘটল, তা শুধু ইসলামের ইতিহাসের কলঙ্কই নয়, সেনা জগতের অসম্মান, আত্মম্ভরিতার এক উৎকট অভিনয়। সিরিয় বাহিনী তথায় হাজির হয়েই অভিনয় শুরু করল—তারা তথাকার ইরাকী বাহিনীর নেতৃত্বে যুদ্ধ করবে না। ইরাকী বাহিনীও তাদেরকে নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে সম্মত হলো না। পরিণতিতে দেখা দিল আরব বাহিনীর পূর্ণ বিপর্যয়। যার ফলশ্রুতি দেখা দিল অতি মারাত্মক। ইরাকী বাহিনীর সামান্য কতিপয় সৈনিক ব্যতীত সকলেই প্রাণ হারাল। উভয় পক্ষের জেদাজেদীর জঘন্যতম ফল ফলে গেল। পরিণতি আরো ভয়াবহ হলো। তুর্কীগণ ধরাকে সরা জ্ঞান করে সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিল। অতঃপর খলিফার বিশাল বাহিনী তথায় পদার্পণ করে বিদ্রোহী তুর্কীগণকে পুনরায় পদানত করে ইসলামের পতাকা সগৌরবে সর্বত্র উড্ডীয়মান করে।

খলিফা যখন নানা বিদ্রোহে নানা দিকে ব্যতিব্যস্ত, তখন অন্যান্য কিছু স্থানও নানা কৌশলে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াতে চেষ্টা করে। এগুলোর মধ্যে খুরাসন ছিল অন্যতম। ৩৪ হিজরীতে সেনাপতি আখক্ বিন কায়েস কর্তৃক তারা সম্পূর্ণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বিদ্রোহের আগুন নিজ হাতে নেভাতেই বাধ্য হলো। এখানে বার বার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কয়েকজন খোরাসান বিদ্রোহী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল।

ওলিদ বিন ওকবার পদচ্যুতি :

কুফার গভর্নর ওলিদ বিন ওকবা ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক। ইসলামের প্রথম দিকে না হলেও খলিফা ওমরের যুগেও যাঁরা যোগ্যতার ও দক্ষতার পরিচয় তুলে ধরতে পেরেছিলেন, তাঁরা কেউই কোন দিক দিয়েই কম মানুষ ছিলেন না। বেশি কিছু কমতি থাকলে, আর যাই হোক হযরত ওমরের খেলাফতে গভর্নর হওয়া যেতো না। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় ঐ সমস্ত দক্ষ প্রশাসকের অনেকেই পরবর্তী জীবনে পদস্খলনের শিকার হলেন। আমাদের মনে হয় এর পশ্চাতে ছিল হযরত ওমরের ন্যায় শাসকের শূন্যতা। যে শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল ঐ সমস্ত অনাসৃষ্টি। পরে যাঁরা ঐ শূন্যতার শিকার হয়েছিলেন, তাঁদেরও দোষ-ত্রুটি কম না। কেননা স্বয়ং মহানবীর তিরোধানের পর এরূপটি ঘটেনি তাঁর মহান সাহাবাদের মধ্যে।

কুফার অধিবাসীবৃন্দ গভর্নরের অসংযত আচরণের বিরুদ্ধে বার বার ইঙ্গিতবাহী বিদ্রোহ ঘোষণা করছিল। কিন্তু তিনি তাঁর শক্তির মাদকতায় সব ভুলে গিয়েছিলেন। ভুলে গিয়েছিলেন ইসলামের মহান আদর্শের কথা, মহানবীর জীবন-ধারা, পবিত্র কোরআনের অমিয় বাণী। তাই পড়েছিল তাঁদের উপর কেবলমাত্র খলিফার কোপদৃষ্টি নয়, মহান আল্লাহর অভিশাপ। একটি খুনের বিষয়ে গভর্নর তিনজনের প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। এই বিচারে বহু মানুষ গভর্নরের প্রতি রুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা ত্রুটি ছিল মদ্যপান। এমনকি অনেক সময় তিনি শ্রদ্ধেয় আলেম উলামাগণের সাথে কথা বলার পূর্ব মুহূর্তেও সুরা পান করতেন। শুধু তাই-ই নয়, মহা অপরাধ, মহা অন্যায়, মহা পাপ, তিনি নামায পড়তে যেতেন বা নামাযে ইমামতি (পরিচালনা) করতে যেতেন মদ-পান করেই, অনেক সময় জ্ঞানও থাকত না।

এইভাবে তিনি যখন সীমা লঙ্ঘন করলেন, তখন জনগণ তাঁর নিকট জানতে চাইলেন কোরআনের নিম্নলিখিত অংশ কি বলে—

"তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, তুমি বল—উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে। কিন্তু তাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।" সূরা বাকারাহ্ ২ : ২১৯

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা মদ্যপান অবস্থায় উপাসনার নিকটবর্তী হয়ো না, যে পর্যন্ত তোমরা যা বলো তা বুঝতে না পারো।"

সূরা নিসা, ৪ : ৪৩

"হে বিশ্বাসিগণ! মদ-জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী, ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা ত্যাগ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

সূরা মায়েদা ৫ : ৯০-৯৩

"(হে মানববৃন্দ), তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না, ২ : ১৯০, সীমা অতিক্রম করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমা অতিক্রমকারীকে ভাল বাসেন না।" ৫ : ৮৭

অতঃপর জনপ্রতিনিধি গভর্নরের সুরা পানের ও মত্ততার বিভিন্ন ঘটনার বিভিন্ন ফিরিস্তি খলিফার দরবারে মদীনাতে হাজির করলে খলিফা কাল বিলম্ব না করেই গভর্নরকে পদচ্যুত করে মদীনার দরবারে ডাক দিলেন। এবং সকলের সম্মুখে প্রকাশ্য দরবারে প্রাণদণ্ড অপেক্ষাও গুরুতর ও ভয়াবহ দণ্ড 'বেত্র-দণ্ডে' দণ্ডিত করে শাস্তির দৃষ্টান্তকে তুলে ধরলেন, ইসলামকে করলেন গরীয়ান, নিজে হলেন চির মহীয়ান। খলিফা এই শাস্তি দেওয়ার কালে মহানবীর একটি মূল্যবান কথা বার বার আবৃত্তি করেছিলেন।—

"হাসানাতুল আব্‌রার—সাইয়াতুল মুকার্‌রেবীন", (আল্লাহর নিকট) দূরস্থ ব্যক্তির জন্য যা পুণ্য, নিকটস্থ ব্যক্তির জন্য তা পাপ। অর্থাৎ অশিক্ষিত ব্যক্তির জন্য যেটা পুণ্য বা ভালকাজ সুশিক্ষিত বা দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য তা পাপ বা মন্দ কাজ। তাঁকে আরো অনেক উন্নতমানের কাজ করতে হবে—তাঁর পদও দায়িত্বানুসারে।

অতঃপর খলিফা তাঁর শূন্যপদে সাঈদ বিন আল আ'স নামক এক তরুণকে গভর্নর নিযুক্ত করেন। নূতন গভর্নরের প্রশাসনিক দক্ষতা ভালই ছিল। অন্যান্য গুণও ছিল। কিন্তু একটি বড় দোষ ছিল। তিনি ছিলেন কোরেশ বংশজাত সন্তান। অকোরেশীদের তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলমান বলে মনে করতেন। এটা ছিল তাঁর চরিত্রের মহাকলঙ্ক। এই কলঙ্কটিই পরে স্বয়ং খলিফার জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা ইসলামের চোখে এটা সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয়

কাজ। কুফাবাসীরা প্রায় সকলেই ছিলেন অকোরেশী। সুতরাং নূতন গভর্নরের সাথে জনগণের সম্পর্ক খুব একটা ভাল বা সুখকর হয়নি। এখানে খলিফারও কিছু ত্রুটি রয়ে গেল, তিনি কেন এরূপ একটি অকোরেশী বিদ্বেষী মানুষকে কুফার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন।

একথা নিশ্চিত যে, ইসলামকে সর্বপ্রথম যদি কেউ মরণ আঘাত হেনেছিল—সে ছিল কোরেশকুল, মহানবীকে দেশ ছাড়া করেছিল কোরেশকুল; ইসলামকে প্রথম আরবের মাটিতে দাঁড় করিয়েছিল মদীনার অকোরেশগণ, বিশ্বের দরবারে ইসলামকে প্রথম দাঁড় করালো আরব-ইরাক ও ইরানের অকোরেশকুল। পূর্বতন গভর্নর নিজে যাই করুন কুফাবাসীদের কোনদিনই ঘৃণার চোখে দেখেন নি। তাই অবস্থা কিছুটা সহনীয় ছিল। কিন্তু বর্তমান গভর্নর কুফা-বিদ্বেষী হওয়ায় অবস্থা অসহনীয় হয়েছিল।

সাইপ্রাসে দ্বিতীয় বিদ্রোহ দ্বিতীয় অভিযান :

২৮ হিজরীতে ৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে সাইপ্রাস আব্দুল্লাহ্ বিন ক্বায়েস ও মিশরের গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন আবিহ্ সারাহ্ কর্তৃক অধিকৃত হলে তথাকার শাসনকর্তা বার্ষিক ৭০ হাজার দিনার স্বর্ণমুদ্রা কর দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে মুসলমানদের সাথে একটা আপস রফা করেন। এবং এই করের সাথে কতকগুলো শর্তও ছিল। যে শর্তগুলোর প্রধান শর্ত ছিল তাঁরা গ্রীকদের সাথে কোনরকম সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না। এমনকি বিবাহ্ শাদীতেও না। এইভাবে তিন বছর কেটে গেল। অতঃপর পট পরিবর্তন দেখা দিল। এবার আমরা লক্ষ্য করবো কোন্ পরিস্থিতিতে তাঁরা আরব-বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন এবং কোন পরিবেশে তাঁরা আবার বিদ্রোহ্ করল, বিশ্বাসঘাতকতা করল।

তখনকার দিনে ইরানের রাজ্যসীমা বাদ দিলে সবই ছিল গ্রীকগণের। পরবর্তীকালে এই গ্রীক সাম্রাজ্য একটু একটু করে মুসলমানদের হস্তগত হতে থাকে। বিশাল রোমান-রাজ এটাকে কোনদিনই ভাল চক্ষে নেননি। তাঁরা এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সদাই প্রস্তুত থাকতেন। সাইপ্রাসও ছিল চিরদিন রোমান অধিকারে। ৩১ হিজরীতে রোমানগণ মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে সাইপ্রাসবাসীদের উত্তেজিত করতে থাকল। বাইজানটাইন গ্রীকগণ একটি বিশাল অভিযানের প্রস্তুতি সহ ছয় শত রণতরীকে সাইপ্রাস অভিমুখে সাগর বুকে ভাসিয়ে দিল। সাইপ্রাসের শাসনকর্তা এই যুদ্ধ জাহাজগুলোকে সাইপ্রাস এলাকায় আশ্রয় ও আতিথেয়তা দান করে আরবদের সাথে করল বিশ্বাসঘাতকতা।

আমির মুয়াবিয়া সাইপ্রাসবাসীদের এই সন্ধি ভঙ্গে ও বিশ্বাসঘাতকতার

কথা খলিফার কর্ণগোচর করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলেন, সাইপ্রাসবাসী রোমানদের যোগ্য উত্তর দেওয়ার জন্য। দূরদর্শী খলিফা বুঝতে পারলেন—এটা একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে। এখানে সাইপ্রাস ছিল শিখণ্ডি বা নিমিত্ত মাত্র। তিনি বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করে অনতিবিলম্বেই মিশরের আমির আব্দুল্লাহ্ বিন আবিহ্ সারাহ্কে সাইপ্রাস অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন। তখন আব্দুল্লাহর অধীনে রণতরী বলতে তেমন কিছুই ছিল না, যা ছিল তা রোমানদের তুলনায় কিছুই নয়। বিচক্ষণ আব্দুল্লাহ্ কোনরূপ ওজর আপত্তি না করেই গুরুতর সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করে তাঁর অন্যান্য বাণিজ্য জাহাজগুলোকেও যুদ্ধ জাহাজে রূপান্তরিত করে সাইপ্রাস অভিমুখে যাত্রা করলেন। আলেকজান্দ্রিয়ার অদূরেই লক্ষ্য করলেন—অসংখ্য গ্রীক রণতরী ঘনঘন রণ হুঙ্কার ছাড়ছে। কখনও বা সাগর বক্ষ কাঁপিয়ে তুলছে। বিপুল সংখ্যক রণতরী বিশাল এলাকা জুড়ে আরম্ভ করেছে এক মহাযুদ্ধের মহড়া। সামান্য সংখ্যক রণতরীকে সম্বল করে আব্দুল্লাহ্ এক আল্লাহ্কে স্মরণ করে বার বার কোরআনের ঐ মহাবাণীকে মহামন্ত্র রূপে বুকে ধারণ করে ও মুখে উচ্চারণ করেই বিশাল গ্রীক রণতরীর পথ অবরোধ করলেন।

"হে নবী! বিশ্বাসীগণকে সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ কর, যদি তোমাদের মধ্যে কুড়ি জন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা দু'শজনের উপর জয়ী হবে, এবং তোমাদের মধ্যে একশ' জন থাকলে, তারা এক হাজার অবিশ্বাসীদের উপর জয়ী হবে।" কোরআন: ৮ : ৬৫

"যাদের ধারণা ছিল যে, তারা নিশ্চয় (মরবে না) আল্লাহ্র সাথে মিলিত হবে, তারা বলেছিল—আল্লাহ্র আদেশে অনেক সময় ক্ষুদ্র দল বৃহৎ দলের উপর জয়ী হয়েছে, এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলগণের সঙ্গী।" ২ : ২৪৯

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। বাতাস বন্ধ। স্তব্ধ সাগর বক্ষ। উভয় পক্ষের যুদ্ধ জাহাজগুলো যেন ভাসমান হংস পালের মত মুখোমুখি। রাত্রি সমাগত। গ্রীকগণের বিশাল বাহিনী ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীকে লক্ষ্য করে আনন্দে মেতে উঠল, পানাহারে মত্ত হলো। গান-বাজনায় সমস্ত রাত্রি মহানন্দে উদ্‌যাপিত হলো। গ্রীক পরমাসুন্দরীগণ সৈনিকদের মনোরঞ্জনে—উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ছিল সক্রিয়, নারীর সমস্ত কিছু দান করল যুদ্ধের দাবানলকে প্রাণপণে প্রজ্জ্বলিত করতে।

ওদিকে ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীও বিনিদ্র রজনী কাটালেন এক আল্লাহ্র আরাধনায় উপাসনায় কাকুতি মিনতিতে, যে মিনতির সুর একদিন স্বয়ং মহানবীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর-প্রান্তে, আত্মম্ভরী

ও অহংকারী কোরেশদের আক্রমণে।

সকাল হতে না হতেই বাতাস হলো উন্মত্ত। স্রোত হলো প্রবল। ঢেউগুলো হলো পাহাড় সম। প্রবল বাতাসের সম্মুখে ছোট ছোট মুসলিম রণতরীগুলো নিজেকে নিজেই বিপদাপন্ন বোধ করল। হেনকালে এই সুযোগে বিশাল ও বিরাট গ্রীক রণতরীগুলো মুসলিম ছোট্ট রণতরীগুলোকে সাগর বক্ষে বিলীন করে দিতে এক সাথে সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। গ্রীক দলে বেজে উঠল—রণহুংকার, বিচিত্র বাদ্য-বাজনা। মুসলিম দলে ধ্বনিত হলো—তক্‌বির ধ্বনি। বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। সমুদ্র ভয়াবহ রূপ ধারণ করার জন্য উভয় পক্ষের জাহাজগুলো আপন আপন স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে সকলের সাথে সকলেই একেবারেই এলোমেলো হয়ে গেল। প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধের গতি বেড়ে গেল। বিশাল সাগরের জল যেন রক্তে পরিণত হলো। গ্রীক বাহিনী মান-সম্মানের জন্য সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়ে যাচ্ছে, যেখানে মুসলিম বাহিনী কেবল আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার নিমিত্ত প্রাণের বিনিময়েই লড়ে যাচ্ছে। দুপুরের কাছাকাছি মুসলিম বাহিনীর অধিকাংশই গ্রীক নৌবহরে ঝাঁপ দিয়ে জীবন-মরণ পণে সুদীর্ঘ আরবী তরবারি দ্বারা সুবিশাল রোমান বাহিনীকে একেবারেই ছিন্ন ভিন্ন করে তুলল। অগণিত লাশ সমুদ্র বক্ষে পড়তে থাকল। একদিকে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গরাশি এবং অন্যদিকে যুদ্ধের ভয়াবহতা, প্রচণ্ড গতি যুদ্ধকে করল আরো মারাত্মক আরো মরণাত্মক। সন্ধ্যার কিছু আগেই গ্রীক বাহিনী বহু রণতরী পশ্চাতে ফেলেই পলায়ন করল। সেনাপতি কন্সটানটাইন অতি দ্রুত গতিতে আত্মরক্ষার্থে সাইরাকিউস দ্বীপে উপস্থিত হলেন। সেখানকার অধিবাসীগণ স্বয়ং সেনাপতির এরূপ কাপুরুষতায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই অতীব লাঞ্ছনার সাথে তাঁকে হত্যা করেন। এইভাবে সাইপ্রাস ও রোডস দ্বীপ আবার দ্বিতীয় বারের মত মুসলিম শাসনাধীনে এসে গেল।

সমুদ্রের তরঙ্গরাশি ভীষণাকার না ধরলে উভয় পক্ষের জাহাজগুলো একাকার হয়ে যেতো না। এবং এইভাবে জাহাজগুলো পরস্পর পরস্পরের অতি নিকটে না এলে আরব বাহিনী গ্রীক বাহিনীকে তরবারির অতি নিকটে পেত না। তাহলে যুদ্ধ প্রলম্বিত হতো। কিন্তু সমুদ্রের তুফান, যা মুসলিম বাহিনীকে প্রথম দিকে অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছিল, সেই তুফানই মুসলমানদের জন্য অভিশাপ না হয়ে আল্লাহর আশীর্বাদে পরিণত হয়ে ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীকে করল বিজয়ী। মুসলমানদের আল্লাহ বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস সাগর-সমরে স্বার্থকতা লাভ করল। ইসলামের ইতিহাসে সাগর বক্ষে এরূপ যুদ্ধ খুবই কম ঘটেছিল। এবার যুদ্ধের পর সাইপ্রাসবাসীরা আপন বিশ্বাসঘাতকতার জন্য হারাল তাদের আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা।

ত্রিপলী বিদ্রোহ :

মিশরে গভর্নর আব্দুল্লাহ্ যখন সাইপ্রাস নিয়ে ব্যস্ত তখনই সুযোগ বুঝে উত্তর আফ্রিকার ত্রিপলীতে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। আব্দুল্লাহ্ প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ৩৪ হিজরীতে ত্রিপলীতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। যার ফলে ত্রিপলী বিদ্রোহ আর বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। উত্তর আফ্রিকা আবার শান্ত হলো।

কনস্টান্টিনোপল অভিযান :

৩২ হিজরীতে আমির মুয়াবিয়া পূর্ব-রোমক রাজধানী কনস্টান্টিনোপল জয় করার জন্য একটি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অভিযান ব্যর্থ হয়। পরের বছর আবার একই পদক্ষেপ নেওয়ার পরও সিরিয়া বাহিনী অভিযানে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। কেউ কেউ বলেন—আমির মুয়াবিয়ার মূল উদ্দেশ্য কনস্টান্টিনোপল জয় ছিল না। অন্যান্য বিজয়গুলোকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্যই তিনি মাঝে মাঝে এরূপ অভিযান প্রেরণ করতেন। আমির মুয়াবিয়ার নীতি ছিল আপন দেশকে শান্ত রেখে শত্রুকুলকে ব্যস্ত রাখা।

প্রথম নৌবহর হযরত ওসমানেরই অবদান :

আমরা সকলেই জানি—সিরিয়ার দূরদর্শী আমির মুয়াবিয়া বার বার খলিফা ওমরকে অনুরোধ করেছিলেন—নৌবাহিনী গঠন করে নৌপথে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য। কিন্তু খলিফা তদানীন্তন মিশরের দুর্ধর্ষ আমির আমর-বিন-আল্-আ'সকে জিজ্ঞাসা করে বার বার মুয়াবিয়ার প্রস্তাব নাকচ করে দেন। অতঃপর নাছোড়বান্দা আমির মুয়াবিয়া খলিফা ওমরের পরলোক গমনের সাথে সাথে নূতন খলিফা ওসমানের অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই কাজ আরম্ভ করে দেন। অল্পদিনের মধ্যেই ওসমানের খেলাফতেই ইসলামের শান্তি পতাকা প্রথম সাগর বক্ষে মহাগৌরবের সাথে শোভা বর্ধন করে। একথা ইসলামের ইতিহাসে সকলকেই স্বীকার করতে হবে। এই সঙ্গে হযরত ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে আরো একটি কথা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না, খলিফা ওসমান নানা কারণে প্রশাসনে ততটা যোগ্যতার পরিচয় তুলে ধরতে পারেন নি, যতটা পেরেছিলেন—সাম্রাজ্য বিস্তারে। এমনকি প্রশাসনে তাঁর যত বড়ই দুর্বলতা থাক, ইসলামের সাম্রাজ্য বিস্তারে তিনি যে যোগ্যতার ও দূরদর্শিতার পরিচয় তুলে ধরেছিলেন, তা ইসলামের ইতিহাসে

কোনদিনই মলিন ও ম্লান হওয়ার নয়। আমর বিন-আ'সের মত ধুরন্ধর গভর্নরও এই সত্য উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, সামুদ্রিক বিজয় ব্যতীত ইসলামের জয় কোনদিনই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এই সামুদ্রিক জয়ের সূচনার দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন খলিফা ওসমান।

ওসমান হত্যার অন্যতম কারণ

মিশর বিদ্রোহ:

মিশরের বিক্ষোভে বিদ্রোহী মহম্মদ বিন আবুবকর, মহম্মদ বিন হুজাইফা, আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা:

হযরত ওসমান (রাঃ) যখন দিবারাত্রি বহির্বিশ্বের দিকে সজাগ দৃষ্টি সহ বিভিন্ন স্থানে যোগ্য সেনাবাহিনী পাঠাতে অতিরিক্ত ব্যতিব্যস্ত, যখন তিনি ইসলামের শান্তি পতাকাকে স্থল হতে জলে নামিয়েছেন। যখন ইসলামের বীর সন্তানগণ জীবন মরণপণে রোমানদের সাথে সাক্ষাৎ সমরে সদাই পাঞ্জা কষছে, চরম দুর্ভাগ্য তখনই আপন ঘরেই আত্মকলহ, আপন শিবিরেই যেন ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে। এরই নাম কি নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস, এরই নাম কি ইতিহাসের নির্মম উপহাস।

সমগ্র ধরণীরও যেন ধারণাতীত কোথা হতে এই বিদ্রোহ দানা বাঁধল! এ আঘাত ছিল বড়ই আশাতীত। বড়ই ভাগ্য বিপর্যয়ের পূর্বাভাষ। যখন খলিফা ওসমান তাঁর জাতিকে নৌবহরে সামুদ্রিক অভিযানে কোরআনের বাণী সুললিত কণ্ঠে সকলকে শুনিয়ে মসজিদে নববীর প্রাঙ্গণে আপন জাতিকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন, উৎসাহিত করছেন, ঈমানের বাঁধনে মজবুত করছেন—"যা মানুষের উপকারী জিনিসপত্র নিয়ে সমুদ্রের উপর ভেসে বেড়ায়—(সেই) সমস্ত পোতসমূহে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন আছে।" ২ : ১৬৪। ঠিক হেনকালে হযরত আবুবকরের কনিষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ ও বিখ্যাত সাহাবী আবু হুজাইফার পুত্র মুহম্মদ আপন আপন ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য, রাষ্ট্রীয় শক্তিকে কুক্ষিগত করার জন্য, যুদ্ধের মাল ও উপসত্ত্বকে ভোগ করার জন্য, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য, সমগ্র মিশরবাসীকে নিয়ে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে আরম্ভ করলেন, বিদ্রোহ দানা বাঁধল। যা পরে একদিন মহীরুহতে পরিণত হয়েছিল।

বিদ্রোহী মুহম্মদ বিন আবুবকর :

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর পর হযরত আলীর পতনের কালে আমির মুয়াবিয়ার সাথে আমরা চারজন ধুরন্ধর ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেছিলাম—১। আমর-ইবনুল আ'স, ২। যিয়াদ বিন আবিহ্, ৩। মুগিরা বিন শুবাহ্ ও ৪। উক্‌বা বিন-নাফি। এই চারজনের সাহায্য ব্যতীত আমীর মুয়াবিয়া কোনদিনই হযরত আলীকে পরাস্ত বা কায়দা করতে পারতেন না। হযরত আলীর ভাগ্যাকাশে যেমন এই চারটি কুনক্ষত্র জন্ম নিয়েছিল। অনুরূপভাবে হযরত ওসমানের ভাগ্যাকাশেও ঐ চারটি কুনক্ষত্র ভেসে উঠেছিল—১। আমর-ইবনুল আ'স, ২। মুহম্মদ বিন আবুবকর, ৩। মুহম্মদ বিন হুযাইফা, ৪। আব্দুল্লাহ বিন সাবাহ্ প্রমুখ। তবে এখানে একটি কথা পরিষ্কার করা দরকার যে,চতুর মুয়াবিয়া তাঁর চরম চতুরতা দ্বারা মহামানব শেরে খোদা আলীর বিরুদ্ধে চারজনকে প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু খলিফা ওসমানের প্রশাসনে তাঁর আপন দুর্বলতা, তথাকথিত স্বজন-পোষণতা প্রভৃতি কারণে ঐ চাবজন বিদ্রোহী জন্ম নিয়েছিল। যাদের পশ্চাতে মুয়াবিযা রূপ কোন ধুরন্ধব ব্যক্তি ছিলেন না। উভয়ের ভাগ্যাকাশে এ পার্থক্য বিদ্যমান।

হযরত আবুবকর পরলোক গমন করার পর তাঁর কনিষ্ঠা বিধবা পত্নীকে হযরত আলী বিবাহ্ করেন। এবং ঐ রমণীর নাবালক পুত্র মুহম্মদকেও লালিত পালিত করেন। হযরত আলী খলিফা নির্বাচিত না হওয়ায় মুহম্মদ মনের দিক থেকে খুবই হতাশ হয়ে পড়েন। তবুও তাঁর ধারণা ছিল তিনি আবুবকরের পুত্র, বিবি আয়েশার ভাই। সুতরাং খলিফা ওসমান তাঁকে কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ দেবেন। কিন্তু খলিফা অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করেই বড বড় পদগুলো আপন গোত্র উমাইয়াদের মধ্যে বিলি করতে আরম্ভ করলেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহম্মদের ভাগ্যে কিছুই জুটল না। বঞ্চিত বিব্রত মহম্মদ খলিফার বিরুদ্ধে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর ক্রোধ, ক্ষোভ ও অভিমান এত দূর পর্যন্ত গড়াল, তিনি মদীনা ত্যাগ করে মিশরে গমন করলেন। মহম্মদ যে বুদ্ধিমান যুবক ছিলেন, সে কথা তাঁর মিশর গমন হতেই ধরা পড়ে। কেননা মিশরের অধিবাসী কিব্‌তীগণ ইসলামকে বরণ করেছিলেন। কিন্তু আরবের প্রাধান্যকে ধারণ করতে পারেনি। বিচক্ষণ যুবক মহম্মদ এই সুযোগটাকে কাজে লাগানর জন্যই মিশর গমন করেছিলেন। এবং তাঁব বুদ্ধি কাজে লেগেছিল। তিনিই পরবর্তীকালে খলিফার বিরুদ্ধে গণ-বিদ্রোহেব প্রধান

উদ্যোক্তা ছিলেন। গণ-বিদ্রোহের জন্য মিশরের মাটি অন্যদিকেও একটু প্রস্তুত ছিল। খলিফা, আমর-বিন-আসের মত ব্যক্তিত্বকে গভর্নরের পদ হতে অতি ক্ষীণ কারণে সরিয়ে দেওয়ার জন্য মিশরবাসীগণ খলিফার প্রতি ক্ষুব্ধ ও বিরক্তই হয়েছিল। মহম্মদ এটাকেও কাজে লাগাতে ভুল করেন নি। পরিশেষে এই মিশরেই তাঁকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহের বিন্দু বিশাল আকার ধারণ করে।

বিদ্রোহী মুহম্মদ বিন আবু হুজাইফা :

মুহম্মদ বিন আবু হুজাইফা ছিলেন কোরেশকুলের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তাঁর ফুফু ছিলেন হেন্‌দা, অর্থাৎ আবু সুফিয়ানের দুর্ধর্ষা স্ত্রী ও চতুর মুয়াবিয়ার মা। সবের উর্ধ্বে হযরত হুজাইফা ছিলেন স্বয়ং মহানবীর অতি প্রিয় সাহাবা। কোরেশদের অত্যাচারে একদিন জর্জরিত হয়েই মহানবীর উপদেশ মত আপন জন্মভূমি ত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় গমন করেন। ঐ বিদেশের মাটিতেই পুত্র মহম্মদের জন্ম। শিশু মুহম্মদের নাম স্বয়ং মহানবীর অনুমতি নিয়েই রাখা হয়েছিল। তাহলে একথা সহজেই অনুমেয় যে, এই শিশু ছিলেন মহানবীর স্নেহধন্য। যখন হযরত হুজাইফা আবিসিনিয়া হতে মদীনাতে গমন করেন, তখন মুহম্মদের বয়স মাত্র আট মাস। ইসলামের প্রথম যুগ হতেই হযরত হুজাইফা বহু ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। মদীনা আসার পর মহানবীর ছায়ারূপে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। মহানবীর পর খলিফা আবুবকরের খেলাফতে তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। অতঃপর ওসমান ঐ নাবালক সন্তানের ভরনপোষণের ভার গ্রহণ করেন। মুহম্মদের আশা ছিল—বংশের দিক হতে, ইসলামের সেবার দিক হতে, ওসমানের সান্নিধ্য হতে তিনি কোন একটি উচ্চপদ পেতে পারেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে যখন কিছুই জুটল না, তিনি ক্ষোভে ও দুঃখে মিশরে গমন করলেন।

তিনি মিশরে পৌঁছান মাত্র মুহম্মদ বিন আবুবকরের সাথে মিলিত হলেন। মিশরের মাটিতে আমর বিন আ'সের প্রতি খলিফার পূর্ব আচরণ বিদ্রোহের বীজরূপে কাজ করছিল। প্রথম মুহম্মদ সেই বীজটিকে অঙ্কুরে পরিণত করলেন, অতঃপর দ্বিতীয় মহম্মদ তাকে চারাবৃক্ষে রূপ দিলেন। দুই মহম্মদ খলিফার বিরুদ্ধে ঘরে বাইরে বিদ্রোহমূলক জ্বালাময়ী বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। গভর্নর আব্দুল্লাহ তাঁদের ডেকে কয়েক বার ধমক দিলেন। কিন্তু ঐ মৃদু বাতাসে ঐ মশাল আগুন নেভান সম্ভব ছিল না। চারিদিকে বিদ্রোহের আগুন দিনের পর দিন দাবানলের মত জ্বলে উঠতে থাকল।

ইতিমধ্যে ৩৩ হিজরীতে গ্রীকগণ বিশাল বাহিনী সহ দ্বিতীয় বারের মত সাইপ্রাস পুনরুদ্ধারের জন্য অভিযান পরিচালনা করলে খলিফা মিশর গভর্নর আব্দুল্লাহকে সাইপ্রাস অভিমুখে যাত্রার জন্য জরুরী নির্দেশ দেন। আব্দুল্লাহ সেই নির্দেশ মত মিশর হতে বিশেষ এক বাহিনী সহ সাইপ্রাস অভিমুখে রওনা হলেন। দুই মহম্মদকে যোগদান করতে নির্দেশ দিলেন। প্রথম মুহম্মদ অসুখের ভানে রেহাই নিলেন। দ্বিতীয় মহম্মদ যাত্রা করলেন। প্রথম মহম্মদ গভর্নর আব্দুল্লাহর অনুপস্থিতিতে মিশরে খলিফার ও গভর্নরের বিরুদ্ধে প্রাণ ভরে বক্তৃতা করতে থাকলেন। খলিফার ও গভর্নরের যত রকমের দুর্বলতা ছিল সব কিছু জনগণের সামনে তুলে ধরতে থাকলেন। তিনি জনগণকে বুঝালেন—পক্ষপাত দুষ্ট খলিফা আমর বিন আসের মত যোগ্য মানুষকে বসিয়ে দিয়ে আপন দুধ-ভাই আব্দুল্লাহকে মিশরের গভর্নর করে এক মহা অন্যায় করেছেন। এই গভর্নর আব্দুল্লাহকেও জনগণের সম্মুখে উলঙ্গ করে তুলে ধরলেন—"স্বয়ং মহানবী এই আব্দুল্লাহকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন, তখন খলিফা ওসমান মহানবীর নিকট প্রাণভিক্ষা নিয়ে তাঁকে রক্ষা করেন, কিন্তু মহানবী সতর্ক করেছিলেন—আব্দুল্লাহ যেন জীবনে কোনদিন তাঁর সম্মুখে না আসে। এ হেন ব্যক্তিকে খলিফা গভর্নর করেছেন। কত বড় অন্যায়।" তাঁর এই ভাষণে জনগণ যেন অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল।

ওদিকে দ্বিতীয় মহম্মদ সেনাবাহিনীর মধ্যে থেকে গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন ঠিকই, কিন্তু তা অপেক্ষাও বড় যুদ্ধ করলেন—খলিফার বিরুদ্ধে নানা কথা বলে। তিনি সকলকে জনে জনে বুঝালেন—যুদ্ধ করতে হবে মদীনায়, জেহাদ করতে হবে খলিফার বিরুদ্ধে। তিনি সমরের মধ্যেই সকলকেই বুঝিয়ে দিলেন—"যে মহান ব্যক্তিগণ মক্কা বিজয়ের পূর্বে আপন জান-মাল, সমস্ত কিছু ত্যাগ করে ইসলামের জন্য জেহাদ করেছিলেন, যাঁরা সেই নবুয়তের প্রথম যুগ ৬১০ খ্রীঃ হতে মক্কা বিজয় ৬৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত অনাহারে অর্ধাহারে ইসলামের ঝাণ্ডাকে মাথায় তুলে নিয়েছিলেন, যাঁরা দ্বীনের নবীকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অকাতরে অবলীলায় আপন বুক পেতে দিয়েছিলেন, এবং যারা দূর হতে শর নিক্ষেপ করছিল, তারা কি সমান! আজ খলিফার স্বজন-পোষণের ফলে ঐ শর নিক্ষেপকারীগণের অধিকাংশই বড় বড় পদগুলোকে দখল করে প্রকৃত মুমেনদের উপর জুলুম চালাচ্ছে। আপনারা কি মনে করেন সেদিনের ঐ মুশরেকগণ, আজ যারা মুনাফেক,

তারা কি কোনদিনই মুমেনগণের সমান। যে খলিফার দ্বারা এত নোংরা কাজ হতে পারে, আমরা তাঁর পদচ্যুতি চাই।'' এই দুই মহম্মদের এই রূপ ক্ষুরধার বক্তৃতার পরিণাম ছিল সুদূর ভয়াবহ। একদিন যে মুহাজির ও আনসারগণ ইসলামের জন্য প্রাণপণে লড়েছিলেন যাদের বিরুদ্ধে—আজ তারাই ইসলামি প্রশাসনের বড বড় পদ লাভ করে সেদিনের মুহাজির ও আনসারগণের বংশধরগণকে নির্মমভাবে শাসন কবে, কৃপা করে, এরই নাম ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাস। এর মাশুল খলিফাকেও একদিন আপন জীবনের বিনিময়েই দিতে হয়েছিল। বোধ হয়, বৃদ্ধ বয়সের ভারে খলিফা আপন বিবেকের কাছেই বেশ কিছুটা অনুপস্থিত হয়ে পড়েছিলেন। ঐ সম্পর্কে মহাবীর মহাজ্ঞানী হযরত আলী তাঁকে বহুবার সতর্কও করেছিলেন। কিন্তু চতুর মুয়াবিয়া ও ধুবন্ধর মারওয়ান তাঁকে যেন একেবারেই গ্রাস করে ফেলেছিলেন। তাই ওসমান হত্যার জন্য রোজ হাশরে সর্বাপেক্ষা কেউ যদি দায়ী হন, তাঁরা হবেন মুয়াবিয়া ও মারওয়ান।

বিদ্রোহী আব্দুল্লাহ বিন সাবা :

দুই মহম্মদ যখন মিশরের মানুষ ও মাটিকে খলিফা ওসমানেব বিরুদ্ধে একেবারেই গ্রাস করে বসে আছেন, তখনই আর এক যুবক আব্দুল্লাহ বিন সাবা গোদেব উপব বিষ ফোঁডাব মত মিশরে এসে হাজির হলেন। আব্দুল্লাহ বিন সাবা জাতিতে ছিলেন ইহুদী, অধিবাসী ছিলেন ইয়েমেনের, বাস কবতেন সানা নামক স্থানে। ইহুদীগণ চিরকালই ইসলামেব মারাত্মক শত্রু। তাঁদেব যে কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তার পশ্চাতে কিছু না কিছু রহস্য লুকিয়ে ছিল। কোথাও ছিল প্রাণের ভয়, কোথাও লোভ-লালসা, কোথাও মান-সম্মান, এককথায় পার্থিব সুযোগ-সুবিধা। ইসলামকে তারা কোনদিনই পরকালের মঙ্গল হেতু গ্রহণ করেনি বা ইসলামের আদর্শে ও সৌন্দর্যে মোহিত ও মুগ্ধ হয়েও তাকে বরণ করেনি।

খলিফা ওসমানের সময় আব্দুল্লাহ বসরায় গমন করে তথায় পারসিকদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। পারস্যবাসীগণেরও ইসলাম গ্রহণ খুব একটা নির্মল ছিল না। তারাও অসভ্য আরব বেদুঈনকে কোনদিনই বরদাস্ত করতে পারতো না। এবং তারা ইসলামকে গ্রহণ করলেও নিজদের প্রাচীন সংস্কার

ও ঐতিহ্যকে একেবারেই ত্যাগ করতে পারেনি। আব্দুল্লাহর কোন রাজনৈতিক মোহ ছিল না, কোন দুরাশাও ছিল না। তাঁর মধ্যে ছিল অবতারবাদের নেশা। এই নেশাকেই তিনি তাঁর প্রধান নেশারূপে গ্রহণ করেন এবং এই বাতিকগ্রস্ত পেশার কেন্দ্রবিন্দুতে হযরত আলীকে অবতাররূপে হাজির করেন। অতঃপর যত্রতত্র হযরত আলীর গুণকীর্তন করতে আরম্ভ করেন। যখন এটা খুবই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে লাগল, তখন বসরার গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন আমির তাকে বসরা হতে বিতাড়িত করার নির্দেশ জারী করেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ কুফা নগরীতে প্রবেশ করেন, এবং সেখানে হযরত আলীর যথেষ্ট সংখ্যক অনুগামী থাকায় তাঁর প্রচার কার্য সহজ হয়ে উঠে। কুফাতে প্রচার সমাপ্ত করে সিরিয়া গমন করেন। তথায় বিশেষ সুবিধা না করতে পেরে মিশরে গমন করেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল—আল্লাহ হযরত আলীকে হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সকল বিষয়ের ক্ষমতার উত্তরাধিকার করে পাঠিয়েছেন। তিনিই একমাত্র খেলাফতের অধিকারী। তাঁকে অন্যান্য সকলেই তাঁর আসল হক্ থেকে নাহক করেছেন।

আব্দুল্লাহর বক্তব্যে রাজনীতির কোন গন্ধ ছিল না। কিন্তু মূল বক্তব্য ছিল—হযরত ওসমানকে খেলাফত ছাড়তে হবে। এবং হযরত আলীকে সেই স্থানটি পেতে হবে। ঐ দুই মহম্মদেরও মূল বক্তব্য ছিল ঐ একই বস্তু। কারো মাধ্যম ছিল রাজনীতি, কারো ছিল কূটনীতি, কারো ছিল ধর্মনীতি। কিন্তু সকলেরই দাবী ছিল একটি মাত্র—খলিফা ওসমানকে খেলাফত ছাড়তে হবে। এইভাবে সকলেই আপন আপন স্বার্থের তাগিদেই খলিফার বিরুদ্ধে এক ও একত্রিত হলো। আপন আপন প্রচার পদ্ধতিতে সকলেই স্থির সিদ্ধান্ত সহ মিশরকে কেন্দ্র করেই সমগ্র মুসলিম সমাজে এক দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। আব্দুল্লাহ ৬৫০ খ্রীস্টাব্দে সাবায়ী নামক একটি গোত্রের জন্মও দিলেন। বক্তা হিসাবে অসাধারণ ছিলেন, বুদ্ধিমানও ছিলেন, নানা ধর্মের প্রসঙ্গ উত্থাপনও করতে পারতেন। কথায় কথায় ইহুদী ধর্মের হযরত মূসা ও তাঁর ভাই হারুনের কথাও উল্লেখ করে জনগণকে হযরত আলীর অধিকার ও ন্যায্য দাবী বুঝাবার চেষ্টা করতেন। ধীরে ধীরে এই সমবেত আলোড়ন একটি বিশাল আন্দোলনে পর্যবসিত হল। যে আন্দোলন একদিন স্বয়ং খলিফাকেই অতি মর্মান্তিক ভাবেই গ্রাস করেছিল—ধনে প্রাণে।

আব্দুল্লাহ্ অনেক সময় আন্দোলনকে বেগবান করার নিমিত্ত অনেক ভিত্তিহীন কথাও বলতেন। তিনি পবিত্র কোরআনের একটি উক্তির উল্লেখ করে জনগণকে বুঝাতে চেষ্টা করতেন মহানবী আবার ফিরে আসবেন। উক্তিটি—''নিশ্চয় যিনি তোমার জন্য কোরআনকে ফরজ করেছেন, তিনি তোমাকে অবশ্যই তোমার প্রত্যাবর্তন স্থলে (স্বদেশে) ফিরিয়ে আনবেন।'' সূরা কাসাস ২৮ : ৮৫। এটা ছিল আসলে মক্কা বিজয়ের পূর্ব ইঙ্গিত। এরূপ ধরনের উক্তি কোরআনে আরো আছে। ১৭ : ৮০। খলিফা ওসমানের প্রশাসনে তখন নানা দুর্বলতা দেখা দেওয়ায় সারা দেশের জনগণ তিতিবিরক্ত হয়েই কোন কিছুকে যেন পেতে চেষ্টা করছিল। হেনকালে এদের বক্তব্যগুলো জনগণকে মুগ্ধ করল। কিন্তু এই কথাগুলোই হযরত ওমর ফারুকের সময় উচ্চারণ করলে জনগণের নিকট তারা মার খেতো।

আব্দুল্লাহ্ তাঁর অবতারবাদে এতদূর এগিয়ে গেলেন যে, হযরত আলীকে—''তুমিই আল্লাহ্'' বলতেও দ্বিধা বোধ করলেন না। যখন হযরত আলীর কানে এই সব আবোল তাবোল কথা পৌঁছাতে আরম্ভ করল, তিনি অতিশয় বিরক্ত হয়ে আব্দুল্লাহ্কে ভীষণভাবে তিরস্কার করলেন, এবং মিশর হতে বের করে দিলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ্ তাঁর বাতিক কোনমতেই ছাড়লেন না। তিনি সর্বত্র প্রচার করতে থাকলেন—'পয়গম্বরগণের আত্মা পবিত্র, যা একজন হতে অন্যজনের ভেতর প্রবেশ করতে থাকে। এবং বংশ পরম্পরায় চলতে থাকবে। এবং তাঁদের মধ্য হতেই ইমাম বা নেতা নির্ধারিত হবে। এই সূত্রেই হযরত আলী হযরত মহম্মদের পরবর্তী ব্যক্তি। এবং তাঁর বংশধরগণ হতেই ইমাম নির্ধারিত হবে। হযরত ওসমান (রাঃ) অন্যায়ভাবে জোরপূর্বক খেলাফতে বসে আছেন। তাঁকে খেলাফত ছাড়তেই হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—বিভিন্নমুখী আন্দোলন পরিণতি লাভ করলো একমুখী আন্দোলনে—খলিফার বিরুদ্ধাচরণ, খলিফার পতন। মিশরের মাটিতে, মিশরের মানুষের মনে এই ভয়াবহ আন্দোলনের বীজটি প্রথম বপন করেছিল মিশরের পদচ্যুত গভর্নর আমর-বিন-আ'স্, সেটিকে অতি সযত্নে রোপণ করলেন দুই ক্ষুরধার তেজস্বী মহম্মদ এবং পরিশেষে এটাকে শেষের প্রলেপ দিলেন, সমাপ্ত করলেন আব্দুল্লাহ্ বিন সাবা। পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুকূলে না গেলে দু'-একজনের দ্বারা কোনদিনই এত বড় একটা আলোড়ন এত বড় একটা আন্দোলনে পরিণত হত না।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রশাসনে স্বজন-পোষণ
(Favouritism in administration)

দয়ালু ওসমান, ক্ষমাশীল ওসমান, উদার ওসমান, গরীব দরদী ওসমান, মহানবীর প্রিয়জন ওসমান, কেন আপন শাসনে সমালোচিত হলেন, একথা যেমন ইসলামের ইতিহাস চিরদিন চলতে থাকবে, তেমনিভাবেই পাশাপাশি চলতে থাকবে তাঁর ঐ অসংখ্য মহৎ গুণাবলীর কথা। পৃথিবীর একটি লোকও বলতে সাহস করবে না যে, হযরত ওসমান (রাঃ) জন্মগতভাবে, চরিত্রগতভাবে অসৎ-বদ মানুষ ছিলেন। তাঁকে শিকার হতে হয়েছিল পরিস্থিতি ও পরিবেশের, বয়সের ও বার্ধক্যের। এবার আমরা সমগ্র পরিস্থিতির পর্যালোচনা করবো। এই পর্যালোচনার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আমরা তাঁর প্রশাসনের পূর্বাধ্যায়টিকে একবার দেখবো। তাহলে পার্থক্যটি সহজে বুঝা যাবে।

প্রশাসনের পূর্বাধ্যায় : (মহানবীর যুগ)

স্বয়ং মহানবীর সময়ে মক্কা বিজয়ের পর আরবের বহু অংশ বিজিত হয়। এই সমস্ত বিজিত এলাকাগুলোতে মহানবী প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁরা ইসলামের নববিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। পরে মহানবীর প্রবর্তিত ঐ ধারা পরবর্তীকালে অনুসৃত হলো হযরত আবুবকর ও হযরত ওমর ফারুক দ্বারা। ঐ সময় সারা মুসলিম জাহানের কেউই প্রশাসন সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করেনি।

হযরত আবুবকর ও হযরত ওমর ফারুক :

হযরত আবুবকর অতিরিক্ত ব্যস্ত ছিলেন---ইসলামের ডুবন্ত প্রায় তরীটিকে পাড়ে তুলতে। পাড়ে তুলেছিলেন অত্যন্ত কৃতকার্যতার সাথেই। তাই তাকে এককথায় বলা হয়—'ইসলামের ত্রাণকারী'। প্রশাসনে বিশেষভাবে মনোসংযোগ করার সময় তিনি পাননি। প্রশাসনকে প্রাণ দিয়েছিলেন হযরত ওমর।

হযরত ওমরের প্রশাসন ধারা :

বিশ্ব প্রশাসনের বিশুদ্ধ ইতিহাসে আজও হযরত ওমর প্রবাদ পুরুষ, আজও

বিশ্ব-প্রশাসন ও বিশ্ব ন্যায়বিচার তাঁর নিকট গভীরভাবে ঋণী। এই প্রবাদ পুরুষের প্রশাসনের সামান্য রূপরেখা তুলে ধরলে বুঝতে পারবো হযরত ওসমান (রাঃ) কেন এত তীব্রভাবে সমালোচিত হলেন।

হযরত ওমরের সময় মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমারেখা আরবের বাইরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। তিনি শাসনের ও সুবিচারের সুবিধার জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যটিকে মোটামুটি কুড়িটি ভাগে বিভক্ত করেন।

১। পূর্ব আরবে বাহ্‌রায়েন ও আহ্‌ওয়ান	১
২। উত্তর ইরাক, ও দক্ষিণ ইরাক	২
৩। উত্তর সিরিয়া ও দক্ষিণ সিরিয়া	২
৪। পশ্চিম আরবে প্যালেষ্টাইন ও সমুদ্র উপকূল	১
৫। মধ্য বা খাস আরবে—হিজাজ ও ইয়ামেন	৫
৬। পারস্য উপসাগরের পূর্বে সিজিস্তান মেক্‌রান ও কিরমান	১
৭। পূর্ব পারস্যে খোরাসান ও তাবারিস্তান	২
৮। দক্ষিণ পারস্য	৩
৯। মিশরের উত্তর ও দক্ষিণ	২
১০। মিশরের পশ্চিম	১
	২০

এই কুড়িটি প্রদেশের মধ্যে তিনটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইরাক, সিরিয়া ও মিশর। উত্তর ইরাকের রাজধানী ছিল কুফা, দক্ষিণ ইরাকের বসরা, উত্তর সিরিয়ার ছিল হেমস্, দক্ষিণ সিরিয়ার দামেসক, উত্তর মিশরের ফুসতাদ, দক্ষিণের কায়রোয়ান। সমগ্র সিরিয়াকে মূলত আমির মুয়াবিয়া যেমন শাসন করতেন, সমগ্র মিশরকে করতেন আমির আমর ইবনুল-আ'স। তখনকার দিনে ছোটখাটো প্রদেশের গভর্ণরকে ওয়ালী (অভিভাবক) বা নায়েব (প্রতিনিধি) বলা হত। এই নায়েব শব্দ হতে নওয়াব শব্দের উৎপত্তি, এবং বড় প্রদেশের গভর্ণরকে আমির (নেতা বা সর্দার) বলা হত। (আমিরের বহুবচন—'উম্‌রা'। অনেক নিছক ইংরাজী পড়া ঐতিহাসিক 'উমরা'-কে ভুল করে 'উমরাহ্' বলে থাকেন। উমরাহ্ অর্থ হজ্ব পালন। যেমন আলেমের বহুবচন 'উলামা'-কে ভুল করে 'উলেমাহ' বলে থাকেন। এইভাবে লক্ষ্য করেছি বহু ইংরাজী বাগিশ ঐতিহাসিক ইসলামের ইতিহাসকে জ্ঞানে-অজ্ঞানে, স্বেচ্ছায়-অনিচ্ছায় কখন ক্ষতবিক্ষত করেন, কখন বধ করেন।)

এই সমস্ত প্রদেশের গভর্ণর নিয়োগ করতে হযরত ওমর কিছু নীতি নির্ধারণ করেছিলেন। যেমন যোগ্যতার উপর জোর দেওয়া, অঞ্চলকে বঞ্চিত না করা। গোত্র প্রীতি ও স্বজন পোষণকে একেবারেই অবৈধ জানা। একটি কোন বিশেষ গোত্রকে যেমন অধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ দান করতেন না, তেমনি কোন গোত্রকেই একেবারে গুরুত্বপূর্ণ পদ হতে বঞ্চিত করতেন না। সকল গোত্রের সাথে সকল গোত্রের ভারসাম্য লক্ষ্য করতেন ও রক্ষা করতেন। তার প্রশাসনে—স্বজন-পোষণ, গোত্র প্রীতি, উপঢৌকন—ঘুষ, অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, অমিতব্যয়িতা ইত্যাদির প্রবেশ কেবলমাত্র নিষিদ্ধই ছিল না, এদের স্পর্শ পর্যন্তও অবৈধ ছিল।

এবার আমরা লক্ষ্য করবো—প্রদেশের গভর্ণব নিয়োগে খলিফা ওমব কতখানি নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন :

১। মক্কা—	নাফে বিন আবুল হারেস	খাজায়ী গোত্র
২। কুফা—	মুগিরা বিন শোবা	শকীফ গোত্র
৩। বসরা—	আবু মূশা আল্ আশয়ারী	ইয়েমেনী
৪। তায়েফ—	সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ	শকীক
৫। সানয়া	ইয়াইলী বিন মান্‌বাও	ইয়াইলী
৬। জুন্দ্—	আব্দুল্লাহ বিন আবু রাবিয়াহ	বনুমখজুম
৭। মিশর—	আমর বিন ইবনুল আ'স	কোরাইশ- উমাইয়া
৮। হেম্স্—	উমাইর বিন সা'দ	আনসার
৯। দামেস্ক—	মুয়াবিয়া	কোরাইশ- উমাইয়া
১০। প্যালেষ্টাইন—	আব্দুর রহমান	কেনান
১১। বাহ্‌রাইন—	ওসমান বিন আবুল আ'স	শকীক

আমরা উপরোল্লোখিত গভর্ণরগণের মধ্যে হযরত ওমরের গোত্রের একজনকেও পেলাম না। দুই জন মাত্র কোরেশ পাওয়া গেল, তাঁরাও আবার উমাইয়া গোত্রের। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় খলিফা ওসমানের সময়ে গভর্ণর নিয়োগে এই ভারসাম্যের শেষ বিন্দুটিও যেন মরুসাহারাতে বিলীন হয়ে গেল। যাঁরা একদিন নবীকে বুকে স্থান দিয়েছিলেন, শত দুঃখ কষ্টকে হাসি মুখে বরণ করেছিলেন, সেই মোহাজির ও আনসারগণ আজ উপেক্ষিত। মক্কা বিজয়ের পূর্বদিন পর্যন্ত যাঁরা ছিলেন নবীর ঘোর শত্রু, ইসলামের ঘোর দুশমন; মক্কা বিজয়ের পরদিন যাঁরা 'মুসলমান' হলেন—শুধুমাত্র প্রাণের ভয়ে ও সম্পদের লোভে, আজ তাঁরাই আনসার ও মোহাজেবদের উপব

ছড়ি ঘুরাচ্ছেন, এ কাজ মানব সমাজে কত বড় নিষ্ঠুর ও নির্মম ইতিহাস, এই ইতিহাসেরই জন্ম দিয়েছিলেন খলিফা ওসমান। ইসলামের চরম শত্রু আজ ইসলামের দুর্দিনের রক্ষাকারীদের উপর হল নেতা ও সর্দার,—অকৃত্রিম ঈমানদার মুসলমানদের উপর উপদেশ দাতা-আদেশ দাতা। এ ছিল বড়ই করুণ ইতিহাস।

হযরত ওমর ও আব্বাসের কথোপকথন :

হযরত ওমর তাঁর জীবনাবসানের শেষের দিকে একদিন একাকী উদাসভাবে বিষণ্ন চিত্তে বসে বসে কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করছেন। তখন তাঁর জীবন-দীপ নির্বাপিত হতে মাত্র কয়েক দিনই বাকি, শাহাদত বরণ আর দেরী নাই, জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, জীবন-সায়াহ্নে আল্লাহর অলী ওমর ফারুক যেন সবকিছুই দিব্য চোখে দেখে গেলেন, দিব্য মনে বুঝে গেলেন। চিন্তার গভীরে যখন তিনি নিজকে একেবারেই হারিয়ে ফেলেছেন, হেনকালে ইবনে আব্বাস তথায় হাজির।

ইবনে আব্বাস :—হে আমীরুল মোমেনীন, আপনি এত বিষণ্ন চিত্তে কি চিন্তা করছেন ?

হযরত ওমর :—এ গুরু দায়িত্ব—গুরুভার কাকে দেব। কে আমাকে স্বস্তি দেবে।

ইবনে আব্বাস :—পরবর্তী খলিফার জন্য চিন্তা ? সে মানুষ তো আছে।

হযরত ওমর :—কে ? তিনি তোমার বন্ধু আলী ?

ইবনে আব্বাস :—তিনি মহানবীর অতি নিকট আত্মীয়, তাঁর জামাতা, ইসলামের জন্ম লগ্নেই যাঁর আবির্ভাব। মহাবীর, মহাজ্ঞানী, মহা-তাপস।

হযরত ওমর :—তিনি রুচিবান ও জ্ঞানী ব্যক্তি, জ্ঞানের দরজা, সৎ ও সাহসী।

ইবনে আব্বাস :—তাল্‌হা সম্পর্কে আপনি কি বলেন ?

হযরত ওমর :—তিনি তো দরবারী মানুষ, জাঁকজমকের অন্ত নাই।

ইবনে আব্বাস :—আব্দুর রহমান বিন আউফ ?

হযরত ওমর :—ন্যায়পরায়ণ, তবে ভীরু মানুষ।

ইবনে আব্বাস :—সা'দ সম্পর্কে ?

হযরত ওমর :—সমরে স্বনামধন্য, শাসনে পারবে না।

ইবনে আব্বাস :—যুবাইর, আবুবকরের জামাতা, আসমার স্বামী।

হযরত ওমর :—চঞ্চল চিত্ত, লোভী ও রোগী প্রকৃতির।

ইবনে আব্বাস :—হযরত ওসমান ?

হযরত ওমর :—তাঁকে খলিফা করলে তাঁর গোত্রের মানুষ অন্য গোত্রের গর্দান নামাবে। পরে তাঁরও গর্দান নামিয়ে দেবে। (খলিফার কথা যথাসময়ে সত্যে প্রমাণিত হয়েছিল।)

হযরত ওমর :—এমন একজন শক্তিমান ও সহানুভূতিশীল মানুষকে খলিফা করা উচিত, যাঁর শক্তিতে নিরপেক্ষ শাসন থাকবে, কিন্তু জুলুম থাকবে না, যাঁর সহানুভূতিতে উদারতা থাকবে, কিন্তু পক্ষপাতিত্ব ও অমিতব্যয়িতা থাকবে না।

উভয়ের কথোপকথন হতে আমরা বুঝতে পারলাম, হযরত ওমর, কোন্ শ্রেণীর খলিফা ছিলেন, এবং কোন্ শ্রেণীর খলিফা তিনি পছন্দ করছিলেন। তবে এই ছয় জনের মধ্যে খলিফা ওমরের কথা থেকে যা বুঝা গেল, সেখানে হযরত আলীই ছিলেন সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি খলিফা পদের জন্য। হযরত আবুবকর যেমন তাঁর খেলাফতকালেই জীবনের অন্তিম শয়নে নিজ মতামত জনগণের সম্মুখে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে গিয়েছিলেন, হযরত ওমরের খলিফা হওয়া সম্পর্কে, অনুরূপভাবে হযরত ওমর যদি খলিফা আবুবকরের মত নিজ মতামত ঐ দিন দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে যেতেন, তাহলে হয়ত ইসলামের প্রথম যুগের খেলাফতের ইতিহাস অন্যরূপে লিখিত হত। কেননা সেখানে হযরত আলীই প্রাধান্য পেতেন। হযরত ওমরকে খলিফা নির্বাচন করতে হযরত আবুবকরের উপদেশকে যেমন কেউই লঙ্ঘন করতে পারেনি, তেমনি হযরত ওমরের অন্তিম বাণীকেও কেউই অসম্মান করত না। দূরদর্শী ওমর চরিত্রে এটা যেন বেশ একটু খাপছাড়া হয়ে গেছে। কেননা আল্লাহ্ তাঁকে বুঝার শক্তি দিয়েছিলেন—কি ঘটতে চলল এবং কে যোগ্য।

খলিফা ওসমানের গভর্ণর নিয়োগ :

খলিফা প্রথম বছর প্রশাসনের তেমন কোন রদবদল করেন নি। দ্বিতীয় বর্ষে ঐ কাজে হস্তক্ষেপ করলেন। কুফার গভর্ণর মুগীরাকে অপসারিত করে সা'দ বিন আবিওক্কাসকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। এক বছরের মধ্যেই তাঁকে অপসারিত করে ওলিদ বিন ওকবাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। তৃতীয় বর্ষে মিশরের দুর্দান্ত প্রতাপশালী গভর্ণর আমর ইবনুল আসের পদচ্যুতি, তার স্থলে খলিফা তাঁর দুধ ভাই আব্দুল্লাহ বিন আবি সারাহকে স্থলাভিষিক্ত করেন। খিলাফতের ষষ্ঠ বর্ষে বসরার গভর্ণর মূসা আল-আশায়ারীকে পদচ্যুত করেন। এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আমীরকে তথায় নিযুক্ত করেন। এই বছরই

আবার কুফার গভর্ণরকে অপসারিত করে সাঈদ বিন আল আ'সকে নিযুক্ত করেন। যে কোন দেশের শাসন ব্যবস্থায় রদবদল করতেই হয়, না করাটাই অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হবে—কি কারণে রদবদল হচ্ছে, ও কাকে ঐ পদে আনা হচ্ছে।

খলিফা যাঁদের নূতনভাবে গভর্নর নিযুক্ত করলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন—কোরাইশ-উমাইয়া বা তাঁদের আত্মীয়স্বজন। যাঁদের এককথায় অগত্যা মুসলিম শ্রেণীতে ফেলা যায়। তখন খলিফার হাতে পদেরও কোন অভাব ছিল না। মুসলিম সাম্রাজ্যে জয়ের জোয়ার এসেছিল—মধ্য এশিয়ায় তুর্কীস্থান, কাবুল, কান্দাহার, বাল্‌খ্‌, বুখারা, তাসখান্দ, সমরখন্দ, হিরাত, গজনী, দক্ষিণ-পারস্যে কারমান সিস্তান, পশ্চিমে ত্রিপলী, আলেকজান্দ্রিয়া, সাইপ্রাস, এশিয়া মাইনর ও আর্মেনিয়া প্রভৃতি মুসলিম সাম্রাজ্যকে জয়ের এভারেষ্টে নিয়ে গিয়ে হাজির করে। সুতরাং পদের অভাব ছিল না।

কিন্তু এই সমস্ত নূতন নূতন পদে যাঁরা বসলেন, তাঁরা কোন দিনই ইসলামের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন কোরাইশ অহমিকাতে অন্ধ। উমাইয়া গোত্রের অহমিকার দুরন্ত ঘোড়া আরো একটু তেজস্বী ও বেগবান ছিল। যেহেতু খলিফা তাঁদেরই গোত্রের। অহমিকা, অমিতব্যয়িতা, ক্ষমতার অপব্যবহার—এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল, যে হাশিমী বংশে স্বয়ং মহানবীর জন্ম, সেই বংশকেও উমাইয়াগণ তাঁদের চিরশত্রু ও চক্ষুশূল রূপে দেখতে আরম্ভ করল। ইসলামের প্রতিষ্ঠা কালেও তাঁরা ঐ একই দুর্ব্যবহার চালিয়েছিলেন। ফলে সমগ্র দেশ জুড়ে খলিফার বিরুদ্ধে বিরোধ ও বিদ্রোহের বীজ দানা বেঁধে উঠল। এই যত কিছু অঘটন ঘটল, তার মূলে ছিলেন একজন মন্ত্রী মারওয়ান। খলিফা ছিলেন বৃদ্ধ, সরল মানুষ, নরম হৃদয়, তাঁর এই সরলতার ও বার্ধক্যের সুযোগ নিয়ে কুচক্রী জামাতা মারওয়ান যে গাছটির ফল ভোগ করেছিলেন, আপন আচরণের মাধ্যমে সেই গাছটিকেই বধ করার পথ পরিষ্কার করে দিলেন। সঙ্গে ছিলেন মুয়াবিয়া।

প্রশাসনে মহাত্রুটি :

খলিফা প্রতিটি প্রদেশে গভর্ণর নিযুক্ত করতেন। এবং তখনকার দিনে গভর্ণরগণ প্রদেশের অন্যান্য যাবতীয় পদে লোক নিয়োগ করতেন। প্রায় সকল গভর্ণরই ছিলেন উমাইয়া গোত্রের মানুষ। তাঁরা যাঁদের নিযুক্ত করতেন, তাঁরাও হতেন উমাইয়া গোত্রের লোক। অবস্থা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছাল যে, মানুষ রাশি রাশি অভিযোগ খলিফার নিকট পাঠাতে থাকলেন। সাধারণ

মানুষের আহ্জারী ও আর্তনাদ আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হতে থাকল। তাদের আহ্জারী আল্লাহর আরশে পৌঁছাল, কিন্তু খলিফার দরবারে পৌঁছাল না। সেখানে মন্ত্রী মারওয়ানের চক্রান্ত এমনই সবল ছিল, কারো কিছু করার ছিল না। সাধারণ মানুষের সাধ্য-সাধনা সবই ব্যর্থ হল, সকল ফরিয়াদ মাঠে মারা গেল, কোন উত্তর কোন প্রান্তর হতে একবারও উচ্চারিত হলো না। সবের শেষে মানুষ দলে দলে শেরেখোদা, মহাবীর মহাজ্ঞানী হযরত আলীর নিকট আসতে আরম্ভ করলো। হযরত আলী খলিফার সাথে বহুবার দরবার করলেন। বহুভাবে বুঝাবার চেষ্টা করলেন। এমনকি সবের শেষে তিতিবিরক্ত আলী অত্যন্ত বিরক্ত সহকারে খলিফাকে সতর্কবাণী সহকারে বলেন—"আপনি কি মুয়াবিয়া সম্পর্কে জানেন না, হযরত ওমরের দাস ইর্ফা তাঁর মালিক ওমরকে যতটা ভয় করতো, মুয়াবিযা তাঁকে (ওমর) তা অপেক্ষা বহুগুণে বেশি ভয করতেন।" কিন্তু হযরত আলীর এসব কথায় খলিফা কোনরূপ কর্ণপাত না করেই বরং হযরত আলীর মত মানুষের সমালোচনা করে কতকগুলো কুখ্যাত উমাইয়া গভর্ণরের পক্ষ অবলম্বন করতেন। এইটাই ছিল খলিফার অন্ধ দৃষ্টিকোণ ও চরম দুর্ভাগ্য। এই প্রসঙ্গে নিরুপায় আলী জনগণকে কি বলবেন, কি বুঝাবেন, তিনি ভেবেই পেতেন না। অনেক সময় অসহায় জনগণের মাঝে অত্যন্ত আক্ষেপ সহকারে কোরআনের ঐ পবিত্র অংশটি পড়তেন—"আল্লাহ্ তাদের অন্তর ও কর্ণ মোহর করে দিয়েছেন। তাদের চক্ষুর উপর আবরণ আছে, এবং তাদের জন্য গুরুতর শাস্তি আছে।" সূরা বকর ২ : ৭। তারা বধির, মূক, অন্ধ, সুতরাং তারা প্রত্যাবর্তন করবে না। ২ : ১৮।

পরিস্থিতির শিকার :

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, মানুষকে অনেক সময় বিবর্তনে-পরিবর্তনে, নানা পরিবেশে নানা পরিস্থিতিতে পড়ে অনেক কিছুর শিকার হতে হয়। খলিফা ওসমান তাঁর কোমল চিত্ত, বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছিলেন নানা বিষয়ে। অনেক সমস্যার সমাধানে শক্ত হতে পারেন নি। তাঁর এই অকৃতকার্যতার মূলে সেদিনের পরিস্থিতিও কম অবদান জোগায় নি। মহানবীর সময় যে পরিস্থিতি ছিল, আবুবকরের সময় তা ছিল না। আবার আবুবকরের সময় যা ছিল, ওমরের সময় তা ছিল না। এবং ওমরের কালে যা ছিল, ওসমান (রাঃ)-এর সময় তা ছিল না। মহানবীর ওফাতের

পর আজ প্রায় পনের বছর অতিবাহিত। এই পনের বছরে আরব সমাজে এসেছে অনেক পরিবর্তন। দরিদ্র আরব আজ আর দরিদ্র নাই। অসভ্য বেদুঈন আজ আর অসভ্য নাই, মরুচারী আরব আজ মরুচারী নাই। অল্পে খুশী আরব আজ অল্পে খুশী নয়, সভ্য জগতের সাথে সম্পর্কবিহীন আরব আজ শুধু মরু প্রান্তরে সীমিত নয়, আজ তাদের চোখের সামনে সারা দুনিয়া উন্মুক্ত, কত বালাখানা, কত রাজপ্রাসাদ, কত দরবার, কত সিংহাসন, কত রাজমুকুট, কত ধারণাতীত ঐশ্বর্যরাশি দিবারাত্রি তাদের চোখকে ঝলসিয়ে দিচ্ছে। আরব বেদুঈন বাস করতো পর্ণকুটীরে, খেতো শুকনো খেজুর, শুতো মাটিতে, বসতো মাটিতে, ঘুরতো মাঠে-ঘাটে। তাদের দুর্বার স্বাধীন জীবনের সাধ ও স্বপ্ন ছিল ঐটুকু মাত্র। আরব বেদুঈন জীবনেও স্বপ্ন দেখেনি,—পারস্যের বালাখানাতে তারা বসবে, পারস্যের রাজমুকুট তারা মাথায় পরবে, পারস্যের রাজপ্রাসাদে তারা রাত্রি কাটাবে, রোমের স্বর্গপুরী আলেকজান্দ্রিয়ার মালিক হবে অসভ্য আরব। দামেস্কের ইন্দ্রপুরী তারা দখল করবে, ত্রিপলী-আর্মেনিয়া-আজারবাইজানে তাদের পতাকা উড়বে। সর্বশেষে সারা বিশ্বের বিস্ময় পারস্যের বালাখানা খণ্ডিত হবে, বিশাল রোম সাম্রাজ্য তাদের পদভারে প্রকম্পিত হবে, পারস্য ও রোমের লক্ষ-লক্ষ সেনাবাহিনী কয়েক শত মাত্র আরবের নিকট বারে বারে আত্মসমর্পণ করবে, সর্বযুগের সারা পৃথিবীর একমাত্র অজেয় বীর আল্লাহর তরবারি খালেদ জন্ম নেবে আরব মায়ের কোলে। শেরেখোদা হযরত আলীর এক হুঙ্কারে খাইবার বিজয় হবে, সবের ঊর্ধ্বে, সবের ঊর্ধ্বে তারা পাবে এক মহান-নবী। এ সবই ছিল স্বপ্নাতীত।

এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারা যতখানি দুর্বার ছিল জীবনের পথে, আজ তারা তা অপেক্ষাও শতগুণে দুর্বার হয়ে উঠল জীবনের ভোগে ও উপভোগে। সত্য কথা বলতে মক্কা বিজয়ের পরই এই বিপুল সংখ্যক আরব মুসলমান হয়েছিল প্রধানত দুটো কারণে—আত্মরক্ষা ও সুযোগ লাভ। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সময় রাজ্যের পর রাজ্য যখন জয় হতে লাগল, তখন এই বিপুল সংখ্যক জনগণই সামনে এগিয়ে এল, এখন আর আত্মরক্ষার্থে নয়, আত্মভোগে এগিয়ে এলো।

মহানবীর পবিত্র যামানা, পূত যামানা, কল্যাণময় যামানা, বিশুদ্ধকারী যামানা, পরিত্রাণকারী যামানা, আত্মত্যাগের যামানা, আত্মশুদ্ধির যামানা,

আত্মোপলব্ধির যামানা, মনুষ্যত্বের যামানা, মানবতার যামানা, এক আল্লাহ্‌র এবাদতের যামানা আজ আর নাই। তাঁরপদস্পর্শধন্য যুগ ও যামানা, দেশ ও দশ আস্তে আস্তে হারাল তাঁর পবিত্র প্রভাব, হারাল তার জীবনাদর্শ, হারাল তাঁর মহান শিক্ষা, ভুলে গেল তাঁর স্বার্থশূন্য পদক্ষেপ, ভুলে গেল তাঁর অতি উত্তম চরিত্রের কথা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার কথা, ক্ষমা ও দয়ার কথা, স্নেহ ও ভালবাসার কথা, আদর্শ জীবন-ধারণের কথা, আদর্শ সমাজ গঠনের কথা। তাই হারিয়ে ছিল—সেই অনুভূতি-সহানুভূতি, সেই অন্তর বেদনা। সবই যেন তখন তাদের নিকট ইতিহাসের রূপকথায় পর্যবসিত হতে চলছিল।

হযরত ওসমান (রাঃ) এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন। প্রথম যুগে মুসলমানদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছিল ইন্‌সাফ্ ঈমানের। কে কতখানি আল্লাহ্‌র পথে মহানবীর সম্মুখে ঈমানের পরীক্ষায় ও ইসলামের সেবায় অগ্রসর ও উত্তীর্ণ হতে পারছেন। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফতের দ্বিতীয়ার্ধে এই অতি উত্তম যুগটির প্রায় অবসান ঘটে এসেছিল। যাঁরা জীবিত ছিলেন, তাঁরা সব কিছু দেখেশুনে প্রিয় নবীকে স্মরণ করে প্রায় নীরব হয়েই গিয়েছিলেন। তখন সামনের সারিতে এসেছিলেন—ঐ অসংখ্য অগত্যা মুসলিম দল। যাঁদের সামনে ছিল—ধন-মান-যশ, পদোন্নতি। দিকে দিকে নব নব বিজয়, বিজয়ের পর বিজয় নূতন বিজয়ের বিপুল সম্ভাবনাকে সদাই সকলের সম্মুখে সমুজ্জ্বল করে তুলতে এবং ঐ আরব বাহিনীকে দান করত শত শক্তি, উদ্দীপনা, অকৃত্রিম অনুরাগ ও অনুপ্রেরণা। কিন্তু এগুলোর পশ্চাতে ছিল ঐ একই জিনিস—ধন-মান-যশ লোভ ইত্যাদি। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী আর বেশি দিন ছিলেন না, তাঁরা নিকট হতে দূর হতে আগ্নেয়গিরির মহা অগ্ন্যুৎপাত লক্ষ্য করার কোন সুযোগ পাননি, ত্যাগের মহাপ্লাবন কিভাবে কত বেগবান গতিতে প্রবাহিত হয়েছিল, তা তাঁরা আপন চোখে অবলোকন করতে পারেন নি, মহানবীর ও তাঁর প্রিয় সাহাবাগণের ধৈর্য ও সহ্যের সীমা কিভাবে কোরেশকুলের প্রতিটি ঘৃণিত কল্পনাকেও পরাস্ত করেছিল, তা তাঁরা আপন বুকে অনুভব করতে পারেন নি। কোথায় সেই হিজরতের যুগ, কোথায় সেই হিজরতের যুগের নিদারুণ দুঃখময় দিনগুলো। কোথায় সেই মোহাজিরগণের আত্মত্যাগ, কোথায় সেই আনসারগণের প্রাণ উজাড় করা সাহায্য। সেই পবিত্র যুগের এই প্রাণস্পর্শী কথাগুলো বর্তমান যুগের যুবকদের নিকট কথা ও কাহিনীতে মাত্র পরিণত হয়েছিল। এককথায় নবীর

প্রতি অনুরাগ, তাঁর আদর্শের প্রতি অনুরাগ, আল্লাহ্‌ব উপর নির্ভর, ঈমানের উপর নির্ভর, ঈমানের উপর আস্থা এগুলো আর তাঁদেরকে বারে বাবে আন্দোলিত করেনি, আলোড়িত করেনি। অতীতের ঐ সমস্ত জিনিস হ্‌লো অস্পষ্ট। এ যেন ইন্‌সাফ্‌ বিহীন ইন্‌সান্‌।

'অগত্যমুসলিমদের' সামনে যে জিনিসগুলো ধরা দিল, তা পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের চোখ ধাঁধানো দৌলতরাশি। যেখানে অযুত দৌলত, ঐশ্বর্য, বিলাস বৈভব, ধন-মান-যশ, পদোন্নতি মানুষকে বিদ্যুৎ বেগে তাড়িত করে, সেখানে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই হিংসা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, রেষারেষির উচ্চ ও তীব্র আকাঙ্ক্ষার শত কামনায়, শত বাসনায় অন্ধ হয়ে আসে। প্রাণের প্রদীপ নিভে যায়, জ্ঞানের আলোতে আঁধার নামে। এই পথেই আরবের আদিম প্রকৃতি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, এইখানেই দেখা দিয়েছিল গোত্র কলহ। মক্কা বিজয়ের পূর্বাধ্যায় ছিল একেবারেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইসলামের নিখুঁত ত্যাগের যুগ। মহানবীর সম্মুখে এই যুগে যাঁরা ইসলামে দাখেল হতে পারেন নি, তারাই নওমুসলিম, তারাই ছিল হতভাগ্য। এই হতভাগ্য দলকে নিয়ে খলিফা জাতির ভাগ্য আর কতটুকুই বা তুলে ধরবেন। এই হতভাগ্য ভোগবিলাসীদের দলে পড়ে সদাশয় খলিফাকেও কলঙ্কের ভাগী ও পরিস্থিতির শিকার হতে হলো। এই ছিল জাতির ইতিহাস, এই ছিল তাঁর ভাগ্যের পরিহাস। স্বয়ং মহানবী ইসলামের যে ইতিহাস রচনা করে গিয়েছিলেন, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে জাতি কোনদিনই ডুবতো না।

শাসন ব্যবস্থা : প্রশাসনে শ্রেণীবিন্যাস ও পর্যবেক্ষকদল :

খলিফা ওসমান সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জনকল্যাণমূলক শাসন ব্যবস্থারও প্রবর্তন করেন। তখনকার দিনে ইসলামী সাম্রাজ্যে প্রাদেশিক গভর্ণরগণের তিন শ্রেণীর দায়িত্ব পালন করতে হত—১। প্রশাসনিক দায়িত্ব, ২। সামরিক দায়িত্ব ও ৩। ধর্মীয় দায়িত্ব। সামারিক বাহিনীব দায়িত্ব থাকায় গভর্ণরগণ অনেক সময় প্রশাসনে যথাযথভাবে মনোসংযোগ করতে পারতেন না। অনেক সময় বেশ কিছুদিন যাবৎ সরাসরি সমরে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেও হতো। আজকের দিনের মতো তাঁরা অনুষ্ঠান-সর্বস্ব 'ফিতে কাটা' গভর্ণর ছিলেন না। এই কারণেই খলিফা ওমরের সময় হতেই প্রদেশগুলোকে জেলা স্তর হতে অঞ্চল স্তর পর্যন্ত সাজান হয়েছিল। যাতে প্রাদেশিক শাসনেব অভাবে প্রজাবা কোন অসুবিধা ভোগ না কবে। খলিফা ওমরের শ্রেণী বিন্যাসকে

খলিফা ওসমান আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত রূপ দেন। অতি সাধারণ প্রজাবৃন্দও যাতে কোন অসুবিধায় না পড়ে তার জন্য খলিফা সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। প্রাদেশিক গভর্ণর হতে আরম্ভ করে নিম্নমানের শাসকগণও যাতে কাজে ফাঁকি না দেন, সেই বিষয়টি তদারকি করাব জন্য খলিফা প্রতিটি প্রদেশে প্রধান সাহাবীদের দ্বারা এক একটি পর্যবেক্ষক দলও গঠন করেছিলেন। যাঁরা নিয়মিতভাবে খলিফাকে সকল বিষয় অবগত করতেন। খলিফাব এই কাজ দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে, জনসাধারণের কল্যাণার্থে খলিফা তাঁর প্রশাসনে কত আন্তরিক ও কত অকৃত্রিম দরদী ছিলেন।

রাস্তাঘাট ইত্যাদি :

বিশাল সাম্রাজ্যের যাতায়াত ব্যবস্থা যাতে সুন্দর ও সহজ হয় সেদিকটিকেও তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। অসংখ্য রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। পথিপার্শ্বে পথিকদের জন্য সরাইখানা ও কূপ তৈরি করেন। যাতে পথিকগণ দূর-দূরান্তে নানা কাজে অবলীলায় গমনাগমন করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র পুলিশী প্রহরার ব্যবস্থাও করেন, পথিকগণ যেন নির্বিঘ্নে নিরাপদে যাতায়াত কবতে পারে, ব্যবসায়ীরা যেন নির্ভয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। এদিকে খলিফার দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত প্রখর। অধিকন্তু সীমান্ত বরাবর জনসাধারণ যাতে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পায় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। কেননা ঐ সময় রোমানগণ প্রায়ই সমুদ্রপথে অগ্রসর হয়ে হঠাৎ আক্রমণে মুসলমানদের বড়ই বিব্রত কবতো। খলিফা কেবলমাত্র এই আক্রমণ রুখতেই নৌ-বহরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এবং গড়ে উঠে বিশাল মুসলিম নৌ-বহর। খলিফা ওসমানই মুসলিম নৌ-বহরের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ব' জনক স্বরূপ।

সেনাবাহিনী :

রাজ্যের সীমানা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীরও সম্প্রসারণ আরম্ভ হলো। সে যুগে যুদ্ধের ধারাও ছিল অন্যরকম। একসাথে বহু প্রাঙ্গণে যুদ্ধ চলতো। সবই প্রায় স্থলযুদ্ধ। সেনাবাহিনীর দায়দায়িত্ব রীতি-নীতি সব কিছুই ছিল হযরত ওমরের প্রচলিত ধারা। তবে হযরত ওমরের সময় রাজ্যেব সীমা আরব দুনিয়ার বাইরে খুব বেশি বিস্তার লাভ করেনি। যখনই কোন

সেনাপতি হযরত ওমরকে কোন দেশ জয় করার জন্য বলতেন, তখনই তিনি উত্তর দিতেন—"আল্লাহ্ আমাদের দুই দেশের মাঝখানে একটি আগুনের পাহাড় দিলে কতই ভাল হতো।" তিনি ছিলেন মহানবীর আদর্শের পূর্ণ অনুসারী।—

খলিফা ওসমান বহুস্থানে বাধ্য হয়েই সেনাবাহিনী প্রেরণ করতেন। তাই তাঁকে বিশাল বাহিনীও গড়তে হয়েছিল। যাতে সেনাবাহিনীতে কোনরূপ অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দানা না বাঁধে, তার জন্য তিনি পূর্বেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র বাহিনীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছিলেন, সেনাবাহিনীতে যাতে কোন রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়—যার জন্য বড় বড় বহু অধিনায়ক ছিলেন—যাঁরা আপন আপন গোষ্ঠী পরিচালনা কবতেন। সকলেই দায়ী থাকতেন প্রধান সেনাপতির নিকট।

সাপ্তাহিক সম্মেলন : (আম দরবার)

খলিফার একটি আম দরবার ছিল। প্রতি শুক্রবার জুম্মার নামাযের পূর্বে তিনি এই আম দরবারে সর্বসাধারণের সাথে মিলিত হতেন। বহু জনের বহু বক্তব্য শুনতেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারের নির্দেশ দিতেন। এই আম দরবারে এক একটি অঞ্চলকে এক একদিন বিশেষভাবে স্থান দিতেন। এবং এই দরবার হতেই তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের জনসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে ও স্বকর্ণে পেতে চেষ্টা করতেন। একজনের দুঃখ কাহিনী হতে সমগ্র সমাজের দুঃখ কাহিনীকে অনুভব করার চেষ্টা করতেন। খলিফা এখানেই ছিলেন মহানুভব। কোন সেনাপতি কোন বিশাল অঞ্চলকে জয় করেছেন, তা যেমন শুনতেন গভীর আগ্রহের সাথে, ঠিক সমভাবেই শুনতেন অসহায় মানুষের অভাব অভিযোগের অন্তর-বেদনা আকুল আবেদন ও নিবেদন।

বাৎসরিক সম্মেলন :

ঠিক ঐভাবেই সারা দেশ জুড়ে একটি বাৎসরিক সম্মেলন করতেন, যে সম্মেলনে থাকতেন দেশের সকল গভর্ণরবৃন্দ। এটা বসতো প্রতি বছর হজ্বের পর মদীনাতে। খলিফা সকল গভর্ণরের নিকট সরাসরি জানতে চাইতেন কার কি সমস্যা আছে। কোথায় জনগণ কোন্ অসুবিধা ভোগ কবছে। এবং গভর্ণরদের সম্পর্কেও কিছু বলার থাকলে, খলিফা গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয় ভাবেই বলতেন। জনগণই ছিল খলিফার মূল বিবেচ্য বস্তু।

হযরত ওসমানের ভূমি সংস্কার
জমিদারী প্রথার প্রবর্তন

(Land reformation and Jamindari system)

ওমরের ভূমিনীতি :

আজ হতে প্রায় পনের শত বছর পূর্বে হযরত ওমর ফারুক ঘোষণা করেছিলেন—'লাঙ্গল যার জমি তার'। ইসলামের তৃতীয় খলিফা ওসমান এই নীতির পরিবর্তন করে জমিদারী প্রথার প্রবর্তন কবেন। উভয়েরই দৃষ্টি কোণ থেকে উভয়েই স্বচ্ছ ছিলেন। তবে ওসমান (রাঃ)-এর দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালে দেশের জন্য আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপে পর্যবসিত হয়েছিল।

মদীনা সাম্রাজ্য গঠনের বীজ যতটা বহন করেছিল, তা অপেক্ষা মানুষ গঠনের মন্ত্র অনেক গুণে বেশি বহন করেছিল। মহানবীর যাঁরা খুব নিকট সাহাবা ছিলেন, তাঁরা চরিত্রের দিক থেকে অতি উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সেদিন মদীনা ছিল সারা আরবের বা ইসলামি সাম্রাজ্যের আদর্শভূমি। এই আদর্শ ভূমিকে যাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা ছিলেন মহানবীর মহান সাহাবা। খলিফা ওমর ঐ সমস্ত সাহাবাগণকে মদীনার বাইরে বসবাস করার জন্যে অনুমতি দিতেন না। যে মদীনা শহর সারা ইসলামি সাম্রাজ্যকে পরিচালনা করছিল, পথ দেখাচ্ছিল, ঐ মদীনা শহরটি গড়ে উঠেছিল সাহাবীদের দ্বারা। সুতরাং জাতীয় জীবনের আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখতেই এবং দেশকে খাঁটি ইসলামি ভাবধারায় গড়ে তুলতে, খলিফা ওমর সাহাবাগণকে মদীনার বাইরে বসবাসের অনুমতি দেননি। মক্কা বিজয়ের পর বহু কোরেশ নেতা মক্কা ছেড়ে মদীনাতে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁদের জীবন-যাত্রা ছিল ব্যয়বহুল। ইসলাম তাঁদেরকে শরীয়তি জীবনযাপনে বাধ্য করে। তাঁরা যে অস্বস্তি বোধ করত না, তা নয়। খলিফা ওমর সকলকেই বাধ্য করেছিলেন—ইসলামি অনুশীলনে। খলিফা ওমর বুঝতে পেরেছিলেন—এঁদের যদি একবার বাইরে যেতে বা থাকতে দেওয়া হয়, তাহলে জাতি গঠনে বাধা পড়বে, জাতি তার আদর্শগত দিক তুলে ধরতে পারবে না। অনেকে বাদানুবাদ করলে খলিফা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—উট পরিণত বয়স্ক না হলে সে মরুভূমির যোগ্য হতে পাবে না। সুতরাং জাতি গঠনে জাতীয় জীবনেও অনেক কিছু সময় সাপেক্ষ, তা

মেনে নিতে হয়। এটা ছিল ওমরের অসাধারণ দূরদর্শিতা।

খলিফা ওমর কৃষিভিত্তিক দেশে কৃষি ও কৃষকের উন্নতিকে খুবই জোর দিয়েছিলেন। তিনি জোতদার ও জমিদার প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল একটি কৃষিনির্ভর দেশে কৃষি ও কৃষকের সম্যক উন্নতির প্রয়োজন। একমাত্র কৃষি ও কৃষকের স্বার্থ রক্ষার জন্যই তিনি কৃষক ব্যতীত কৃষি-জমির হস্তান্তর একেবারেই নিষিদ্ধ করেছিলেন। এই নীতি তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রবর্তন করেছিলেন। বিজিত দেশগুলোতে কৃষককে তার জমি হতে উচ্ছেদ করা একেবারেই নিষিদ্ধ করেছিলেন। কোন আরবীয়কে আরব ব্যতীত অন্য কোথাও জমি কিনতেও নিষিদ্ধ করেছিলেন। এই ছিল তাঁর আরব জাতীয়তাবাদ গঠন প্রণালী। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন—সবেমাত্র আরবের কিছু সংখ্যক মানুষ ইসলামের সেবায় ইন্‌সাফ্‌ ও ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। বাদ বাকি সমগ্র কোরেশকুলই ছিলেন অনুশীলনের মধ্যে। খলিফা ওমর বিজিত দেশগুলোতে সৈনিকদের মধ্যে জমি বিতরণ না করে সরকারি খাস জমি হিসাবে রক্ষা করতেন, এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচখরচা বাদে যা থাকত, তা হতে যারা প্রকৃত হকদার, তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ভূমি সংস্কার (গভর্ণরের পত্র) ঃ

হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁর খেলাফতের দ্বিতীয়ার্ধে কুফার গভর্ণরের নিকট হতে একটি পত্র পেয়ে বুঝতে পারেন যে— শহরের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শালীনতা অবক্ষয়ের পথে দ্রুত বিলীয়মান। খলিফা গভীর উদ্বেগের সাথে চিন্তা করতে থাকলেন, এমনটি কেন হলো বা হচ্ছে। প্রথম কারণ স্বরূপ জানতে পারলেন যে, কুফা নগরীতে জনসংখ্যার মাত্রা অতিরিক্ত ভাবেই বেড়ে গেছে। যেখানে যাযাবর আরব, অশিক্ষিত আরব, গ্রাম্য আরব, বেদুঈন আরব সব একাকার হয়ে গেছে বা যাচ্ছে। এবং তাদের সংখ্যাই বেশি। সুতরাং তাদের প্রভাবে আজ অন্যান্যরাও প্রভাবান্বিত।

মূল কারণ :

খলিফা ধীরভাবে চিন্তা করে এর তলদেশে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। শহরে মানুষের এত ভিড়ের কারণ স্বরূপ প্রথম বুঝতে পারলেন, তখনকার দিনে আরবে যুদ্ধ একটি মারাত্মক বিপদে পরিণত না হয়ে লাভজনক ব্যবসায় পর্যবসিত হয়েছিল। যার পশ্চাতে ছিল প্রধানত দুটো কারণ—একটি, বিজিত

দেশগুলো আয়াশে-আরামে, ভোগে-বিলাসিতায়, অপচয়ে-অমিতব্যয়িতায় অপদার্থের পাহাড়ে পরিণত হয়েছিল। দ্বিতীয়টি, এইজন্যই বীর আরব, মিতচারী আরব, মরুচারী আরব, দরিদ্র আরব, বুভুক্ষু আরব তাদের সহজেই যুদ্ধে পরাজিত করত। সেখানে যুদ্ধ আরবদের নিকট মরণ ফাঁদ বা মারাত্মক রূপে দেখা দেয়নি, দেখা দিয়েছিল লাভজনক ব্যবসারূপে। যেহেতু অঢেল গণিমতের মাল আসত। এবং এই মাল সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। তাই যখনই যুদ্ধের ডাক পড়ত, তখনই পল্লী হতে পঙ্গপালের মত মানুষ শহরে ভিড় করতো। পরবর্তী সময়ে তারা আর শহর ছাড়তে চাইতো না। শহরেই থেকে যেতো। এবং এদের সঙ্গে থাকতো তাদের অনাচারী-জীবন, নানা কুসংস্কার, নানা উচ্ছৃঙ্খলতা, নানা অসভ্যতা, নানা কুঅভ্যাস ইত্যাদি ইত্যাদি।

অন্য একটি কারণেও শহরে অনাচারী লোকের ভিড় জমে উঠেছিল। নানা যুদ্ধক্ষেত্র হতে কেবলমাত্র অপরিমিত সম্পদই শুধু আরবকে ভরে তোলে নি, ঐ মালের সাথে অসংখ্য যুদ্ধবন্দীও এসে যেতো। এবং তাদেরকেও মালে গণিমতের সাথে সকলের মধ্যে দাসদাসী রূপে বিলি করা হতো। ধীরে ধীরে ওরা একটি বিশাল সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। যাদের আচার-ব্যবহার আদব-কায়দা সব কিছুই ছিল অতি নিম্নমানের। নীচতা-কপটতা,পরশ্রীকাতরতা, পরাধীনতা, চিন্তার দৈন্যতা, হিংস্রতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি তাদেরকে একেবারেই গ্রাস করে বসেছিল। এদের সন্তানাদিও সমাজকে অবক্ষয়ে ভরে তুলল। মালিক ও প্রভুগণ নিজ নিজ দাসীদেরও স্ত্রীরূপে ব্যবহার করতে পেতো। যার ফলে রক্তের সংমিশ্রণও আরম্ভ হলো। খাঁটি আরব রক্ত দূষিত হয়ে উঠল। বিপুল সম্পদ আরব-সমাজে নিয়ে এলো বিবিধ রোগবীজাণু। অযুত মাল-সম্পদ ও অসংখ্য দাসদাসী আরবের জন্য অবিমিশ্র আশীর্বাদ হয়নি। বরং পরবর্তীকালে (৬৬১-৭৫০-১২৫৮ খ্রীঃ) বিষাক্ত কালসাপরূপে দেখা দিয়েছিল। বিষয় হয়েছিল বিষ।

এই দুটো ভাবী বিপদ সম্পর্কেই হযরত ওমর ফারুক বার বার জাতিকে সতর্ক ও সাবধান বাণী শুনিয়েছিলেন। একটি আরব জাতীয়তাবাদের বিন্যাস, অন্যটি অবলীলায় পাওয়া অগাধ ধনসম্পদ। দুটোর মধ্যেই জাতির ধ্বংসের বীজ লক্ষ্য করেছিলেন। তাই নির্মম হস্তে জাতিকে পরিচালনা করার জন্য ধরেছিলেন কঠোর শাসননীতি। কালজয়ী শাসক ওমরের অভাবেই বহু অবাঞ্ছিত বস্তু মাথা চাড়া দিয়েছিল।

প্রতিকারে জমিদারী ব্যবস্থা : খলিফা কুফার গভর্নর সাঈদের পত্রে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েই এর প্রতিবিধানকল্পে কি করা যায়, তার জন্য মন্ত্রী মারওয়ান ও আমির মুয়াবিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন। এ যেন বিড়ালকে মাছ বাছতে দেওয়া হলো। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে খলিফাকে পরামর্শ দিলেন—পল্লী অঞ্চলের গরিবদের শহরে আসা বন্ধ করতে হলে শহরের ধনীদের পল্লীমুখী করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন জমি স্থানান্তরিতকরণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞার বিলুপ্তিকরণ। এবং সকল ধনী নাগরিককে পল্লীর অঞ্চলে গিয়ে বাড়িঘর নির্মাণ করে বসবাস করার অনুমতি দেওয়া। খলিফা তাঁদের পরামর্শমত তাঁর খেলাফতের অষ্টম বর্ষে অর্থাৎ (৬৫২ খ্রীঃ) তেত্রিশ হিজরীতে হযরত ওমর ফারুকের কালজয়ী ভূমি-নীতি বাতিল ঘোষণা করে সকলকে ইচ্ছামত জমি-জায়গা ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিলেন। খলিফার উদ্দেশ্য ছিল অতি মহৎ। সকল জিনিসই বিবর্তনশীল, সমাজও পরিবর্তনশীল, তার ব্যবস্থাপনাও ক্ষণস্থায়ী সময়সাপেক্ষ। খলিফা এই সমস্ত নানা কথা চিন্তা করেই অত্যন্ত সাধু উদ্দেশ্যেই খলিফা ওমরের নীতির পরিবর্তন করলেন। এই সরকারি আদেশ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র আরবে যেন একদিনে শতবর্ষের মহাবন্যার বাঁধ ভেঙে গেল। প্রচুর ধন, সম্পদ তাঁদের সমস্যা হয়ে পড়েছিল। তাঁরা দুর্বার বেগে জমি কিনতে আরম্ভ করলেন। এক বছরেই অসংখ্য জমিদার জন্ম নিলেন। এক বছরেই জমিদারী ও জায়গীরদারের সবুজ শালবনে ভরে উঠল আরব ভূমি।

অতঃপর সারা দেশে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হলো জমি ক্রয়ের। যে যেখানে পারল জমি খরিদ করল। প্রথম বছরটি এইভাবেই কাটল। পরের বছর খরিদকৃত জমিগুলোর শ্রেণীবিন্যাস আরম্ভ হলো। আপন আপন প্রদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য এক প্রদেশেব জমির মালিক অন্য প্রদেশের মালিকের সাথে আপন আপন সুবিধামত জমি-জায়গা পরিবর্তন করতে আরম্ভ করলো। সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি কাজ আরম্ভ হলো—মালিকগণ তাঁদের অনুর্বর জমিগুলো দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিক্রি করে দেশের উর্বর ক্ষেতগুলো হস্তগত করলেন। রাতারাতি তৈরি হলো বিরাট বিরাট ভূ-স্বামী, জমিদার ও জায়গীরদার। এঁদের মধ্যে যে কযেকজন প্রধান ক্ষুদে বাদশাহ গডে উঠলেন, তাঁদের মধ্যে মারওয়ান, মুয়াবিয়া, তালহা, যুবাইর প্রমুখ ব্যক্তিগণ ছিলেন প্রধান। পাশাপাশি সৃষ্টি হলো ক্ষেতহীন বহু গবিব-প্রজা, অগণিত দাস-দাসী।

মক্কা, মদীনা ছাড়াও গড়ে উঠল বহু সমৃদ্ধ শহর, জন্ম নিলেন আমির-উমরা, নাযেব-নওয়াব, জমিদার-জায়গীরদার ইত্যাদি। বড় বড় জমিদার বিশাল ক্ষেত খামারে বহু ক্ষেতমজুর নিযুক্ত করে খামার দেখাশুনা করতে আরম্ভ করলেন। ক্ষেত খামারের ক্ষেতমজুরগণ দিবারাত্রি কাজ করছে, বাড়িতে অগণিত দাসদাসী, পকেটে প্রচুর পয়সা, হাতে প্রচুর অবসর সময়। পিতামাতা যেমন বাচ্চাকে জন্ম দেয়, ঠিক অনুরূপভাবেই মানুষের প্রচুর ধনসম্পদ ও অবকাশ জন্ম দেয় সমাজে শৌখিনতা এবং শৌখিনতা হতেই জন্ম নেয় নাচ-গান, জুয়া-মদ আরো কত কি। এই ভাবেই সমাজের নূতন পরিস্থিতি ও পরিবেশ জন্ম দেয় নূতন পিচ্ছিল প্রজন্মের। পাপের পথ পিচ্ছিল ও নিম্নগামী।

এই জমি বণ্টনে খলিফার কেলেঙ্কারী চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে সরকারি খাস জমিগুলোকে তাঁদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। এবং আরো গুরুতর অভিযোগ ছিল—খলিফা সিরিয়া প্রদেশের তামাম খাস জমি তাঁর প্রিয় আমির মুয়াবিয়াকে দান করেছিলেন। এবং ইরাকের খাস জমি মন্ত্রী মারওয়ানকে উপহার দিয়েছিলেন। এ অপেক্ষাও গুরুতর কঠিন অভিযোগ ছিল—খলিফা ওমর চ্যালডিয়ার অন্তর্গত সোয়াত অঞ্চলের অতিশয় উর্বর জমিগুলোকে জনগণের কল্যাণার্থে সরকারের পবিত্র আমানত হিসাবে সুরক্ষিত করেছিলেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় খলিফা ওসমান আপন আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ঐ জমিগুলোকে বিলি করে পবিত্র আমানতের খেয়ানত করেছিলেন। খলিফার এই কাজে বহু বর্ষীয়ান সাহাবাও বিস্মিত ও বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। জাতির জন্য এটা ছিল খলিফা ওমরের অতি প্রিয় ও পবিত্র আমানত। কথিত আছে, এই কাজের পর বহু সাহাবী খলিফাকে মুখের উপর তীব্র কথার কষাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিলেন। কেউবা নীরবে আক্ষেপে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। কেউবা শিশুর ন্যায় রোদন করেছিলেন। কেউবা আর কোনদিনই খলিফার মুখ দেখেন নি। এককথায় খলিফার এই কাজে জনরোষ ফেটে পড়েছিল। এই জনরোষের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন মহান আবুযার গিফারী। এই জনরোষেই খলিফাকে একদিন আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হাতে বিলাসিতার যে অনুপ্রবেশ ঘটল, বিত্তবানদের যে বিলাস ভবন গড়ে উঠল, এই সমস্তই একদিন বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের ন্যায় আরব দুনিয়াকেও অধঃপতনেব অতল সমুদ্রে নিয়ে গেল।

মহানবীর স্বপ্ন ও খলিফার মহা ভুল :

মহানবীর মানুষ গডাব ও সমাজ গডার স্বপ্ন কি ছিল। তিনি চেযেছিলেন মানবগোষ্ঠীকে মানবতা ও মনুষ্যত্বেব উপব দাঁড কবাতে এবং মানব সমাজকে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বেব উপব প্রতিষ্ঠা কবতে। সাবা বিশ্ববুকে মানবতা যখন মৃতপ্রায়, তখনই তিনি নিযে এলেন মানবতাব বাণী। এবং তাকে প্রচাব ও প্রতিষ্ঠা করলেন জীবন-মবণপণ কবে। তিনি চেযেছিলেন সাবা বিশ্বে সকল মানুষেব জন্যই একটি পবিপূর্ণ জীবনধাবা, যেখানে মানুষে মানুষে কোন কৃত্রিম ব্যবধান থাকবে না, যেখানে জন্মগত, জাতিগত, ধর্মগত, বর্ণগত এবং অর্থনৈতিক অবস্থাব কৃত্রিম ব্যবধানগুলোব মূলচ্ছেদ কবে বংশানুক্রমে বসে খাওযাব মূলে কুঠাবাঘাত কবা হবে। এবং স্থাপন কবা হবে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বেব উপব সর্বজনগ্রাহ্য একটি আদর্শ জীবনধাবা। এক আল্লাহব উপাসনাব সাথে এটাই ছিল মহানবীব প্রধানতম স্বপ্ন। স্বযং খলিফাই ব্যর্থ হলেন বুঝতে।

মহানবীব এই জীবন-স্বপ্নকে বাস্তবে রূপাযিত কবাব নিমিত্ত হযবত আবুবকব ও হযবত ওমব ফারুকেব চেষ্টাব কোন অবধি ছিল না। বিশেষ কবে হযবত ওমব তাঁব শাসননীতি প্রণযনেব সময অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন মহানবীব জীবনধাবা ও জীবন স্বপ্ন সম্পর্কে। হযবত ওমব চেযেছিলেন, প্রথমত আবব ভূমিতে মহানবীব মহান উদ্দেশ্য ও মহৎ আকাঙ্ক্ষাকে পবিপূর্ণভাবে রূপ দিতে। তাই গডে তুলেছিলেন আবব জাতীযতাবাদ। যাতে আবব ভূমিতে বিজিত জাতিসমূহেব পচন ধবা সভ্যতাব ক্ষযবোগ আবব জাতিকে আক্রান্ত না কবে। তিনি বুঝতে পেবেছিলেন মানবজাতিব সর্বাপেক্ষা বড শত্রু তাব আপন চবিত্রেব অবক্ষয। তাই তিনি অতি কঠোব হস্তে আবব জাতিকে ঐ সমস্ত সংমিশ্রণ হতে বক্ষা কবেছিলেন। মহানবী চেযেছিলেন আবব হোক বিশ্বমানবেব আদর্শভূমি। মহানবী আপন জীবন দিযে যে আদর্শ আবব ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করলেন, হযবত ওমব ছিলেন তাব সার্থক প্রতিষ্ঠাকাবী

খলিফা ওসমানেব জমিদাবী ও জাযগীবদাবী প্রথাব প্রবর্তনে [illegible] সমাজ দু'ভাগে বিভক্ত হযে উঠল। ধনী আব দবিদ্র, প্রভু আব দাস, উচ আব নিচ। [illegible] উচ্চ প্রবাব আব্ল অভিজাত্য, সেই [illegible] যুগেব——অহমিকা, আত্মম্ভবিতা, অপচয, অপব্যয। ইসলামেব সাম্যেব নীতি, শান্তিব বাণী, ভ্রাতৃত্বেব [illegible] যেন অন্তর্হিত হলো। উৎপত্তি হলো আভিজাত্যেব, [illegible] মাত্র কযেক বছব পূর্বে মকচাবী আবব, মরুবাসী [illegible] মাটিব ঘবে অনাহাবে অর্ধাহাবে

দিন কাটাত। আজ তারা বিরাট জমিদার, বিশাল ঐশ্বর্যের মালিক। এ সবই তাদের নিকট স্বপ্নবৎ মনে হলো। এসে গেল মনের মাঝে কত আত্মগরিমা, আত্মমহিমা, আত্মশ্লাঘা ইত্যাদি। যে কোন মানুষ, যে কোন পরিবার, যে কোন সমাজ একবার অপচয়ের অমিতব্যয়িতার ঘোড়াকে ছুটিয়ে দিলে, তার লাগাম ধরা আর সম্ভব হয় না। এ যাত্রা তখনই সমাপ্ত হয়, যখন ঐ দুরন্ত কামনা ও বাসনার অবাধ্য অশ্বটি স্বয়ং অশ্বারোহীকেই বিশাল গহ্বরে ছুঁড়ে দেয়। এইরূপ অবাধ্য অশ্বতে একবার চাপলে চাহিদারও আর কোন শেষ থাকে না। এই চাহিদা মেটাতেই একদিন আরব জমিদারগণ তাদের প্রজাবর্গের উপর আরম্ভ করলেন অত্যাচার-অবিচার। জমিদারগণের মধ্যে আরম্ভ হলো প্রতিযোগিতা, কে কত শত দাস-দাসী রাখে, কার দব্‌দবা কত, কার দরবার কত উন্নত, কার প্রমোদ কানন কত বিশাল, কার স্বর্গপুরী কত সুন্দর, কার ইন্দ্রপুরী কত উজ্জ্বল, কার খেদ্‌মতগার্‌, মোসাহেব, স্তাবক কত বেশি ও কত শ্রেণীর। এই প্রতিযোগিতা চালাতে জমিদার ও জায়গীরদারগণকে প্রচুর অর্থের প্রয়োজনেই চালাতে হলো গরিব প্রজাবর্গের উপর নির্মম শোষণ। নিঃস্ব মজদুরদের উপর নিষ্ঠুর শাসন, অর্থাৎ-অর্ধাহারে অনাহারে কাজ করো। ফলে মানুষে মানুষে সৃষ্টি হলো দুস্তর ব্যবধান, বিরাট ব্যবধান। ইসলামের সাম্যের বাণী ভ্রাতৃত্বের বাণী অভিনয়ে পরিণত হলো। এককথায় এই জঘন্য প্রথার ফলে ইরানের কালিমা ও রোমের কলুষ ইসলামের পবিত্র কুঁড়ি ও কোরকে প্রবেশ করল।

ইসলাম দুনিয়াতে এনেছিল—সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী, মানবতার বাণী, গরিবের দুঃখ মোচন, দুঃস্থজনের অন্নের দুটো সংস্থান, কিন্তু আরব যেন আবার সেই আঁধারেই ফিরে গেল। লক্ষ লক্ষ গরিবের আহজারী ও আর্তনাদে আল্লাহর আরশ আবার কেঁপে উঠল। অবশেষে অসহায় খলিফাও বুঝতে পেরেছিলেন—হলো এক মহা ভুল, পাখি তখন খাঁচা ছাড়া।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফতে রাজস্বের উৎস ও বিলি বণ্টন
(Unjustified disbursement of revenue)

উৎস : তদানীন্তন মুসলিম রাষ্ট্রের রাজস্ব প্রধানত তিন দিক থেকে আসত—১। যাকাত, ২। খেরাজ, ৩। জিজিয়া। প্রতিটি অবস্থাপন্ন মুসলমানকে তাঁর আর্থিক অবস্থার সঙ্গতি অনুসারে যাকাত দিতে হতো নির্দিষ্ট পরিমাণে। এই অর্থ ব্যয় হতো সামরিক অসামরিক ক্ষেত্রে ও গরিব মুসলমানদের ভরনপোষণার্থে। জিম্মীগণকে তাদের স্বত্ব দখলীয় জমির জন্য খেরাজ নামে একটি ভূমিকর দিতে হতো। জিজিয়া মুসলমানদের বহু পূর্ব হতেই রোমান সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল। জিজিয়া সামরিক দায়িত্বের পরিবর্তে আদায় করা হত। পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের অনুকরণে মুসলিম রাষ্ট্রের খেরাজ এবং জিজিয়া প্রবর্তিত হয়। তবে শেষের দিকে পারসিক ও রোমক সম্রাটগণ তাঁদের বিশাল ব্যয় বাহুল্যতার জন্য প্রজাবৃন্দেব উপর করের কলেবরকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিম আগমন এক্ষেত্রে তাদের জন্য অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদই হয়েছিল। বিশেষ করে হযরত ওমর জিম্মীদের উপর বা অমুসলমান প্রজাবৃন্দেব উপর যে সহানুভূতি ও উদারতা দেখিয়ে গেছেন, তা তাঁদের কথাতেই চির প্রশংসিত। পরবর্তী যুগে রাজস্বের এই তিনটি উৎস ছাড়াও আরো কিছু বেড়ে যায়। যেমন অশ্ব কর ইত্যাদি।

হযরত ওমরের সময় বণ্টন নীতি :

খলিফা ওমরের সময় যেখান হতেই যা কিছু আসতো, সমুদয় বায়তুল মালে জমা হতো। খরচ হতো প্রধানত তিন পথে। বেসামবিক প্রশাসন, সামরিক বিভাগ, গরিব দীন-দুঃখী। খলিফা আবুবকরের সময়ও বায়তুলমাল ছিল। এবং তিনি কিভাবে তার সদ্ব্যবহার করেছিলেন, সামান্য চিনির ঘটনা হতেই তা বর্ণনাতীত। এই আবুবকরই ছিলেন ইসলামি বাষ্ট্রের ত্রাণকারী। পরে এলেন পরবর্তী খলিফা ওমর ইবনে খাত্তাব। তিনিও সরকারি বায়তুল মালের কিভাবে সদ্ব্যবহার করেছিলেন তা তাঁব একটি মাত্র জামার কাপড়ের ঘটনাই বিশ্ব-ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয়, সেই অন্ধকার যুগেও গণতন্ত্রের জীবন্ত-প্রহরী জাগ্রত-নায়ক খলিফা ওমব অতি সাধারণ মানুষকেও কতখানি বেপরোয়া বাক্ স্বাধীনতা

দিয়েছিলেন, তাও বিশ্বগণতন্ত্রের ইতিহাসে আজও নজিরবিহীন। আজকালকার আধুনিক সভ্যতার যুগেও কোন ক্ষুদে মুখ্যমন্ত্রীকেও হঠাৎ একটি কথা জিজ্ঞাসা করলে নিরপরাধ প্রশ্নকারীকে পুলিশেব হাতে কতই না নির্যাতন সহ্য করতে হয়। কিন্তু বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী গণতন্ত্রের প্রাণপুরুষ, প্রবাদপুরুষ হযরত ওমর ছিলেন এ সবের বিরল ব্যতিক্রম। তিনি সমগ্র প্রশাসনকে দুর্নীতি মুক্ত করতে নিজেকে কতখানি সতর্ক রেখেছিলেন সে কথা ইসলামের ইতিহাসের পৃষ্ঠা হতে কত সাহিত্যিকের কত কবির অমর কবিতাতে সসম্মানে স্থান লাভ করেছে। তাঁর শরীরে উঠেছিল শত তালিকাযুক্ত একটিমাত্র কামিজ ও কুর্তা, গৃহ ছিল গাছের তলা, বিছানা ছিল খেজুর পাতা, হুকুমত চলতো নবীর মসজিদে। এই মানুষটিরই একটি আঙ্গুল হেলনে আরব-আজম এক সাথে জানিয়েছে বিদ্রোহ নয়, বিপ্লব নয়, বরং প্রীতির ভরে প্রাণের ভরে শত হৃদয়ের শত সালাম। কোন এক সময় সরকারি কোষাগারের একটি উট হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়ায় খলিফা ওমর যে মনের যে ব্যস্ততার পরিচয় দিয়েছিলেন তা হতে সহজে বুঝা যায়, তিনি বাইতুল মালকে কেবল সরকারি নয়, আল্লাহরই ধনাগার মনে করতেন।

খলিফা ওসমানের বণ্টন নীতি :

ইসলামের ইতিহাসের সকলেই জানেন খলিফা ওসমান ছিলেন স্বভাবে দাতা। তাঁর দানে আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই উপকার পেয়েছে। ব্যবসা ছিল তাঁর পেশা এবং দান ছিল তাঁর নেশা। এ নেশা তাঁর জীবনে কোন সময়ই কাটেনি। বরং বেড়েছে। জনগণের আপত্তি ঐখানেই— বায়তুলমালকে কেন্দ্র করে তাঁর দানের নেশা সীমা ছাডিয়ে গিয়েছিল। "আল্লাহ্ কোন সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না।" কোরআন— ২ : ১৯০, ৫ : ৮৭, ৭ : ৫৫, ১১ : ৪৪, ২৫ : ১৯, ২৭ : ৫২, ৩৭ : ৩০, ৬৬।

খলিফা ওমর রমজান মাসে মাথাপিছু দৈনিক এক দিরহাম, কেবল নবীপত্নীদের জন্য দুই দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দান নির্ধারণ করেছিলেন। মদীনাবাসীগণ এতে খুবই খুশী ছিলেন। খলিফা ওসমান ওটাকে দ্বিগুণ করলেন। খলিফা ওমর সরকারি মুসাফিরখানায় কেবলমাত্র দীন-দরিদ্রদের জন্য আহারের ব্যবস্থাপণা করেছিলেন। খলিফা ওসমান ওটাকে সবার জন্য অবারিত করে দিলেন। ফলে কেবলমাত্র অভাবগ্রস্তই নয়, ধনী-নির্ধন

সকলেই সরকারি লঙ্গরখানাটিকে উদরপূর্তির আড্ডাখানায় পরিণত করল। খলিফা ওমর নির্ধারিত বৃত্তির বাইরে কাউকে কিছুই দিতেন না। সকলেই সমান থাকত। খলিফা ওসমান বিশেষ বিশেষ লোককে অধিক বৃত্তি দিতে থাকলেন। ফলে সমাজে কথা উঠল। খলিফা ওমর কোন ধনীকেই বাইতুল মাল হতে অর্থ প্রদান করেন নি। খলিফা ওসমান অনেক ধনী ব্যক্তিকে ব্যবসা পরিচালনা ও জমি ক্রয়ের জন্য প্রচুর অর্থ প্রদান করতেন। এই কাজ করা তো দূরের কথা, খলিফা ওমর জীবনে এটা একবার চিন্তাও করতে পারেন নি।

ছয়জন : খলিফা ওমর যাঁদের জাঁকজমক ও লোভ-লালসা সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গিয়েছিলেন, খলিফা ওসমান তাঁদেরকেও বাইতুল মাল হতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ মঞ্জুর করেন। যেমন—ইবনে সা'দ বলেন—খলিফা ওসমান ধনী তালহা ও যুবাইরের পূর্বের সমস্ত ঋণ মাফ করে দিয়ে তাদের আবার বিরাট অঙ্কে নূতন দান মঞ্জুর করেন। তালহাকে দুই লক্ষ ও যুবাইরকে ছয় লক্ষ দিরহাম ঋণ বাইতুল মাল হতে দেওয়া হয় এবং তাঁরা ঐ বিশাল অর্থ দ্বারা আপন আপন ব্যবসা ও জমিদারীকে বিস্তৃত করেন। অনুরূপভাবেই মারওয়ানকে বহু টাকার ঋণ মকুব করে দিয়ে আবার বিরাট অঙ্কের নূতন ঋণদান করা হয়। মন্ত্রী মারওয়ানের চাচা হাকামকেও খলিফা তিন লক্ষ দেরহাম ঋণ দেন এবং হাকামের পুত্র হারিসকেও অনুরূপ দান বাইতুল মাল হতে দেওয়া হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে খালিদ ও ইবনে সা'দকেও তিন লক্ষ দিরহাম দেওয়া হয়।

আব্দুল্লাহর পদত্যাগ :

এখানে দুটো কথা জনগণ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে, যাঁদেরকে অঢেল ঋণ দেওয়া হলো তাঁরা সকলেই খলিফার বড়ই প্রিয়জন এবং এই অর্থ আর কোনদিনই বাইতুলমালে ফিরে আসবে না। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, কুফার গভর্ণর ওলিদ বাইতুল মাল হতে বহু অর্থ ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। এবং নির্দিষ্ট সময়ে ঐ ঋণ পরিশোধ করবার কোন আগ্রহ না দেখে সেখানকার বাইতুলমালের কোষাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ গভর্নরকে তাগিদ দিতে থাকেন। গভর্নর পাশ কাটাতে থাকেন। কোষাধ্যক্ষ নাছোড়বান্দা। তিনি বারবার তাগিদ দিতে থাকেন—সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, ঋণ শোধ করুন। গভর্নর খলিফার নিকট দরবার

করলেন। খলিফা কোষাধ্যক্ষকে ডেকে সবার সামনে তিরস্কার করে নীরব থাকতে বললেন। মহানবীর স্নেহধন্য সাহাবী, খলিফা ওমরের নীতিভক্ত কোষাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে মাথা উঁচু করে বিপ্লবের পথে সবার সামনে বাইতুল মালের চাবিখানি খলিফার হাতে প্রত্যর্পণ করে নীরবে দরবার পরিত্যাগ করলেন। সকলেই জ্ঞাত হলো এগুলো ঋণ নয়, খলিফার অনুগৃহীত ব্যক্তিদের অনুগ্রহ দানমাত্র। খলিফা ওমর একাজ করা তো দূরের কথা। একবার চিন্তাও করতে পারেন নি।

গোত্রপ্রীতিতে অন্ধ :

খলিফা ওসমান তাঁর চাচা হাকাম ও তাঁর পরিবারের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে থাকলেন, এটা বড়ই দৃষ্টিকটু ঠেকল সকল বড় বড় প্রবীণ সাহাবাদের নিকট। এমনকি খলিফার পদক্ষেপ বড়ই বিতর্কিত হয়ে উঠল। অনেকেই কঠিন সমালোচনা করতেও বিরত হলেন না। কেউ বললেন, খলিফাকে পদচ্যুত করা প্রয়োজন। কেউ বললেন, তাঁকেই মদীনা হতে বিতাড়িত করা হোক। এ হেন কঠিন সমালোচনার সুর কেন বেজে উঠেছিল খলিফার সম্বন্ধে, সেটা কি শুধু বাইতুল মালের অপচয় ও অপব্যয় তা নয়। পশ্চাতে ছিল গভীর রহস্য বিজড়িত কারণ। স্বয়ং মহানবী বিশেষ কয়েকজনকে গুরুতর অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করলেও মদীনা হতে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন আবিসারাহ ও হাকাম অন্যতম। খলিফা ওসমান মহানবীর জীবিতকালেই চেষ্টা করেন, বারবার দরবার করেন মহানবীর নিকট এঁদেরকে মদীনাতে ফিরিয়ে আনার জন্য। মহানবী সরাসরি নাকচ করে দেন ওসমানের ওসব আবেদন নিবেদনকে। অতঃপর হযরত ওসমান (রাঃ) আবুবকরের খেলাফতকালেও অনুরূপ চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। খলিফা ওমরকে বলতেই সাহস করেন না। অন্যের মাধ্যমে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু খুবই কড়া উত্তর পেয়েছিলেন। অতঃপর আপন খেলাফতকালে তাঁদেরকে কেবল মদীনাতেই সসম্মানে আনলেন না, ধনে মানে সম্মানে, পদে ও পদোন্নতিতে একেবারেই সবার শীর্ষে তুলে দিলেন এমনকি খলিফা হাকামের মৃত্যুর পর তাঁর সমাধিটিকে সুন্দর রূপে দেহের মত বড়ো গড়ে দিলেন। সাহাবাগণ উত্তর দিয়েছিলেন, যে ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পরও মহানবীকেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছিল, স্বয়ং তার সমাধিতে এরূপ সাজ না।

মক্কা বিজয়ের পূর্বদিন পর্যন্তও হাকাম স্বয়ং মহানবীকেও অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। এমনকি মক্কা বিজয়ের পরও তার মানসিকতার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। কয়লা ধুলে ময়লা যায় না। হাকাম ছিলেন ইসলামের জন্য সেই কুখ্যাত কয়লা। কত বড় পাপিষ্ঠ না হলে, মহানবী যখন রাস্তাতে আপন মনে চলতে থাকতেন, হাকাম তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতেন। এবং নবীজীর চলাকে নানা ভঙ্গিমায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে লোকজনকে দেখাতেন। কত বড় পাপী না হলে মক্কা বিজয়ের পরও 'নওমুসলিম' হবার পরও এরূপ করতো। এমনকি একদিন নবীজীর অনুমতি ছাড়াই তাঁর হুজরাতে বিনা সালামে প্রবেশ করলে, মহানবী মাত্রাতিরিক্তভাবে বিরক্ত হয়েই তাকে মদীনা ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। খলিফা ওসমান তঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করেই ঐ মহান নির্দেশেব খেলাফ করে সমগ্র সমাজে নিদারুণ সমালোচনার শিকার হন। সকলেই বলতে থাকলেন—খলিফা গোত্রপ্রীতিতে অন্ধ হয়ে ইসলামের সাধারণ নিয়ম-কানুনও ভুলে গেছেন। তাঁর গোত্রপ্রীতি তাঁকে নবী-প্রীতির ঊর্ধ্বে নিয়ে গেছে। এখানে খলিফা উত্তর দিয়েছিলেন—'নবীজী কোন সময় নির্দিষ্ট করে দেননি'। কিন্তু উত্তরটি কারোরই মনোপুত হয়নি। সবাই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাঁর নবী-প্রীতিকে ধিক্কার জানিয়ে।

কোরআনের অবমাননা :

কোন কোন সাহাবী খলিফার বিরুদ্ধে এ কথাও তুললেন যে খলিফা গায়ের জোরে কোরআনের অবমাননা করছেন। পবিত্র কোরআনে স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ আছে—মানুষ কোন পথে কেমন করে খরচ করবে। যাকাত কখন কাকে দেওয়া যাবে, সেকথা কোরআন বারবার উল্লেখ করেছে। গরিবকে সাহায্য করা, গোলামকে আযাদ করা, অনাথকে প্রতিপালন কবা, প্রতিপক্ষকে বক্ষা করা ইত্যাদি কোরআনেরই নির্দেশ। কোরআন কোথাও একবাবও বলেনি—ধনী আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য করে আরো ধনী বানাও এবং ধনকুবের করো। মানুষ আল্লাহর দেওয়া রহমত বা দৌলতকে কিভাবে বিলি বণ্টন করবে, কোরআন তার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে। সুতরাং যে সেই নির্দেশকে লঙ্ঘন করে সে সীমালঙ্ঘন করে। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না। দান-খয়রাত-যাকাত সম্পর্কে কোরআন—২ : ৩, ৪৩, ৮৩, ১১০, ১৭৭, ২১৫, ২৫৪, ২৬১-৬৪, ২৭০, ২৭৭, ৩ : ৯২, ৪ : ৭৭, ১১৪, ১৬২, ৫ : ৫৫, ৯ : ১১, ১৮, ৩৪, ৩৫, ৬০, ৭১, ৭৩, ৭৯, ১০৩, ২২ : ৪১, ২৩ : ৪, ২৪ : ৩৭, ৫৬, ২৭ : ৩, ৩০, : ৩৯, ৩১ : ৪, ৩৩ : ৩৩, ৪১ : ৭, ৫৮ : ১২, ১৩, ৭৩ : ২০, ৯৩ : ১০, ৯৮ : ৫, ১০৭ : ১-৭।

তীব্র সমালোচনা :

ইসলামি প্রশাসনে জনসাধারণ কিভাবে তাদের প্রশাসনকে গ্রহণ করবে, সে সম্পর্কে কোরআন একটি নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। "হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করো, তাহলে তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসুলের অনুগত হও এবং তোমাদের অন্তর্গত (নেতাগণের) যারা আদেশ দেয় (তাদের অনুগত হও), কোন বিষয়ে তোমাদের মতভেদ ঘটলে, আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের স্মরণ লও। এটাই তোমাদের জন্য মঙ্গলময় ও শ্রেষ্ঠ পরিণতি।" সূরা নিসা- -৪ : ৫৯। পবিত্র কোরআনের এই বাণীটিকে সামনে রেখে প্রথম প্রথম বহু সাহাবা খলিফার কোনরূপ সমালোচনা না করে নীরবতা পালন করতেন। তাঁরা মনে করতেন—খলিফাকে গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তিনি সেই গুরুদায়িত্বের জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করবেন। যদি অন্যায় কিছু করেন এবং জনসাধারণ তা সহ্য করার জন্য আল্লাহর নিকট সওয়াব পাবেন। এই দৃষ্টকোণ থেকে বহুদিন পর্যন্ত বহু সাহাবা খলিফার কোন কাজেব জবাব দিতেন না সওয়াবের আশায়।

কিন্তু মাত্রা যখন ছাড়িয়ে গেল, সহ্যের বাঁধ যখন ভেঙে গেল, ধৈর্যের গিরি যখন পতিত হল, জনগণের অনুতাপে অনুশোচনায় সাগর যখন শুকিয়ে গেল, তখন মনের বিদ্রোহ মানুষের মাঝে প্রকাশ্য রূপ পেল। তাঁরা যেন বুঝতে পারলেন- খলিফার স্বেচ্ছাচারিতা সীমালঙ্ঘন করেছে। তখন বেশ কিছু প্রবীণ সাহাবা মুখ খুললেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন- মহান আবুযার গিফারী, হযরত আম্মার বিন-ইয়াসার, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ প্রমুখ ব্যক্তিগণ। বহু সাহাবা এই প্রসঙ্গে আক্ষেপ করে বলেছিলেন খলিফা যদি বাইতুলমালের তামাম সম্পদ গরিব জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন, তাহলে তাদের কিছুই বলার ছিল না। কিন্তু তিনি দিলেন শুধু কোরেশদের, তাও আবার বেছে বেছে আপন জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে, যারা ছিল ইসলামের ঘোর শত্রু। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক তাবারী বলেন "হযরত ওমর কোরেশদের প্রতি যে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পেরেছিলেন, খলিফা ওসমান তা পারেন নি। ফলে সরকার কর্তৃক অনুগৃহীত ব্যক্তিগণ বহু সম্পত্তি ক্রয় করে এক একজন এক একটি বিরাট ভূ স্বামীতে পরিণত হন। এবং ঐগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের কারণ দেখিয়ে মদীনার বাইরে ছড়িয়ে পড়েন এবং এক

একটি রাজা মহারাজায় পরিণত হন। যার ফলে রাষ্ট্রের সংহতি বিনষ্ট হয়।'' এই সম্পর্কে হযরত ওমর বলেন---''কোরেশগণ চায়, আল্লাহর সম্পদ গরিব মানুষ ছাড়াই অন্যদের বিতরণ করা হোক, কিন্তু ওমরের শরীরে প্রাণ থাকতে তা হবে না। আমি মক্কার পাহাড় হেরার কোলে কোরেশদের ঘাড় ও কোমর ধরে দাঁড়িয়ে থাকবো, তবুও তাদের আমি আগুনে ঝাঁপ দিতে দেবো না।'' সুতরাং এই সমস্ত কথা মদীনাবাসীদের অজানা ছিল না। অধিকাংশ মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন। কিন্তু কেউই সীমালঙ্ঘন করলেন না। খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন না। তবে বিপ্লবী সুরে কথা বলতে ও সমস্বরে সমালোচনা করতেও ছাড়লেন না।

সমালোচনার তীব্র সুর খলিফার দরবার হতে আরবের আকাশে বাতাসে সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো। মুষ্টিমেয় কতকগুলো কুক্ষিগত লোক মৌচাকটিকে ঘিরে মধুপান করতে থাকলো। তারা একবারও বুঝতে চেষ্টা করল না যে এটা ইসলামের পবিত্র খেলাফত, খলিফার পবিত্র আমানত, জনসাধারণের সম্পদ, বিশেষ করে গরিবের দুঃস্থজনের হক, অসহায় মানুষের আশ্রয়। চির স্বভাব সুন্দর বয়স্ক খলিফাকে তারা চরম ভাবেই বিপথগামী করলো। সমালোচনার তীব্র সুর দুটি গরির খাতে প্রবল বেগে প্রভাবিত হয়েছিল সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী বেগবান ধারার ন্যায়। প্রথম খাতটি ছিল—কেন খলিফা বাইতুল মালের গরিবের হককে ধনীর মধ্যে বিতরণ করেছেন? দ্বিতীয়টি ছিল—কেন খলিফা ইসলামের দুর্দিনের বন্ধুদের অবহেলা করে মক্কা বিজয়ের পর নওমুসলিম আপন জনদের এত প্রশ্রয় দিচ্ছেন। জবাব দিন।

কঠোর সমালোচকঃ

খলিফা ওসমানের কাজে যাঁরা কঠোরভাবে সমালোচনা করেছিলেন তাঁরা তিনজন অন্যতম—১। হযরত আবুযার গিফারী, ২। হযরত আম্মার বিন ইয়াসার, ৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ। আমরা প্রথম ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু আলোচনা পূর্বেই করেছি।

তিনজন মহান বিপ্লবী

মহান বিপ্লবী হযরত আবুযার গিফারী :

মহানবীর পূর্বে আরব জাহান নানা আবিলতায় ডুবে গিয়েছিল। ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল। মানুষে পশুতে কোন পার্থক্য ছিল না। বরং পশুরা আপন শিশুকে হত্যা করতো না, মানুষ তাও করত। পাপাচারের কোন সীমা ছিল না। ঐ যুগেও দেশে সামান্য কয়েকজন ছিলেন যাঁরা আরবের ঐ জীবনধারা পছন্দ করতেন না। তাঁদের সাধারণত 'হানিফ' বা সৎনিষ্ঠ বলা হত। কেনান গোত্রের মহান আবুযার গিফারী ছিলেন সেই হানিফ বা নিষ্ঠাবান পুরুষ। জন্ম যাঁর অন্ধকার যুগে, মৃত্যু তাঁর আলোতে, জন্ম যাঁর পথের সন্ধানে, মৃত্যু তাঁর সঠিক পথে। শুধু ইসলামের ইতিহাসে নয়, সমগ্র মানব-ইতিহাসেই মহান গিফারীর মত মানুষ সত্যিই বিরল। তিনি বিদ্রোহী ছিলেন না, আদর্শ বিপ্লবী ছিলেন। স্বয়ং মহানবী বলেন—"দুনিয়াতে আবুযার অপেক্ষা সাচ্চা ব্যক্তি আর দেখিনি।"

ইসলামের প্রথম যুগেই তিনি মহানবীর স্নেহধন্য হন। মহানবী হিজরত করলে তিনিও তাঁর সাহচর্য লাভে ধন্য হন। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালেও তাঁকে আমরা মদীনাতেই দেখতে পাই। তাঁকে আমরা দ্বীন্‌দার মুসলমান হিসাবে যতখানি দেখি, সমরে শত্রুর সঙ্গে যতখানি দেখি, তা অপেক্ষাও সমধিকভাবে দেখি—সামাজিক ন্যায় অন্যায়ের আন্দোলনে, অর্থনৈতিক আন্দোলনে, দরিদ্র ও গরিব মানুষের বন্ধু হিসাবে, অসৎ ও জালেম ধনী শ্রেণীর কঠোর সমালোচক হিসাবে। খলিফা ওসমান যখন ঘরে বাইরে দুই উপদেষ্টার (মারওয়ান ও মুয়াবিয়া) পাল্লায় পড়ে ভূমি সংস্কার ইসলামের মূলনীতি হতে সরে পড়লেন, তখন যে কয়েকজন স্থিত-প্রজ্ঞা খলিফার মুখের উপর কঠোর সমালোচনা করেছিলেন, চির ধীমান আবুযার তাঁদের অন্যতম। সাক্ষাতে অসাক্ষাতে, প্রকাশ্যে সভা-সমিতিতে তিনি খলিফাকে কথার বাণে ক্ষতবিক্ষত করে তুলতেন। খলিফার বিরুদ্ধে এই সময় যত সমালোচনা হয়েছিল, যত বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হয়েছিল, যত সতর্ক ও সাবধানী উচ্চারিত হয়েছিল, যত অপমানসূচক লাঞ্ছনার তীর নিক্ষেপ করা হয়েছিল—এই সমস্ত আন্দোলনের অগ্রদূত ছিলেন মহান গিফারী। খলিফার দরবারে যখনই যেটাকে তিনি অসঙ্গত ও আপত্তিজনক বলে মনে করেছেন যখনই যেটাকে তিনি দেশ ও দশের জন্য অকল্যাণকর বলে মনে করেছেন, যখনই যেটাকে তিনি গরিব জনসাধারণের জন্য প্রতিকূল বলে মনে করেছেন। যখনই যেটাকে তিনি

মহানবীর আদর্শচ্যুত বলে মনে করেছেন, তখনই ব্যাঘ্রবিক্রমে উত্তর দিয়েছেন, সিংহবিক্রমে গর্জিয়ে উঠেছেন। মহান আবুযার ছিলেন—ইসলামের স্বার্থশূন্য, ভয়শূন্য, লোভশূন্য বিরল মুজাহিদ। 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ তথা শির'।

আদর্শ বিপ্লবী :

একদিন মহান গিফারী খলিফা ওসমানের নিকট বসেছিলেন, ঐ সময় এক ইহুদী কবি আব্দুল্লাহ্ সেখানে উপস্থিত হলেন। খলিফাকে আব্দুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করলেন—তিনি কি বাইতুল মাল হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন? খলিফা উত্তর দিলেন—এতে অন্যায়ের কিছু দেখি না। মহান গিফারী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে অন্যমত পোষণ ও প্রকাশ করলেন। এতে ইহুদী কবি আবুযারকে অপমানসূচক কথা বললে আবুযার রাগান্বিত হয়ে তাকে মুখের উপর সমুচিত জবাব দিলেন—"হে ইহুদী বাচ্চা, তুমি আমাকে দ্বীন শিক্ষা দেবে?" অতঃপর খলিফা ইহুদী কবির কথায় প্রভাবান্বিত হয়ে ও মারওয়ানের পাল্লায় পড়ে মহান গিফারীকে সিরিয়ায় নির্বাসন দণ্ড দিলেন। মহান গিফারী কোনদিনই খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাঁকে বিব্রত করেন নি। তবে অকুণ্ঠ চিত্তে অন্যায়ের বিরোধিতা করে গেছেন। বিনাবাক্যে নির্বাসন দণ্ড মেনে নিলেন।

কথায় বলে স্বর্ণখনি যে দেশেই থাক, সে স্বর্ণেরই জন্ম দেয়। আবার ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। মহান আবুযার সিরিয়াতে যাওয়া মাত্রই গরিবদের অবস্থা অবলোকন করে প্রতিবাদ আরম্ভ করলেন। মুয়াবিয়া ছিলেন সেখানকার গভর্নর বা আমির। তিনি তাঁর বসবাসের জন্য বহু ব্যয়ে তৈরি করেছিলেন এক চোখ ধাঁধান রাজপ্রাসাদ, যার নাম খিজ্রা মহল—অর্থাৎ সবুজ প্রাসাদ। আবুযার সারা সিরিয়াতে আপত্তি তুললেন—গরিব জনসাধারণের এ হেন দুঃখ-কষ্ট না দেখে, না লাঘব করে ঐ অবাঞ্ছিত প্রাসাদ কেন? তখন অগ্নিশর্মা আমির মুয়াবিয়া মহান গিফারীকে দরবারে ডাক দিলেন—কৈফিয়ত তলব করে। ক্রুদ্ধ আমির মুয়াবিয়া বসে আছেন। তিনি যতটা রাগান্বিত, তাঁর পারিষদবর্গ তা অপেক্ষাও ক্রোধান্বিত। তাঁরা সকলেই আশা করছেন—খলিফা যাঁকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছেন, মহামান্য আমির তাঁকে প্রাণদণ্ড দিয়ে জীবনের মত খেল খতম করে দেবেন। দরবার ভর্তি। সকলেই ভয় করছেন—মহান গিফারীকে আর আমরা দেখতে পাবো না। গরিবের বন্ধু গিফারী আজ চিরবিদায় নেবেন।

মহান গিফারী, গরিবের মহান বন্ধু দাঁড়ালেন ও বললেন : "আমরা সকলেই আল্লাহর রায় ও নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য। এই ব্যয়বহুল রাজপ্রাসাদ যদি সরকারি অর্থে তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে তা হবে সরকারি তহবিলের 'অপচয়',

এবং যদি এটা আমিরেব আপন পয়সায় প্রস্তুত হয়ে থাকে, তাহলে ওটা হবে আপন অর্থের 'অপব্যয'। পবিত্র কোরআন 'অপচয় ও অপব্যয' দুটোকেই হাবাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা কবেছে।'' কোবআন– ৪ : ৩৭, ৬ : ১৪১, ৭ : ৩১, ১৭ : ২৭, ২৯, ১০৭ : ১-৭। অতঃপর মহান গিফাবী ঝড়ের বেগে পবিত্র কোরআনের ঐ অংশগুলো পড়ে দববার কাঁপিয়ে তুললেন। অগণিত মানুষের সম্মুখে অপ্রস্তুত অসৎ আমির মুয়াবিয়া, অপ্রস্তুত তাঁর অসৎ পারিষদবর্গ। সঙ্গে সঙ্গে আমির খলিফাকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি যেন অতি সত্বর সিরিযাকে এই আসন্ন মহা বিপদ হতে রক্ষা করেন। নচেৎ এই এক আন্দোলনেই তাঁর অতি সাধের মহা সৌধ সমাধিস্থ লাভ করবে। খলিফা আমিরকে নির্দেশ দিলেন—আবুযাবকে আবাব মদীনায় পাঠিয়ে দিতে। আমির মুয়াবিয়া হাঁফ ছেড়ে বাঁচালেন। তিনি তাঁকে বিলক্ষণ বন্দী অবস্থায় পাঠিয়ে দিলেন।

মহান আবুযাব আবার মদীনাতে আনীত হলেন। আসামাত্রই আপন জন্মগত জীবনে ও আপন স্বভাবগত সোপানে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি একদিন লক্ষ্য করলেন খলিফা বাইতুলমাল হতে মন্ত্রী মারওয়ানকে প্রচুর অর্থ দিচ্ছেন। এবং মারওয়ানের ভাই হারিস বিন হাকামকে তিন লক্ষ ও যায়েদ বিন সাবেতকে এক লক্ষ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) বিতরণ করছেন। তখন তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন—''ধন সঞ্চয়কারীদের আগুনের সুসংবাদ দাও।'' এবং কোরআন থেকেও কিছু কিছু পাঠ করে শুনালেন। কোরআন—৩৪ : ৩৭, ৩৯ : ৪৯, ৬৩ : ৯, ৬৯ : ২৮, ৭১ : ২১, ৯২ : ১১, ১০০ : ৮, ১০২ : ১, ১০৪ : ২-৫, ১১১ : ২। মন্ত্রী মারওয়ান মহান গিফারীর এই সমস্ত কথাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে খলিফাকে তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করলেন। এবার খলিফা তাঁর এক প্রতিনিধিকে মহান গিফারীর নিকট পাঠিয়ে তাঁকে ঐ সমস্ত কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন। মহান আবুযার জনগণেব সামনে ঐ প্রতিনিধিকে বলেন—''আল্লাহর কোরআন পাঠ করতে এবং আল্লাহর হুকুমের অবমাননাকারীদের প্রতিবাদ করতে খলিফা ওসমান আমাকে নিষেধ করছেন। হে রাজ-প্রতিনিধি, আপনি খলিফাকে বলবেন—'খলিফাকে সন্তুষ্ট করা অপেক্ষা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করাই আমার অধিক প্রিয় কাজ। হে রাজ-প্রতিনিধি, আপনি খলিফাকে বলবেন, কোরআন আমাকে শিখিয়েছে—অন্যায় করো না এবং অন্যায় সহ্যও করো না।'' কোবআন—২ : ৪, ১১, ৮৪, ২৭৯, ৩ : ৮৬, ৭ : ১৫০, ১১ : ১৮, ১৩ : ৩৪, ১৬ : ১২৬, ৪২ : ৩৯।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।—রবীন্দ্রনাথ

মহান গিফারী সমাজে কতকগুলো কাজকে অন্যায়, অসঙ্গত ও আপত্তিজনক বলে মনে করেছিলেন, যেমন—বাইতুলমালের অপচয় ও অপব্যবহার, শাসন কার্যে স্বজন-পোষণ ও প্রবীণদের অবমাননা। ঐ নবীনদের আহ্বান, যাঁরা ছিলেন 'অগত্যা মুসলিম' দলভুক্ত, ঐ কোরেশদের বহাল, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বদিনও ছিল ইসলামের প্রবলতম শত্রু, বিশেষ করে গরিবের প্রতিকূলে ও ধনীর অনুকূলে জমিদার ও জায়গীরদার প্রথার প্রবর্তন, বিশেষ করে ধড়িবাজ মারওয়ান ও ধান্দাবাজ মুয়াবিয়ার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণার কোন অবধি ছিল না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি খলিফার শাসনতন্ত্রকে ও খলিফাকে রেহাই দিতেন না, কখনও ছেড়ে কথা বলতেন না। তাঁর অনেক ভাষণে, জ্বালাময়ী বক্তৃতায়, কখনও বীরের বাগ্মিতায় খলিফাকে অহরহ ক্ষতবিক্ষত করে তুলতেন। তিনি বলতেন—'ধন সঞ্চয়কারীদের আগুনের সুসংবাদ দাও, যাদের ললাটদেশে, পেটে ও পৃষ্ঠে জ্বলন্ত অগ্নির ছেঁকা দেওয়া হবে।' এইভাবে ইনসাফ ও ঈমানের অমিত বীর মহান আবুযার খলিফার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়ে আসামীর বেশে তাঁকে জনগণের কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন। এবার ঐ দুই ধূর্ত-ধড়িবাজ ও ধান্দাবাজ মন্ত্রী মারওয়ান ও আমির মুয়াবিয়ার সাধু পরামর্শ মত জ্ঞানান্ধ খলিফা এক ক্ষণজন্মা পুরুষ, এক মহান আদর্শ বিপ্লবী, গরিবের এক চিরদরদী বন্ধু মহান আবুযার গিফারীকে জীবনের মত শেষ করে দিতে মরুময় রাবযাহ্ নামক মরুভূমির এক অস্বাস্থ্যকর মরুপ্রান্তরে চির নির্বাসন দিলেন। মহান বীর, মহান বিপ্লবী, মহান চিন্তানায়ক সর্বযুগের সর্বহারাদের একান্ত আপন জন, প্রাণের বন্ধু, মহানবীর অতীব স্নেহধন্য হযরত আবুযার গিফারী বিনা ক্লেশে বিনা কথাতে বিপ্লবের আদর্শকে অক্ষুন্ন ও অক্ষত রেখে মহান সক্রেটিসের ন্যায় খলিফার রাজ-নির্দেশকে মাথা পেতে মেনে নিয়ে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে এবং স্বজ্ঞাতে মহাজীবনের বধ্যভূমি 'রাবযাহ্' গমন করলেন। ধুরন্ধরদের শয়তানী ইচ্ছা ও ইবলিসী আশা পূর্ণ হলো, গরিবের মহান দরদী বন্ধু বিগত হলেন, এক মহান আদর্শ বিপ্লবীর জীবন-দীপ নিভে গেল। আরব হারাল এক দুর্গত মানুষের সেবায় নিবেদিত মহামানবকে, চিরধন্য হলো মরুময় মরুভূমি রাবযাহ তাঁকে বুকে ধারণ করে।

দিনের পর দিন আবুযার গিফারীর বক্তৃতা ও খলিফার নীতির বিরোধিতা জনগণের মধ্যে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করল। বহু নিস্তেজ নিষ্প্রাণ সমালোচক শাণিত হয়ে উঠল। বহু গরিব-দরিদ্র মানুষ দলে দলে বিপ্লবমুখী হতে থাকল। এরই মধ্যে মহান গিফারীর হলো মরুভূমিতে নির্বাসন এবং

সেই কুখ্যাত ষড়যন্ত্রমূলক নির্বাসনেই হলো মহান জীবনের করুণতম জীবনাবসান। এই ভীষণ দুঃসংবাদ নিপীড়িত অধঃপতিত অবহেলিত দরিদ্র মানুষের মাঝে প্রচার হওয়া মাত্রই সমগ্র দেশ যেন শিহরিয়ে উঠলো, জনগণ জনরোষে ফেটে পড়ল। মৃত মহান গিফারী আজ জীবন্ত গিফারী অপেক্ষা লক্ষ গিফারীর শক্তি সঞ্চয় করে শুধু আরবের আকাশ-বাতাস নয়, মহান আল্লাহর পবিত্র আরশকেও যেন প্রকম্পিত করে তুলল, অসংখ্য মানুষের আলোড়নে আন্দোলনে আর্তনাদে আহজারীতে আরবের নিষ্প্রাণ মাটি পর্যন্ত কেঁদে উঠল। বৃদ্ধ ও স্থবির খলিফা মন্ত্রীর বশে ও বেহুঁসে মহান গিফারীকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিলেন। কিন্তু আশু একদিন জনরোষ স্বয়ং খলিফাকেই দিলে জীবনের মত নির্বাসন ও জন্মের মত বিদায়, একেবারেই এপার হতে ওপারে। ''আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?'' কোরআন— ১০ : ১০৯, ১১ : ৪৫, ৯৫ : ৮। এরই নাম আল্লাহর অভিশাপ।

মহান আবুযার গিফারীর মৃত্যু সংবাদ আসার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধী খলিফাও আপন ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনায় ও অন্তরবেদনায় অধীর হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর বিধবা স্ত্রীকে 'রাবযাহ' হতে আপন পরিবারে আনয়ন করে যথাযথ সম্মানে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না। যোগ্য স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী মুখের উপর জবাব দিয়েছিলেন।

মহান গিফারী আদর্শ বিপ্লবী ছিলেন, কিন্তু কোনদিনই উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহী ছিলেন না। খলিফার প্রতি আনুগত্যের সীমায় দাঁড়িয়ে অন্যায়ের তীব্র বিরোধিতা করতেন, কিন্তু কোথাও কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতেন না। মহান বিপ্লবীর ন্যায় বক্তৃতা করতেন। কিন্তু কখনও বিদ্রোহের প্ররোচনা দিতেন না। জনগণকে অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে বলতেন, কিন্তু কাউকে উত্তেজিত করতেন না। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা কামনা ছিল না, কোন গোপন কুমতলব দ্বারা তাঁর মস্তিষ্ক পরিচালিত হতো না। তিনি এই সংসারে সংগ্রামমুখী নির্ভেজাল সংগ্রামী মানুষ ছিলেন, কোন সিংহাসন, কোন দরবার, সম্পদ ও সম্মান পাওয়ার জন্য নয়। তাঁর সংগ্রাম ছিল সর্বহারাদেব এবং সংশোধনমুখী। তিনি জনগণকে শাসনকর্তার প্রতি আনুগত্যের উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন, 'খলিফা আমাকে যে কোন প্রকারের কঠোর শাস্তি দিলে, আমি বিনা বাক্যে মেনে নেবো।' মহান আবুযার গিফারী বিপ্লব ও বিদ্রোহের মধ্যে এক অপূর্ব সুন্দর সীমারেখা টানতে পেরেছিলেন। তিনি বলতেন—বিপ্লবের উদ্দেশ্য কখনও যেন বিদ্রোহ না হয়। বিপ্লবের উদ্দেশ্য অসৎকে সৎ করা, অন্যায়কে ন্যায় করা, অসুন্দরকে সুন্দর করা, বিশৃঙ্খলকে শৃঙ্খল করা। কিন্তু বিদ্রোহ অধিকাংশ সময়ই বিবেকের বোধ হারিয়ে ফেলে।

শৃঙ্খলার বাঁধ ভেঙে ফেলে, অত্যাচার রুখতে অন্যায়ের জন্ম দেয়, অনাচারকে প্রশ্রয় দেয়। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত নবী ও রসূল এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন—এক একজন মহান বিপ্লবী। কিন্তু কেউই বিদ্রোহী ছিলেন না।

পরকালে পুণ্যলোকে বিশ্বস্রষ্টার মহানবী
বিশ্ব-সমাজ সংস্কারের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী।
এই জগতের অন্ধকারে সন্ধিবিহীন সংগ্রামে
জ্বালিয়ে দিলে আলোর শিখা বিশ্বস্রষ্টার পুণ্যনামে।
পরকালের পাথেয় দিলে পুণ্যশ্লোক মহানবী
ইহকালের বিধান দিলে বিশ্ব-সমাজ বিপ্লবী।

চরিত্রে গিফারী :

হযরত আবুযার গিফারী শরীরের দিক থেকে পাতলা ও লম্বা গোছের মানুষ ছিলেন। চক্ষু ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল, নাক ছিল খাড়া, ললাট প্রশস্ত, মাথা কিঞ্চিৎ মোটা, হাত প্রলম্বিত, হাঁটতেন দ্রুত। অতি অল্পে খুশি থাকতেন। আল্লাহর ইবাদতে আপনাকে ভুলে যেতেন। সংসারী অথচ সংসারধর্মে অনাসক্ত সিদ্ধ পুরুষ গিফারী গভীর ধ্যানে রাত্রির পর রাত্রি কাটিয়ে দিতেন। এককথায় মহানবীর যে কয়েকজন অতি উচ্চাঙ্গের সাহাবা ছিলেন, আবুযার গিফারী তাঁদের অন্যতম। মহানবী বলেন—"একটি মানুষকে সর্বাপেক্ষা বেশি জানে তার স্ত্রী ও নিকটতম ব্যক্তি। এই দিক থেকে আবুযারের স্ত্রী বলেন—"তিনি মহানবীর অতি উত্তর উম্মত, অতি উত্তম মানুষ।"

তাবুক অভিযানে মহানবী সকলকে আহ্বান জানালেন—সব রকমের সাহায্য দিয়ে তাঁর সঙ্গী হতে। সকলেই আন্তরিক সাড়া দিলেন। গরিব আবুযার গিফারীর একটি কৃশকায় উট ব্যতীত কিছুই নাই। তিনি তাই নিয়েই তাবুক অভিযানে যোগদান করলেন। দলের মধ্যে দুটি কারণে পিছিয়ে পড়লেন। পথিমধ্যে নামাযে ধ্যানস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অধিকন্তু দুর্বল উট দ্রুত চলতে পারতো না। তখন দলের অনেকে বলাবলি করতে থাকলো, আবুযার পিছন হতে কেটে পড়েছেন। মহানবীর কানে এই কথা পৌঁছালে তিনি বলেন—'আবুযারকে আমি চিনি।' কিছুক্ষণের মধ্যেই আবুযার তাঁর দুর্বল চলচ্ছক্তি রহিত উটটিকে পথিমধ্যে ত্যাগ করেই মাথাতে বোঝাসহ অতিকষ্টে মহানবীর সাথে মিলিত হলেন। মহানবী তাঁকে দোয়া করলেন। কেবলমাত্র ইসলামের ইতিহাসে নয়, সারা পৃথিবীর ইতিহাসে নির্যাতিত মানুষের জন্য এরূপ নিঃস্বার্থ আদর্শ বিপ্লবী চিররিরল। তাঁর ইতিহাস নিখিল বিশ্বের নির্যাতিত মানুষেরই ইতিহাস।

মহান বিপ্লবী আম্মার ইবনে ইয়াসার :

হযরত আম্মার ছিলেন—মাখ্‌জুম গোত্রের মানুষ। গোত্রটি ছিল সংখ্যাতে বড় কিন্তু দীনদরিদ্র। তাঁর নামের সাথে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য জড়িয়ে আছে। তিনি ছিলেন অগ্নিযুগের মুসলমান। তিনি যখন মুসলমান হন তখন মুসলমানের সংখ্যা হলো তাঁকে নিয়ে সবেমাত্র একত্রিশ। ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার জন্য বহুজনকে বহু অত্যাচার-অবিচার-নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিলো। এই অমানুষিক অত্যাচারের অধ্যায়ে যে দুজনের নাম ইসলামের ইতিহাসে চিরঅমরত্ব লাভ করেছে, তাঁরা হযরত বেলাল ও হযরত আম্মার। এই দুই জীবন্ত মুজাহিদকে মহানবী অত্যাধিক স্নেহ করতেন। আম্মারের প্রতি অত্যাচার ইসলামের ইতিহাসে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর আম্মারকে শুইয়ে দেওয়া হত, অতঃপর বুকে ভারী পাথর চাপিয়ে দেওয়া হত। এই নির্মম লোমহর্ষক অত্যাচার দিনের পর দিন চলত। অপরাধ ছিল একটিই, তিনি বলেছিলেন—"আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়।" পরে আবিসিনিয়ায় হিজরত। অতঃপর মদীনা গমন। মহানবীর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছায়ারূপে সর্বদা তাঁর পাশে বা পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এমন কোন জেহাদ ছিল না, যেখানে হযরত আম্মার ছিলেন না। ভণ্ডনবী মুসাইলামার বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব গৌরবের শীর্ষে পৌঁছায়। তখন খলিফা আবুকবরের যুগ। খলিফা ওমর তাঁকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন।

খলিফা ওসমানের বিরুদ্ধে তাঁর বহু অভিযোগ ছিল। বিশেষ করে হাকাম-জনিত অভিযোগ আম্মারকে খলিফার বিরুদ্ধে অগ্নিবৎ করে তুলেছিল। কেননা এখানে মহানবীর সিদ্ধান্তে আঘাত পড়েছিল। দ্বিতীয় একবার কথা উঠল—খলিফা বাইতুলমালের মণিমুক্তাগুলো নিজ পরিবার ও আত্মীয় পরিবারের মেয়েদের মধ্যে বিলি করে দিয়েছেন। এই নিয়ে আলীর সাথে খলিফার বাদানুবাদ আবম্ভ হলে আম্মার তাতে যোগদান করলে খলিফা আম্মারকে তিরস্কার করেন। এবং তাঁকে ভীষণভাবে প্রহার করেন। সকলে মিলে অজ্ঞান আম্মারকে মহানবীর স্ত্রী উম্মে সালমার গৃহে নিয়ে গেলেন। হযরত আয়েশা এই ঘটনাব তীব্র নিন্দা করেন। আম্মার বলেছিলেন—"একদিন ইসলামের দুশমনগণ আমাকে এইভাবে প্রহার করেছিল, আজ ইসলামের খলিফা আমাকে তেমনিভাবেই প্রহার করলেন ; হে আল্লাহ ! সেদিনেব দুশমন ও আজকের খলিফার মধ্যে আমি কোন পার্থক্যই দেখছি না।" সুতবাং আম্মারের চোখে খলিফা ছিলেন ইসলামের দুশমন।

অতঃপর হযরত আবুযার গিফারীর নির্বাসন দণ্ডের বিরুদ্ধে হযরত আম্মার

মুখ খুললেন। ঘোর প্রতিবাদ করলেন। তখন খলিফা অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে মন্ত্রী মারওয়ানের পরামর্শমত হযবত আম্মারকেও রাবযাহতে নির্বাসনের নির্দেশ দিলেন। এবার হযরত আলী মুখ খুললেন। খলিফাকে সাবধানবাণী শুনিয়ে বললেন—এর অশুভ পরিণতি আপনাকেই ভোগ করতে হবে। খলিফা হযরত আলীকেও শাঁসিয়ে বললেন—"আপনাকেও ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।" হযরত আলী উত্তর দিলেন—"সেই আদেশটাই একবার করুন। অতঃপর লক্ষ্য করবেন—আদেশকারীর পরিণতি"। ভীরু খলিফা ঘাবড়ে গিয়ে চুপ হলেন। এমনকি আম্মারকেও তাঁর বিরাট গোষ্ঠীর ভয়ে বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার করলেন। খলিফার সর্বগ্রাসী স্বজন-পোষণ নীতিতে, অন্যায়ভাবে পদ ও অর্থ বিলি-বণ্টনে হযরত আম্মার বিন ইয়াসার আমৃত্যুকাল মহান বিপ্লবীর পথ বেছে নিয়েছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই সক্রেটিসের ন্যায় ছিলেন মহান বিপ্লবী।

মহান বিপ্লবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ :

মহানবী বলতেন—"তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কোরআন শিক্ষা করতে চাও, সে যেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিকট যায়।" মহানবী কোরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য চারজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ছিলেন তাঁদের প্রথম ও অন্যতম। এই ঘটনা হতে আমরা বুঝতে পারছি, সেই যুগে আব্দুল্লাহর সম্মান কত উচ্চে বিরাজ করত। তাঁর দ্বিতীয় পরিচয় ছিল—তিনি মহানবীর খাস খাদিমের মত ছিলেন। মহানবীর জামা-কাপড় বিছানা-জুতা ইত্যাদিব যাবতীয় দেখাশুনা তিনি করতেন। পরিস্থিতি এমনি দাঁড়িয়েছিল যে, সাধারণ মানুষ ভাবত তিনি মহানবীর পরিবারভুক্ত মানুষ। আমরা এই দুটো ঘটনা হতেই বুঝতে পারছি যে, আব্দুল্লাহর স্থান স্বয়ং মহানবীর নিকট কত উচ্চে ছিল, এক ইসলাম ধর্মের দিক থেকে, অন্য মহানবীর ব্যক্তিজীবনের দিক হতে। মহানবী কিছু মানুষকে তাদের আচরণের জন্য মদীনা হতেই তাড়িয়ে দিতেন। আবার কিছু মানুষকে তাদের আচরণের জন্য আপন পরিবারভুক্ত করে ফেলতেন। তাঁরা চিরধন্য হতেন। এই দুই শ্রেণীর দ্বিতীয় শ্রেণীটিতে আব্দুল্লাহর স্থান এবং প্রথম শ্রেণীটিতে হাকামের স্থান।

হযরত ওমরের খেলাফতে তিনি কুফার কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। গভর্নর সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের সাথে টক্কর বাধল অর্থঘটিত ব্যাপারে। সা'দেব চাকরি গেল। পরবর্তী গভর্ণর ওলিদের সাথে বাধল একই কলহ। এবাব খলিফা ওসমানের কোপে আব্দুল্লাহর চাকরি গেল। তবে আব্দুল্লাহ বাইতুল মালেব আমানতেব খিয়ানত সহ্য করতে না পেরেই স্বেচ্ছায় পদত্যাগ

করেছিলেন। সত্যতার মূল্য দিলেন খলিফা অসৎ কাজে।

আব্দুল্লাহ একদিন মসজিদ-ই-নববীতে প্রবেশ করছেন, তখন খলিফা ওসমান মিম্বরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন। খলিফা আব্দুল্লাহকে দেখামাত্রই বলে উঠলেন—"ঐ দেখ নষ্টের কীট আসছে।" আব্দুল্লাহ্ উত্তর দিলেন—"আমি তা নই। আমি বদর যুদ্ধে মহানবীর সঙ্গী।" হযরত আয়েশা খলিফার ঐরূপ মন্তব্য শুনে খলিফাকে বললেন—"আপনি কাকে কি বলছেন, সেটা কি জানেন না।" বিবি আয়েশা খলিফাকে ধিক্কার জানালেন। তবুও খলিফার কথামত আব্দুল্লাহকে জোর করে মসজিদ হতে বের করে দেওয়া হলো। এই সময় কতকগুলো মানুষ জোরে ঠেললে আব্দুল্লাহ্ পড়ে যান এবং তাঁর পেছনের হাড় ভেঙে যায়। তখন হযরত আলী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি খলিফার এই নিন্দনীয় কাজের জোর প্রতিবাদ করলেন। খলিফা উত্তর দিলেন, "আব্দুল্লাহ আমার হত্যাকে হালাল বলে ঘোষণা করেছেন। আমি জোবাইদ্ ইবনে ফাসীরের নিকট হতে জানতে পেরেছি।" হযরত আলী উত্তর দিলেন—"জোবাইদ মোটেই নির্ভরযোগ্য মানুষ নয়।" অতঃপর হযরত আলী তাঁকে তাঁর গৃহে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। সকলেই খলিফাকে অভিশাপ ধিক্কার জানালেন—আহত ব্যক্তিটিকে তাঁর বাসায় পাঠাবার ব্যবস্থা না করার জন্য। আব্দুল্লাহ্ তবু বলে গেলেন—"খলিফার জন্যও এরূপ একটি দিন অপেক্ষা করছে।"

পাপ ও পুণ্যের লীলা দেখ সব ঘেরি
সবেরে সময় দিয়ে কর কিছু দেরি।

অতঃপর খলিফা তাঁর ভাতাও বন্ধ করে দেন। তখন তিনি মদীনার বাইবে যাওয়ার জন্য খলিফার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন নাটেব গুরু মন্ত্রী মাবওয়ান খলিফাকে আর একটি 'সাধু' উপদেশ দিলেন। "আব্দুল্লাহকে মদীনাব বাইবে পাঠাবেন না। তিনি অসাধারণ বাগ্মী। আপনার বিরুদ্ধে দিবারাত্রি জনগণেব মধ্যে জোরালো বক্তৃতা করে আপনার সুনাম ও সুখ্যাতি নষ্ট কবে দেবে। আপনি আব্দুল্লাহকে মদীনাতেই নজরবন্দী করে রাখুন।" কথাটি অতি দ্রুত দুর্বল খলিফার মনঃপুত হল। তিনি তাঁর ফরমান বলে তাই কবলেন। আব্দুল্লাহ বিনা পাপে, বিনা অপরাধে আমৃত্যুকাল তিন বছর টানা মদীনাতে নজববন্দী থাকলেন। তবে চিরবিপ্লবী আব্দুল্লাহ মদীনাতে একটি দিন বা একটি রাতও অলসভাবে কাটান নি। তিনি একদিকে ছিলেন পবিত্র কোবআনেব ক্ষুবধাব পণ্ডিত, আবার অন্যদিকে ছিলেন অনন্যসাধারণ বাগ্মী। এবং এই দুযেব মাঝে ছিল তাঁব বিপ্লবী মন ও বীবেব প্রাণ। এতগুলো অসাধাবণ গুণেব সমাবেশ

ঘটেছিল আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের জীবনে। এই বিপ্লবীকে তাঁর আপন কাজে বাধা দিতে পেরেছে অসৎ মারওয়ানের অসৎ বুদ্ধি, কিন্তু বন্ধ করতে মন্ত্রী মারওয়ানের কোন মন্ত্রই কাজে লাগেনি। আব্দুল্লাহ্ তাঁর চির স্বভাবজাত শক্তিতে দুর্বার গতিতে খলিফার সকল দুর্নীতির মুখোশ খুলে দিতেন জনগণের সামনে।

নজরবন্দী ভাতাহীন জীবনের তিন বছরের শেষ প্রান্তে অভাবে-অনটনে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। জীবনের অন্তিম শয্যা গ্রহণ করলেন। মদীনার মানুষ দলে দলে আসতে থাকল—বিপ্লবী আব্দুল্লাহ্কে সালাম জানাতে। খলিফা ওসমানও এলেন দেখা করতে। বললেন—"আমার জন্য আল্লাহ্কে বলেছি—তিনি যেন আমার ব্যাপারে, বাইতুলমালের ব্যাপারে আপনাকে ক্ষমা না করেন। আর আপনি জেনে বাখুন যে, আমি আপনার হত্যা ঘোষণা করিনি, তবে দেশের জনগণ ঘোষণা করেছে।"

বিপ্লবী আব্দুল্লাহ্‌র জীবন-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। পবিত্র কোরআনের শিক্ষক ও ব্যাখ্যাকার বুঝতে পারলেন বিদায় বেলা আগতপ্রায়। মহানবীর ওহী-জীবনের একান্ত সঙ্গী, মহান সাহাবী আজ যেন অন্তরে-আত্মায় মহানবীর সাথেই মিলনের জন্য আকুলি-বিকুলি করছেন। মদীনা আজ শ্রেষ্ঠতম মানুষের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীকে চিরবিদায় জানাবে। মহান বিপ্লবী, মহানবীর মহান শিষ্য, মুসলিম জাহানের মহান কোরআন বিশারদ, ইসলামের সেবায় সর্বত্যাগী, ইসলামের চিন্তায় সর্বহারা, সর্বহারাদের সর্বহারা নেতা আজ সকল সর্বহারাকে ডাকলেন, বললেন—"জয় তোমাদের অদূরে অপেক্ষমান, সত্যের জয়, সর্বহারাদের জয়, সর্বহারাদের জয়, সুন্দরের জয়, সুন্দরেব জয়, এক আল্লাহ্‌র জয়। অসৎ খলিফা ওসমানকে আমার মৃত্যু সংবাদ দিও না।" তাঁর কথা বা উপদেশ মত তাঁর মৃত্যু সংবাদ খলিফাকে দেওয়া হলো না। তাঁরই একান্ত বন্ধু, আর একজন মহান বিপ্লবী আম্মার ইবনে ইয়াসাব জানাযা নামায পরিচালনা করলেন। মহানবীর চির স্নেহধন্য কোরআনের ব্যাখ্যাকাব ও সর্বহারাদেব মহান বিপ্লবী মানুষ বিদায় নিলেন খলিফাব অচিরে ও অত্যাচাবে।

সঙ্গ মানুষকে কত ঊর্ধ্বে তুলতে পারে ও কত নিম্নে নামাতে পারে, তা আমবা খলিফা ওসমানেব জীবনে লক্ষ্য কবলাম। প্রথম জীবনে মহানবীর সঙ্গ তাঁকে কোথায় তুলেছিল, পববর্তী জীবনে মাবওযান ও মুয়াবিয়ার সঙ্গ তাঁকে কোথায় নামালো, তা অচিন্ত্যনীয। ইসলামেব আগমন হযেছিল পুঁজিপতি ও সর্বহাবাদেব একটি সুন্দব সামঞ্জস্য ঘটাতে, উভয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান বাড়াতে নয। কিন্তু হযবত ওসমান (বাঃ) এব খেলাফতে ঐ দুই ধডিবাজেব দান্দাগিরিতে ঐ ব্যবধান নৈবাশ্যজনকভাবে বেড়ে গিযেছিল। ধনীব অপচয়

ও অপব্যয় এবং গরিবের দুঃখ ও কষ্ট উভয়ই সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বিপ্লবের সূচনা ও বিদ্রোহের বীজ এখানেই নিহিত হয়েছিল। এখানে মারওয়ান ও মুয়াবিয়া ছিলেন মূল, খলিফা ছিলেন নিমিত্তের ভাগীমাত্র।

তুমি যে পবিত্র ফুল শস্ত হৃদয়
পাপীর পার্শ্বেতে তার হোক পরিচয়।

খলিফা এই পরিচয় দিতে ব্যর্থ হলেন।

খলিফা ওসমানের খেলাফতে জনগণের শ্রেণীবিন্যাস ও বীতশ্রদ্ধ জনগণ

ইসলাম সর্বপ্রথম সর্ব মানুষকে শুনিয়েছিল শান্তির বাণী ও দিয়েছিল সাম্যের ওয়াদা এবং জানিয়েছিল উদার আহ্বান এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একটি সূতায় সকলকে বাঁধতে। ''মানব জাতি মূলে একই সম্প্রদায় ভুক্ত''। একথা কোন মানুষের নয়, কোরআনের। ২ : ১১৩, ৩ : ১১০, ৪ : ১, ৭ : ১৮৯, ১১ : ১১৮, ২১ : ৯২, ২২ : ৩৪, ৬৭। অতঃপর এই অখণ্ড মানব জাতিকে আবার কোরআনই মূলত দুটো ভাগে ভাগ করল—সৎ ও অসৎ, ভাল ও মন্দ। কোরআনে মানুষ হিসাবে মানব সম্প্রদায়ের আর কোন ভাগ নাই। তদুপরি যে ভাগগুলো আছে তা মানুষ-রচিত মানুষের সংকীর্ণতা ও নীচতার ফল। ভাল বা সৎ সম্পর্কে: ৩৭ : ৮০, ১১০, ১২১, ১৩১, ৭৭ : ৪৪, এবং মন্দ বা অসৎ সম্পর্কে: ৭৭ : ১৫, ১৯, ২৪, ২৮, ৩৪, ৩৭, ৩৯, ৪৫, ৪৭, ৪৯। মহানবীর চোখেও ছিল এই অখণ্ড মানবগোষ্ঠী। এবং মহানবীও ছিলেন অখণ্ড মানবগোষ্ঠীর জন্য মহানবী, মানুষের মাঝে মনুষ্যত্ব ও মানবতার রাজ্য গড়তে এসেছিলেন। এই ছিল তাঁর বিশুদ্ধ ব্রত ও পবিত্র পেশা।

দেখিয়াছ ঘৃণাভরে রাজ্য ভাঙাগড়া
দেখনি মানুষ তার মনুষ্যত্ব ছাড়া।

এই গেল মহানবীর সময়ে মনুষ্য সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা। অতঃপর আসে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকরের যুগ বা খেলাফত কাল। তিনি সর্ব বিষয়েই মহানবীকে পূর্ণভাবেই অনুসরণ করেছিলেন। এর পর এলো ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকের যুগ। যখন রাজ্যের সীমাও বেড়ে গেল। রাজ্যে মানুষের সংখ্যাও বেড়ে গেল। এসে গেল শ্রেণীবিন্যাস। ১। আরব, ২। অনারব, ৩। কোরাইশ, ৪। অকোরাইশ, ৫। হাশিমী, ৬। উমাইয়া, ৭। জিম্মী, ৮। দাস, ৯। আনসার।

হযরত ওমর ফারুক মহানবীর মূল লক্ষ্যকে সুনিপুণভাবে লক্ষ্য করতেন। মহানবীর মূল ব্রতকে আপন বিজ্ঞতার সাথে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। মহানবীব ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে আপন ইচ্ছাতে পরিণত করেছিলেন। মহানবী ছিলেন আপসহীন মুজাহিদ আল্লাহর ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে। ওমর ফারুকও ছিলেন আপসহীন মুজাহিদ মহানবীর ইচ্ছাকে আপন খেলাফতে রূপ দিতে। এইটাই ছিল ইসলামের মূল ধারাবাহিকতা। ওমর ফারুকের প্রবল প্রশাসন ও প্রখর ব্যক্তিত্ব বনের বাঘ হতে শৃগালকে নদীর এক ঘাটে সকলকেই সম্মিলিতভাবে সহিষ্ণুতার সাথে সহ্-অবস্থানে ও সহমিলনে জল খাইয়ে দিয়েছিলো। কারো টুঁ শব্দটি করারও উপায় ছিল না। করলেই প্রশাসনের প্রবল কৃপাণ ও করবাল অগ্র-পশ্চাতে সদাই প্রস্তুত ছিল। মহানবীর ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে মাথায় রেখে সকলের মাঝে সমতা রক্ষা কবে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সমষ্টিগতভাবে একটি আদর্শ মানব সমাজ গড়তে হযরত ওমর যে প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, অখণ্ড মানব জাতির ইতিহাসেও তা নজীরবিহীন। অতি অতর্কিতে সমগ্র মানব জাতির শত্রু, সমগ্র মনুষ্যত্বের শয়তান, মানবতার ইবলিস আততায়ী আবুলু-লুর হাতে এই মহামানবটি যদি শহীদ না হতেন, যদি তিনি আরো দশ বছর খেলাফত চালাতে পেতেন, তাহলে সমগ্র মানব জাতির অখণ্ড ইতিহাস আজ নিশ্চয়ই অন্যভাবে লিখিত হত। প্রমাণ হতো ইসলামের সাম্য, গালভরা বাণী নয় বক্তৃতা নয়, কত নিরাভরণ সত্য, ইসলামের ভ্রাতৃত্ব মুখের ভাষণ নয়, লোক দেখান আসন বিলি নয়, বাস্তব জীবনের কঠিন পদক্ষেপে কত সত্য, নিখিল বিশ্বের নির্যাতিত অধঃপতিত সহায় সম্বলহীন দরিদ্র মানুষকে উত্তোলনের সিঁড়িতে ও উত্তরণের নিরিখে কত বড বাস্তব সত্য।

ইসলামের এই উদার বাণী প্রাচীন ভারতেও প্রতিধ্বনিত হতে দেখি। ভারতের মহান সন্তানগণ মনুষ্য সমাজকে শিখিয়েছে, রাজ্যের ভাঙ্গাগড়াই বড় কথা না, মনুষ্যত্বের গঠন বড় কথা।

"তুচ্ছ করি রাজ্য ভাঙাগড়া
তুচ্ছ করি জীবন-মৃত্যুর ওঠাপড়া
যুগ যুগান্তরে—কহিতেছে একস্বরে
চির বিরহীর বাণী নিয়া—
ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া!"
"হে ভারত নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যাজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি।"

আরব-অন-আরব :

হযরত ওমরের যুগ শেষ হলো। শাসনের যুগ শেষ হল। হযবত ওসমান (রাঃ)-এর যুগ এসে গেল। শোষণের যুগ আরম্ভ হলো। ভেদাভেদেব যুগও আরম্ভ হলো। হযরত ওমর ফারুকের সময় আরবের বাইরেও ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। এবং সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে অনেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। আরব চিরদিনই কৌলিন্য প্রথায় বিশ্বাসী ছিল, এবং কৌলিন্যের দাবীদার ছিল। তারা আরব ব্যতীত বাকি বিশ্বকে 'আযম' নামে অভিহিত করতো। অর্থাৎ তারা নিজদের সভ্য ও বাকিদেব অসভ্য মনে কবত। তবে আরবদের সেই জাহেলী যুগের সভ্যতাব মানদণ্ড দেখলে সকলেই অবলীলাক্রমে বুঝবে তাদের সেদিনকার সভ্যতা কি বস্তু ছিল। জাহেলী যুগে কেউ মদ-ভাঙ-জুয়া-নেশা ব্যভিচার ইত্যাদিতে জড়িত না থাকলে, তাকে সেকেলে বা অসভ্য বলা হতো। ইসলাম শিখিযে দিল—সভ্যতা কি জিনিস। আরবীয় মুসলমানগণ অন্য বিজিত দেশসমূহের প্রজাবৃন্দকে তো ছোট মনে করলই, এমনকি ঐ দেশের মুসলমানদেবও নীচ মনে কবলো। এটা ছিল ইসলামের ঘোর বিরোধী নীতি। খলিফা ওমবেব সময এই পাপ আববেব মন থেকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হযনি। তবে তাঁব সময মাথাচাডা দেওযাব সাহস পায়নি। খলিফা ওসমানেব সময়ে আবব ও অন-আববেব এই কৌলিন্যের প্রাচীন কলহ আবাব প্রবলতব হয়ে উঠল।

কোরাইশ-অকোরাইশ :

এককথায় বলতে গেলে কোবাইশ কৌলিন্যেব মূলে ছিল কাবা গৃহ। নবীবব হযরত ইব্রাহিমের সময় হতেই কোরাইশগণ মক্কার কাবা গৃহেব পুবোহিত বা খাদেম ছিলেন। এই কাবা গৃহই পরোক্ষে-প্রত্যক্ষে তাঁদেব উন্নতিব মূলে দৃশ্য-অদৃশ্য বহু অবদান জুগিয়েছে। আজকের দিনেই মুসলিম জাহান মক্কাব কাবাশরীফকে কেন্দ্র করে হজ করতে যান না, বহু প্রাচীন কাল হতেই আর্য-অধ্যুষিত আরব ভূমি বছরে একবাব হজ কবতে আসতো। এবং এই হজ উপলক্ষে বসত বিশাল মেলা। এই মেলা উপলক্ষে আসত অসংখ্য মানুষ বহু দূর দূরান্ত হতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসাবেব জন্য। এই পৌত্তলিক যুগেও কোরাইশগণ ছিল প্রধান পুরোহিত। পুরোহিতেব বিভিন্ন প্রাপ্যই তাদেব কালক্রমে বহু উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত কবে। যেমন—

১। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে দেশ-বিদেশে গেলে তাবাই সর্বাধিক সুযোগ

সুবিধা লাভ করতো। তাতে তাদের মধ্যে অর্থের সমাগম বেড়ে উঠল। এবং ব্যবসায় ছিল আরবের মূল জীবিকা। এইভাবে এই মূল জিনিসটাই তারা হাতে পেল।

২। সভ্যতা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে কোরাইশগণই ছিল অগ্রগণ্য। যেহেতু তারা মিশর, রোম, আবিসিনিয়া, পারস্য, সিরিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এলো। গড়ে উঠল আরব সভ্যতা, আরব আভিজাত্য। সংমিশ্রণেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ। এই বিকাশ প্রকাশ লাভ করলো কোরাইশদের মধ্যেই।

৩। আরব প্রতিনিধিত্ব কোরাইশদের মধ্যেই সীমিত ছিল। পারস্য দরবার, রোমান দরবার বা যে কোন বিদেশী দরবারে একমাত্র কোরাইশ গোত্রই আরবকে প্রতিনিধিত্ব করত। এর ফলে তারা আচারে-ব্যবহারে জ্ঞান-গরিমায় আরবের অন্যান্য গোত্র অপেক্ষা অনেক উন্নতি লাভ করে।

৪। সঙ্গীত-সাহিত্য ও ললিত বিদ্যায় তারা খুবই পারদর্শী ছিল। তাদের পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সাহিত্যচর্চা করত। এর মূলে ছিল দেশ-বিদেশের নানা যোগাযোগ। এখানেও তারা ছিল শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার।

৫। যুদ্ধ বিদ্যায় তারা জন্মগতভাবে পারদর্শী ছিল। প্রথমত তাদের জীবিকার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল শিকার। দ্বিতীয়ত দেশে-বিদেশে যাতায়াত করতে তাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিতে হতো। এ কারণেও তাদের যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়েছিল। এই কারণে সমরের নেশা তাদের পেশার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে শরীরের শিরায় শিরায় মিশে গিয়েছিল। তাদের বল ছিল বাহুতে এবং বীরত্ব ছিল বুকে।

৬। মক্কাতে কোন রাজা-বাদশা ছিল না। ছিল যৌথ শাসন-ব্যবস্থা। কিছুটা পৌরশাসনের মত। এবং এর প্রধান ছিল কোরাইশগণ। শাসনকার্য তারাই চালাতো। এই কাজ পরোক্ষভাবে কোরাইশদের শাসকের মান ও মর্যাদা দান করেছিল।

৭। দেশকে বহিঃশত্রুর কবল থেকে তারাই রক্ষা করত। আবার দেশের আভিজাত্যকে তারাই তুলে ধরতো। সুতরাং এই সমস্ত বিবিধ কারণগুলো

কোরাইশকুলের উত্তরণের মূলে যে কাজ করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নাই। এবং এইজন্যই কোরাইশগণ—অকোরাইশদের নিকট মান-মর্যাদা, সম্মান ও সম্ভ্রমের দাবী রাখতো। এই সমস্ত অভ্রান্ত ঐতিহাসিক কারণগুলোর জন্যই বোধ হয় একদিন দীনের নবী মহানবীও বলেছিলেন—"আল্ আইম্মাতো মিনাল কোরাইশ।" ইমাম (বা নেতা বা পরিচালক) কোরাইশদের মধ্য হতে হবে। সুতরাং যুগ-যুগান্তর ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দীর ইতিহাসে আরব নেতৃত্ব কোরাইশদের নাড়ী ও নেশাতে মিশে গিয়েছিল। নবীবর হযরত ইব্রাহিমও একদিন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর বংশে (কোরাইশ) নবী প্রেরণের জন্য। ২ : ১২৪-১৪১, ২৫৮, ২৬০।

এই কোরাইশকুলকে হযরত ওমর খুব ভালভাবেই জানতেন, জানতেন তাদের প্রভুত্বের নেশা, ক্ষমতার লিপ্সা, মান-অভিমান, আভিজাত্য ইত্যাদি। তিনি নিজেও ছিলেন কোরাইশ। মহানবীর মত মানুষকেও তারা দীর্ঘ তের বছর একটি শ্বাস ও স্বস্তিতে ফেলতে দেয়নি। কোরাইশদের চির বাসনার ও কামনার তিনি লাগাম ধরেছিলেন অতীব শক্ত হাতে। জানতেন ঘোড়া বড়ই দুরন্ত। তবে তারাও জানত সাওয়ার তাদের ঘুমন্ত নন, বড়ই জীবন্ত-জাগ্রত। খলিফা ওমর কোরাইশদের আশার ঐ দুরন্ত অশ্বকে অশ্বশালাতেই বন্দী রেখেছিলেন। তাঁর খেলাফতে কোরাইশগণ প্রশাসনের বড় বড় পদে খুবই কম যেতে পেরেছিলেন। এতে দেশে একটি ভারসাম্য রক্ষা হয়েছিল। কোরাইশদের আভিজাত্য অকোরাইশদের উপর প্রশাসনের প্রশ্রয়ে অহমিকা ও ঔদ্ধত্যে পরিণত হওয়ার সুযোগ পায়নি। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফতে কোরাইশগণ বলতে গেলে প্রশাসনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো কেড়ে নিয়েই অকোরাইশদের উপর জুলুম চালিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিল।

হাশিমী-উমাইয়া :

কোরাইশদের মধ্যে দুটো গোত্র। হাশিমী গোত্রে মহানবীর জন্ম। মহানবীর পরও দুই খলিফার যুগে গোত্র-টোত্রের কোন বালাই ছিল না। তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান ছিলেন উমাইয়া গোত্রের মানুষ। এই দুই গোত্রের মধ্যে নানা কারণে নানা অজুহাতে বিচ্ছেদ, বিবাদ ও বিসম্বাদ লেগেই থাকত। এই উমাইয়া গোত্রই মহানবীকে সর্বাপেক্ষা বেশি কষ্ট দিয়েছিল। তারও মূল কারণ ছিল—মহানবী ছিলেন হাশিমী গোত্রের মানুষ। যাই হোক, মহানবীর

মক্কা বিজয়ের পর উমাইয়া পাখিগুলোর অধিকাংশই আর উড়তে না পেরেই তাঁর সীমাহীন প্রবল ব্যক্তিত্বের নিকট বশ্যতা স্বীকার করল। এর ভুরিভুরি প্রমাণ ইসলাম জগতে ও ইসলামের ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় খলিফা ওমর তাঁর প্রশাসনে সমগ্র কোরাইশকুলকেই পাত্তা দেননি। তৃতীয় খলিফা ওসমান তাঁর (ওমর) প্রশাসনের ধারা কিছুদিন মাত্র টিকিয়ে রাখলেন। এরপরই উমাইয়া গোত্রের প্রবল চাপে প্রশাসনের বাঁধ ভেঙে গেল। ফলে উমাই গোত্রের প্রবল বন্যায় প্রশাসন একেবারেই প্লাবিত হয়ে উঠল। এই বন্যার জন্য একমাত্র দায়ী ছিলো বৃদ্ধ খলিফার বার্ধক্যতা। তিনি বিজ্ঞতার সাথে, বলের সাথে বিশ্ববিখ্যাত প্রশাসক ওমরের শাসন নীতিকে ধরে রাখতে পারলেন না। কারণে-অকারণে উমাইয়াগণ হাশিমীদের ঘাড়ে চেপে বসল। এরই নাম ইতিহাস, এরই নাম পরিহাস। যাঁরা ইসলামকে গড়লেন, যাঁরা ইসলামকে যাদের হাত থেকে বাঁচালেন, ইসলামের সেই শত্রুকুল বিনাশ কুল উমাইয়াগণ ইসলামের রক্ষাকারী হাশিমীদের উপর ছড়ি ঘুরাতে থাকল। পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করার এও একটি প্রধান কারণ ছিল। মাসী মা অপেক্ষা বড় হলো।

আন্‌সারগণ :

সারা পৃথিবীর মাঝে ইসলাম যদি কোন একটি গোত্রের নিকট সর্বাপেক্ষা বেশি ঋণী, তাঁরা এককথায় মদীনার আন্‌সার গোত্র। এককথায় ইসলামের জন্য আনসারগণের দান কত গভীর, কত ব্যাপক, কত বিশাল, কত বিস্তৃত, কত অকৃত্রিম, কত অনুপম তা কেউই বলে বা লিখে শেষ করতে পারবে না। মহানবীর জীবিতকালে তাঁদের যে অবদান, তার কোন শেষ নাই। আনসারগণের দান যে শুধু মহানবীতেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়। সে দান অকৃত্রিমভাবে অকুণ্ঠ চিত্তে মোহাজিরদের প্রতিও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। পৃথিবীর উদ্বাস্তু-ইতিহাসে আজ পর্যন্তও জানা যায়নি, অতিথি-আগন্তুককে মানুষ এইভাবে আহ্বান ও আমন্ত্রণ জানাতে পারে, এইভাবে আপন করতে পারে, যা করেছিলেন মোহাজিরদের প্রতি আনসারগণ।

প্রথম বাড়িতে স্থান দিলেন, পরে যাবতীয় অস্থাবর জিনিসের সমান ভাগ দিলেন। অতঃপর সমস্ত স্থাবর জিনিসের অংশ দিলেন জমি-জায়গা ইত্যাদি। তারপরও যা করলেন, তা সত্যিই বিশ্ব ইতিহাসের কোথাও নাই। মোহাজিরগণ কেউই আপন আপন স্ত্রীকে সাথে আনতে পারেন নি, বা কোরেশগণ আনতে দেয় নি বরং কেড়ে নিয়েছিলো। আনসারগণ এক্ষেত্রে তাঁদের স্ত্রীদের মধ্যে

যেটি সর্বাপেক্ষা সুন্দরী, যেটি সর্বাপেক্ষা বয়সে কম, তাদের তালাক দিয়ে মোহাজির ভাইদের সঙ্গে বিবাহ্ দান করলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ঘটনা পূর্বেও কোন দিন ঘটেনি, এবং পরেও আর কোন দিন ঘটবে না। মহানবীর জীবিতকালে তাঁরা তাঁর নিকট হতে তাঁদেব এই ত্যাগ স্বীকারের জন্য কত যে স্নেহ ও সম্মান এবং আদর পেয়েছিলেন, তার শেষ নাই। তাঁরাও খুবই খুশী ছিলেন। এইভাবে কেটে গেল ইসলামের প্রথম পর্যায়ের ইতিহাস।

ইসলামের দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলামের জন্য ত্যাগে ও তিতিক্ষায় আনসারগণ কি অবদান রাখলেন। সেখানেও তাঁরা তুলনাহীন ত্যাগীপুরুষ। যখন নেতা নির্বাচনে তুমুল হট্টগোল, যখন আনসারগণ বুঝতে পারলেন—আজ নেতৃত্ব না নিতে পারলে, কাল দাস বনে যেতে হবে। তাই সকলেই আপন আপন দাবীতে অনড় রয়ে গেলেন। তখন দেখা গেল—এই ঝগড়া, এই টানাপোড়েন ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত হানতে চলল। তখন আনসারগণ কারো খাতিরেই নয়, কেবলমাত্র ইসলামের জন্যই নিজদের দাবী প্রত্যাহার করে নিলেন।

ইসলামের প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা আনসারগণের এই অকৃত্রিম দানগুলোকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বিবেচনা করে তাঁদের যথাযোগ্য স্থান ও মান দিয়েছিলেন। কিন্তু ইসলামের তৃতীয় খলিফা ওসমানের সময়ে আনসারগণের অবস্থা এমন একটি পর্যায়ে দাঁড়াল, কেউ কেউ প্রথম প্রথম দু একবার মুখ খুললেন, অনেকে নির্বাক হয়ে গেলেন। অনেকে এটাকে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস বলে মেনে নিলেন। হিজরতের যামানায় যারা বালক ছিল, তারা আজ যুবক, সেদিনের যুবকগণ আজ বৃদ্ধ। কিন্তু সেই যামানার সাথে আজকের যামানার কি মর্মস্পর্শী পার্থক্য সৃষ্টি হলো। এই কথা চিন্তা করেই বয়স্কগণ বুকভরা ভারি বেদনার সাথে বার বার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতেন। তাঁরা মহানবীর সমাধি পাশে দাঁড়িয়ে অব্যক্ত হৃদয়-বেদনায় পাথর হয়ে যেতেন। এই আনসারগণকে যদি বেদনাদায়ক ইতিহাস রোমন্থন করতে না হতো, নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে না হতো, দুঃখের স্মৃতিকে দিনের পর দিন স্মরণ করতে না হতো, ইসলামের ইতিহাসকে ভাগ্যের নিষ্ঠুরতম পরিহাস বলে গ্রহণ করতে না হতো, তাঁরা যদি নীরব নিশ্চল প্রাণহীন পাথর হয়ে না যেতেন, তাহলে খলিফা ওসমানের জীবনাবসান কখনও ওরূপ মর্মান্তিক হতো না। যাঁরা নবীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁরা খলিফাকেও রক্ষা করতেন।

জিম্মী :

মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় জিম্মীব উৎপত্তি কেন হলো।

কোরআনের অমোঘ নির্দেশই জিম্মীর জন্ম দিয়েছে। কোরআন বলে—"ধর্মে বল প্রয়োগ নাই।" ২ : ২৫৬। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, জাতি ও ধর্ম সম্পর্কে কোরআনের মতামত স্পষ্ট—সংঘর্ষ নয় সহ-অবস্থান, বিবাদ নয় বন্ধন, ধ্বংস নয় প্রগতি, বিচ্ছেদ নয় মিলন। ২ : ৬২, ১৫৬, ৫ : ৬৯, ৬ : ১০৮, ১০ : ৯৯, ১১ : ১১৮, ১৬ : ১২৮, ১৭ : ৮৪, ২২ : ৬৭, ২৩ : ৫৩, ৩০ : ৩২, ৪৯ : ১১, ১৩। কোরআন স্বীকৃতি দিয়েছে অখণ্ড মানবজাতিকে। ২ : ১১৩, ৩ : ১১০, ৪ :১, ৭ : ১৮৯, ১১ : ১১৮, ২১ : ৯২, ২২ : ৩৪, ৬৭। কোরআন স্বীকৃতি দিয়েছে প্রত্যাদিষ্ট সকল ধর্মকে। ২ : ৬২, ১৫৬, ৫ : ৬৯, ৬ : ১০৮, ১০ : ৯৯, ১১ : ১১৮, ১৬ : ১১২৮, ১৭ : ৮৪। স্বীকৃতি দিযেছে সকল ধর্মীয় দূতকে ২ : ২৮৫, ৪ : ১৬৪, ১০ : ৪৭, ১৩ : ৭, ১৬ : ৩৬, ৩৫ : ২৫, ৪০ : ৭৮।

মুসলমানগণ দেশ-বিদেশ জয় করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বাড়ল। তাই বলে সেটা কৃপাণের জোরে নয়, কোরআনের পথে। কোরআন একজনকেও জোর করে মুসলমান করার অনুমতি দেয়নি। যারা স্বেচ্ছায় হয়েছিল, তাদের কোন বাধা ছিল না। যারা আপন ধর্ম আপন আচার-ব্যবহার পালন করতো, তাদেরই বলা হতো জিম্মী, অর্থাৎ রাষ্ট্রের আমানত। তাদের বিপদ-আপদ রাষ্ট্রকে দেখতে হতো। যদি তারা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যোগদান না করত, তাহলে তাদের একটা 'কর' দিতে হবে, যার নাম 'জিজিয়া'। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে গেলে ওটা লাগত না।

খলিফা ওসমানের সময় এই সম্প্রদায় প্রায় ছিল না বললেই চলে। রাজনৈতিক দল হিসাবে তাদের আর কোন স্বীকৃতি ছিল না। সংখ্যাতেও তারা প্রায় শূন্য হয়ে এসেছিল। তবে কোরআনের নির্দেশানুযায়ী ধর্মের ব্যাপারে মুসলমানগণ কোনদিনই তাদের উপর কোন চাপ সৃষ্টি করেনি।

দাসদাসী :

মহানবী ঘোষণা করেছিলেন—"ইসলামের কোন দাসপ্রথা নাই। আজ আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ দাস মুক্তি।" মহানবী বলতেন—"আল্লাহ একমাত্র মালিক, বাকি সকলেই তাঁর দাস। মানুষ অন্য কারো দাস হতে পারে না।"

যে-কাজ আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়তর
তোমরা সকলে আজ দাস মুক্ত কর।—হাদিস।

তখনকার দিনে মুসলিম রাষ্ট্রে দু প্রকাবেব দাস ছিল। ক্রীতদাস ও

যুদ্ধবন্দী-দাস। প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা দাস মুক্তিতে অসাধারণভাবে সহযোগিতা করেন। ফলে মুসলিম রাষ্ট্রে দাস-দাসীর সংখ্যা কমতে থাকে। পরে এই দুই শ্রেণী এক শ্রেণীতে পরিণত হলো—আযাদ গোলাম ও দিন-মজুর। এরা আবার ধীরে ধীরে দেশের গরীব সম্প্রদায়ের সাথে মিশে এক হয়ে গেল। সংখ্যাতে এরা বেশ ভারিই হলো। এদের আচার-ব্যবহার উন্নত ছিল না। উন্নত হওয়াটাও স্বাভাবিক ছিল না। যাঁরা উন্নত তাঁরা তো এদের উন্নতি কোন দিনই চাননি। তাঁরা চেয়েছিলেন—এরা দেশের সেবক ও দাস দলে পরিণত থাক্। কিন্তু ইসলাম এর তীব্র বিরোধিতা করেছে। মহানবী এই সমস্ত অনগ্রসরদের উত্থান চেয়েছিলেন—

যা কিছু বলিলে তুমি করিলে যুক্তিতে—
মানুষের কল্যাণে মানব-মুক্তিতে।

খলিফা ওসমানও বুঝেছিলেন। তাদের উত্থান ব্যতীত দেশেরও উত্থান বহিত হবে। মহানবী চেয়েছিলেন মানব-সমাজের উত্থান, কোন গোষ্ঠীর উত্থান নয়। বিশেষ করে চেয়েছিলেন অনুন্নতদের উত্থান। এই নীতিতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাসী ছিলেন।

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।...
যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"
—গীতাঞ্জলী

ইসলাম মানুষকে যে কয়েকটি ওয়াদা দান করেছিল, তাদের মধ্যে প্রধান ছিল :

১। সাম্যের ওয়াদা—২ : ২৫, ৬২, ১৭৭, ৪ : ১, ৭ : ১৮৯, ১১ : ১১৮, ১৬ : ৯৩, ১৮ : ১০৭, ২১ : ৯২-৯৪।
২। ভ্রাতৃত্বের ওয়াদা—২ : ২১৩, ৪ : ১, ৭ : ১৮৯ , ১০ : ১৯, ১১ : ১১৮
৩। সম-অধিকারের ওয়াদা—৮৭ : ১৪, ৯১ : ৯, ১০।
৪। গণতন্ত্রের ওয়াদা—২ : ২৮৪, ৩ : ১৫৯, ৪২ : ৩৮।
৫। ন্যায় বিচারের ওয়াদা—৪ : ৪৮, ১৩৫, ৫ : ৮, ১৬ : ৯০, ৯৯ : ৭-৮।

খলিফা হযরত ওমর ফারুকের সময় ইসলামের এই ওয়াদাগুলো কিভাবে

পালিত হয়েছিল, একটি মাত্র ধনীর দৃষ্টান্তে বুঝা যাবে। বিশাল ধনের অধিকারী আব্দুর রহমান বিন আউফ্ তাঁর চুলকানি ব্যাধির জন্য মহানবীর নিকট হতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করার অনুমতি পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি একদিন খলিফা ওমরের দরবারে হাজির হলেন পুত্রসহ। খলিফা বসতে বললেন, সঙ্গে সঙ্গে ছেলের জামার ভেতব হাত ভরে দিয়ে জামাটাকে ছিঁড়ে দুখণ্ড করে দিলেন। আব্দুর রহমান খলিফাকে মহানবীর অনুমতির কথা বললেন। খলিফা বললেন—"জানি। তিনি আপনাকে অসুখের কারণে অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু ইসলামি কানুন ভেঙ্গে বড়লোকী দেখাবার জন্য ছেলেকে নয়।" এখানে বাচ্চার প্রতি মমতাবোধও খলিফাকে ন্যায় বিচারে বিরত করতে পারেনি। খলিফা এই পাঁচটি ওয়াদাকে ইসলামের অন্যান্য শরীয়তী পাঁচটা রোকনের মতই মেনে চলতেন। খলিফা ওসমানের নিকট ওটা সম্ভব না হওয়ায় তিনি জনগণের নিকট হতেও ঐ সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেননি।

পঞ্চম অধ্যায়

কুফার মাটিতে
কোরাইশ-অকোরাইশ
বিদ্রোহের প্রথম বহ্নিশিখা

বিদ্রোহের সূত্রপাত : কোরাইশ বংশজাত সাঈদ তখন কুফার গভর্ণর। গভর্ণরের কথাবার্তা ও চাল-চলনে অকোরাইশ কুফাবাসীগণ মনের দিক থেকে কষ্ট পেতো। তারা তাদের অসন্তোষের কথা কারণে-অকারণে সময়ে-অসময়ে নানা প্রাঙ্গণে প্রকাশ করত। খলিফা জেনেও না জানার ভান করতেন, শুনেও না শুনার ভান করতেন। কিন্তু অকোরাইশদের ভেতরের আগুন দিন দিন তীব্র রূপ নিতেই থাকল। একদিন অহেতুক তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বয়ং গভর্ণরের দরবারে তাঁর সম্মুখে যা ঘটল, তাকে বহুদিনের বহু পুঞ্জীভূত ক্ষোভের এক বহিঃপ্রকাশই বলতে হবে। কারণে-অকারণে বিকারগ্রস্ত মনের তিল তখনই তাল হয়, যখন পশ্চাতে রয়ে যায় প্রাণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। কথাটি ছিল—ফোরাত নদীর তীরবর্তী জমিগুলোকে আবাদ করা নিয়ে। কোরাইশ-অকোরাইশ দুপক্ষের কথা কাটাকাটি, পরে হাতাহাতি, খুনোখুনি।

দশজনের নির্বাসন : গভর্ণর সাঈদ অপ্রস্তুত হলেন। মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হলো। সমগ্র শহর অশান্ত হয়ে উঠল। চারিদিকে বিশৃঙ্খলতা বেড়ে গেল। সমাজের সুযোগ সন্ধানীরা সুযোগ পেল। দুর্বৃত্তগণের দুঃসময় শেষ হলো। তারা মানুষ বুঝে মওকা পেল। যাঁরা ছিলেন শক্তিশালী ও শান্তি প্রিয়, তাঁরা ছিলেন দূরে যুদ্ধে ও জেহাদে রত। সুতরাং পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মত আর কেউ ছিল না। গভর্ণর নিজকে একাকী নিঃসঙ্গ ও বিব্রত বোধ করে খলিফার উপদেশ প্রার্থনা করে পত্র দিলেন। খলিফা উত্তর দিলেন—''ঐ অশান্ত মানুষগুলোকে শান্ত করার জন্য ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য দুর্ধর্ষ শাসক মোয়াবিয়ার নিকট সিরিয়াতে পাঠিয়ে দাও।'' খলিফা এ কথা মুয়াবিয়াকেও পত্র দ্বারা জানিয়ে দিলেন। ফলে মুয়াবিয়ারও আত্মশ্লাঘা বেড়ে গেল। খলিফার ধারণা ছিল মুয়াবিয়া দুর্ধর্ষ শাসক, তাঁর শাসনে সব ঠিক হয়ে যাবে। খলিফার নির্দেশ এসে গেল, গভর্ণর প্রস্তুতি নিলেন ঐ দশজনকে বন্দী করে দামেস্কে পাঠিয়ে দিতে। একবারও চিন্তা করলেন না বাকি কুফাবাসীদের মনোভাব। যেমন তাদের দামেস্কে পাঠান হলো, অমনি কুফার বিশৃঙ্খলার আগুন আরো দশগুণ বেড়ে গেল। সকলেই খলিফার আদেশকে ইসলাম বিরোধী মনে করলো। এই আদেশ কোরআনের খেলাফ। সুতরাং আদেশদাতাই শাস্তির হকদার। বিশেষ করে কুফার আওসাদ গোত্রটিই ছিল সর্বাপেক্ষা বড় গোত্র। এবং তাদের নেতা ছিল বীর যোদ্ধা মালিক উশ্তার। এই মালিক উশতারও ঐ দশজনের একজন হয়ে সিরিয়াতে নির্বাসিত হলেন। বিদ্রোহের আগুন বহু গুণে বেড়ে গেল।

আমির মুয়াবিয়ার দুর্ব্যবহার : আমির মুয়াবিয়া এদের সেন্টমেরী নামক পরিত্যক্ত গীর্জাতে বন্দী বা অবরুদ্ধ করলেন। এবং প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা ভ্রমণ কালে গীর্জাতে যেতেন এবং তাদের কতকগুলো কুৎসিত বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করে চলে আসতেন। তাদেরকে পথে আনার দুটো পথের একটাও গর্বোদ্ধত আমির মুয়াবিয়া না নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পথ বেছে নিলেন। হয় তাদের কড়া শাসনে শান্ত করতে হতো, না হয় বুঝিয়ে সুজিয়ে বন্ধু হিসাবে বরণ করতে হতো। তা না করে তাদের ভেতরের আগুনটাকেই আবার জ্বালিয়ে দিলেন। কুফাবাসীগণ তাদের অত্যাচারের কথা নানা মাধ্যমে জানতে পারত। একদিন তারা সহ্য করতে না পেরেই আমির মুয়াবিয়ার মুখের উপর জবাব ছুঁড়ে দিলে আমীর তাদের সঙ্গে সঙ্গে কঠোর শাস্তির জন্য সিরিয়ার হেমস নগরে প্রেরিত করে তথাকার অধীনস্থ গভর্ণর বীর খালিদের পুত্র

আব্দুল্লাহকে যথাযথ শাস্তি দিতে নির্দেশ দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তারা অত্যাচারের জঘন্যতম শিকাব হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে মুক্তি পেল। তাঁরা স্বাধীনভাবে সিরিয়াতেই থেকে গেলেন, একমাত্র নেতা মালিক উশতার মদীনা গমন করলেন। তাঁর মদীনা গমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মিশরের বিদ্রোহীদের সাথে মিলিত হওয়া। ইতিমধ্যেই কুফার গণ-উত্থান ব্যাপক রূপ ধারণ করায় গভর্ণর সাঈদ নিজকে বড়ই বিব্রত ও অসহায় ভেবে খলিফার নিকট মদীনায় গমন করেন।

খেলাফতে প্রথম প্রকাশ্য সংঘর্ষ : মালিক উশতার এবার কুফাতে প্রত্যাবর্তন করেই সদলবলে নূতনভাবে ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করলেন। জনগণকে জানালেন—"তোমাদের পাপাচারী উচ্ছৃঙ্খল গভর্ণর সাঈদ তোমাদের ধ্বংসের জন্য অপদার্থ খলিফার দরবারে দরবার করছে। তিনি আমাদের আওসাদ গোত্রের সমস্ত বৃত্তি কেটে দিয়েছেন। তিনি কোন্ অধিকারে আমাদের জীবন দিয়ে অধিকৃত ময়দান ও বাগানগুলোকে কোরেশদের দান করেছেন! আজ আমরা উত্তর চাই।"

ইতিমধ্যে গভর্ণর সাঈদ মদীনা হতে খলিফার মৃদু উপদেশ সহ প্রত্যাবর্তন করছিলেন। কুফাবাসীরা কুফা প্রবেশের পূর্বেই জোর বাধা দিলেন। মালিক উশতারের ভাই ইয়াজীদ একটি স্বাধীন পতাকা উত্তোলন করে গভর্ণর ও খলিফার বিরুদ্ধে সমস্ত কুফাবাসীকে একত্রিত হতে আহ্বান জানালেন। গভর্ণর প্রমাদ গুনে অবশেষে কাফকা নামক এক বীর যোদ্ধাকে মীমাংসা করার জন্য অনুরোধ করলেন। কাফকা উত্তর দিলেন—"ফোরাত নদীর জোয়ারকে ভাটাতে আনা সম্ভব হলেও এই জনস্রোতকে উল্টোদিকে ঘুরান আর সম্ভব নয়।" গভর্ণর সাঈদ শেষ চেষ্টা করে বিফল মনোরথ হয়েই মদীনাতে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হলেন।

খলিফার সমীপে মালিক উশতারের দাবীপত্র :

তখনও কুফাবাসীগণ খলিফার বিরুদ্ধে সরাসরি কোন বিদ্রোহ ঘোষণা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। কেননা তাঁদের মূল বক্তব্য ছিল গভর্ণরের বিরুদ্ধে, কোরাইশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে। খলিফা তাঁদের দাবী বুঝতে পেরে তাঁদেব পত্র দিলেন—তারা খলিফার আনুগত্য মেনে নিক, খলিফাও তাদের দাবী মেনে নেবেন। বিদ্রোহের অগ্নিশিখা কতদূর উঠেছিল—পত্রটিই তার প্রমাণ।

"মালিক ইবনে হারিসের পক্ষ হতে অপদার্থ পথভ্রষ্ট এবং নবী ও

কারআনের খেলাফকারী খলিফার প্রতি, আপনার চিঠি আমরা বুঝলাম।"
আপনার নিকট আমাদের দাবী :

১। আপনার নিয়োজিত শাসনকর্তাকে জুলুম হতে দূরে থাকতে হবে।

২। মিথ্যা অভিযোগে ভাল মানুষের নির্বাসন দেওয়া চলবে না।

৩। আপনি জুলুমকে ইন্‌সাফ ভাবতে পারেন না।

৪। অন্যায়কে ন্যায় মনে করতে পারবেন না।

৫। আমাদের আপন যোগ্য লোকদের আমাদের উপর শাসক নিযুক্ত করতে হবে। যেমন মূসা আল্ আশায়ারী, আব্দুল্লাহ্ ইবনে কায়েস, আবু হুযাইফা প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

৬। আমাদের উপর কোরাইশগণ বিশেষ করে আপনার গোত্র ও পরিবার ভুক্ত উমাইয়াগণকে কোনদিনই শাসক নিযুক্ত করতে পারবেন না।

৭। আমাদের উপর অত্যাচারের জন্য আপনি তওবা করুন, আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করুন। তাহলে আমরা আপনার আনুগত্য মেনে নেবো।

অশুভ পরিণতি : খলিফা মালিক উশতারের চিঠিও পেলেন এবং আপন সম্বিৎও ফিরে পেলেন। সাঈদকে গভর্ণর পদ হতে অপসারিত করে তাদের প্রার্থী মূসা আল আশায়ারীকে গভর্ণর নিযুক্ত করলেন, এবং অন্যান্য পদগুলোতেও আবু হুযাইফা ও আব্দুল্লাহ্ প্রমুখ ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করে বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন। খলিফা সেই কাজই করলেন, তবে খুবই বিলম্বে করলেন। যাতে কুফার সীমিত বিপ্লব দেশ হতে দেশান্তরে রূপ নিল। বিবাদ যেন নির্ধারিত পথে বিসংবাদ ও বিষাদে পরিণত হলো। বিষবৃক্ষটি জন্ম নেওয়ার সুযোগ পেলো। আঞ্চলিক অসন্তোষ, স্থানীয় বিপ্লব ধীরে ধীরে বৃহদাকারে একদিন সারা দেশে অভিশাপ ডেকে আনল, দেশ জুড়ে ব্যাপক বিদ্রোহে পরিণত হলো।

বিদ্রোহের অন্তরালে বাইজান্টাইন কূটনীতি :

বিশাল রোমান বাহিনী যখন বার বার মুসলমানদের সাথে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হতে থাকল, তখন রোমান সম্রাট অন্য চিন্তা করলেন। সম্মুখ সমরে না পেরে পশ্চাদ হতে গোপন আঘাতের চেষ্টা করলেন। চেষ্টা অনেকটা সফলই হয়েছিল। তখন মুসলমানদের মধ্যে মিশে গেছে জিম্মী ও অমুসলমান দাস-দাসীগণ অগণিত ভাবেই। এই জিম্মীদের হাতেই প্রাণ হারিয়েছিলেন ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হযবত ওমব ফারুক। ৬৩৬ খ্রীস্টাব্দে ইয়ারমুকের

যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন রোমানদের অধীনস্থ বিশাল ভূস্বামী জাবালা। খলিফার নিকট প্রাণভিক্ষা পেয়ে মুসলমান হয়ে ইসলামের কঠোর বাঁধাধরা নীতিতে টিকতে না পেরে আবার আপন উচ্ছৃঙ্খল জীবনে ফিরে যান। তিনি ছিলেন ইসলামের ঘোর শত্রু।

পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র হাকিম জাবালা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও বার বার কূটকৌশলে-কূটচালে ইসলামের ক্ষতিই করার চেষ্টা করেছেন। অধিকাংশ আরব ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে হাকিম ছিলেন রোমানদের গুপ্তচর। তখনকার দিনে ইসলামের দুটো বিশাল দুর্গস্বরূপ ছিল ইরাক ও মিশর। রোমানগণ এই দুটোর প্রতিই তাঁদের শ্যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। হাকিম স্থান বেছে নিলেন ইরাককে। দেখা যাচ্ছে যেদিন হতে হাকিম ইরাকে পা রাখলেন তখন হতে ইরাক আপন মূর্তি ধারণ করলো। হাকিম যেন ইরাকে অকোরাইশ মুসলমানদের অভিভাবকের স্থান গ্রহণ করলেন। দাবী-দাওয়ার আর শেষ নাই। দরখাস্তের পর দরখাস্ত খলিফার দরবারকে ভরে তুললো। পরিস্থিতি বিষময় ও বিষাক্তময় হয়ে উঠল। কথায় কথায় কোরাইশ ও অকোরাইশদের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠল। কারণে-অকারণে দ্বন্দ্ব-দলাদলি চরম সংঘাতের পথ বেছে নিল। জনগণকে একবার উত্তেজিত করতে পারলে উত্তাল করতেও আর দেরি হয় না। তখন যে কোন উত্তাল তরঙ্গে ন্যায়-অন্যায়ের ব্যবধান বলতে আর কিছুই থাকে না। এই পরিস্থিতির পেছনে হাকিমের অবদান ছিল অপরিসীম। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফাকেও জিম্মীরা শেষ করেছিল। তৃতীয় খলিফাকেও তারাই খতম করল। এই দুটো হত্যাতে একটু তফাত ছিল—দ্বিতীয়টিকে জিম্মীরা স্বহস্তে খুন কবলো, কিন্তু তৃতীয়টিকে ষড়যন্ত্রে খুন করালো।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে আজও ঐ ষড়যন্ত্রের ধারা বন্ধ নাই। আজও খ্রীস্টান ও ইহুদীগণ মনের সুখে সারা পৃথিবীতে মুসলিম বিদ্বেষ চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতে বিগত আড়াই শত বছরের বৃটিশ শাসন দেখলেই এটা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে আসে। ইংরাজগণ মুসলমানদের হাত হতে রাজ্য নিলো। অতঃপর তাঁদের একটাই কাজ বাকি ছিল—তামাম ভারতীয়কে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া। অথচ মুসলমানদের সাথে বেদান্তিক-দর্শন ও ভাবধারার একটি অপূর্ব মিল রয়েছে। মিল না বলে একই বললেও ভুল হয় না। আজকের ইসলাম বলে—"লা ইলাহা—ইল্লাল্-লাহ্।" আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। এবং অতীতের বেদান্তিক বাণী—"একমেবা-

দ্বিতীয়ম্''। এক ব্রহ্মা দ্বিতীয় নাস্তি। তাহলে উভয়ধর্মের মূল বাণীতে ও মূল বিন্দুতে আমরা কত এক। ইংরাজ এই গভীর সত্যটিকে ধামাচাপা দিয়েছিল, স্বাধীন ভারতও এই সহজ সত্যটিকে সবার মধ্যে প্রকাশ্যে তুলে ধরল না।

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ও শ্রীঅনিলকুমার চন্দ আমাকে বলেছিলেন—এটা ডঃ রাধাকৃষ্ণন চেয়েছিলেন। বিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের জানতে দেওয়া হোক, ধর্মের মূল বাণীতে তারা কত এক। কিন্তু জওহরলাল নেহরু চাননি। এইদিক থেকে নেহরু ভারতের সম্প্রীতির অধ্যায়ে দূরদর্শিতার পরিচয় তুলে ধরতে পারেন নি, বরং ক্ষতিই করে গেছেন।

পরবর্তীকালে আমি আমার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও আচার্য সুকুমার সেনকেও ঐ একই কথা বলতে শুনেছি।

সমালোচনামুখর মদীনা শুরার অন্তহীন অভিযোগ

চিন্তানায়কদের সমষ্টিগত অভিযোগ ও মতামত :

কুফার বিপ্লব ও বিদ্রোহীদের নিকট খলিফা ওসমান যখন নিঃশর্তভাবে নতি স্বীকার করলেন, তখন মদীনার তামাম জনসাধারণ খলিফার কাজে অবাক বিস্ময় বোধ করলেন। এবং প্রবীণ সাহাবা ও চিন্তানায়কগণও চিন্তা করতে পারেন নি যে, একজন খলিফা এইভাবে নিজকে মুষ্টিমেয় বিদ্রোহীদের নিকট বাঁধা দিতে পারেন। আপামর জনসাধারণ হতে বিদগ্ধজনের বক্তব্য ছিল—খলিফা উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে কেন তিনি আপন চিন্তাপ্রসূত স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিলেন না। তিনি বিদ্রোহীদের বক্তব্যের বিন্দুবিসর্গও বাদ দিতে পারলেন না। তাঁরা যেভাবে খলিফাকে হুকুম দিয়েছেন, খলিফা একজন অনুগত ভৃত্যের ন্যায় তাই তামিল করেছেন। অথচ তাদের বক্তব্যগুলোকে যদি মানতেই হলো, তাহলে তাদের বিদ্রোহে নামতে দেওয়া হলো কেন? ন্যায়বিচার তো পূর্বেই করা উচিত ছিল। অতএব যে মানুষের ন্যায় বিচার করার সাহস ও শক্তি নাই, বিদ্রোহীদের রুখে দেওয়ার মত শৌর্য ও বীর্য নাই, মনোবল নাই, আপন কর্মচারীদের প্রতি আস্থা নাই, মালিক বা সার্বভৌমের খলিফা হলেও স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি নাই; এরূপ একটি মানুষ, তিনি যতই ভাল মানুষ হোন না কেন, একটি বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করার জন্য কেবলমাত্র অযোগ্যই নন, তাঁর অপদার্থতা সাম্রাজ্যের সীমাহীন ক্ষতিও ডেকে আনতে

পারে। সুতরাং এদিন জনগণের অলিখিত রায়ে খলিফা ওসমান তাঁর খেলাফত হতে বরখাস্ত ও বিচ্যুত হয়েছিলেন।

এবার আমরা 'মজ্‌লিশে শূরা' ও প্রধান প্রধান সাহাবাগণের অভিমত ও নির্দিষ্ট অভিযোগ লক্ষ্য করবো।

মহাবীর সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস :

খলিফা ওসমানের খলিফা-নির্বাচনী কমিটিতে মজলিশে শূরার খলিফা ওমর কর্তৃক যে পাঁচজন ব্যক্তি সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, মহাবীর সা'দ তাঁদের অন্যতম। পারস্য বিজয়ী বীর সা'দ জীবনে বহু যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু মহাবীর খলিফাদের ন্যায় একটি যুদ্ধেও পরাজয় বরণ করেন নি। ইসলামের প্রতিটি রণাঙ্গনে ক্ষণজন্মা বীরের গ্লানিহীন গৌরব লাভ করেছিলেন। মুসলিম বীরের ইতিহাসে সা'দ চিরস্মরণীয়। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফতে যখন প্রবল ঝঞ্ঝা দেখা দিল তখন খলিফা তাঁকে হস্তক্ষেপের জন্য অনুরোধ করলে তিনি বলেছিলেন—"সা'দের তরবারি জেহাদের প্রয়োজন ব্যতীত কোষমুক্ত হবে না।" মহাবীর সা'দ খলিফাব কাজে নীরব হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর এই নীরবতাও ক্ষুব্ধ জনগণকে বিক্ষুব্ধ প্রাঙ্গণে কম প্রাণশক্তি জোগায়নি।

যুবাইর ইবনে আওয়াম :

তিনি ছিলেন আবুবকরের কন্যা আসমার স্বামী। খলিফা ওসমানের একান্ত বন্ধু। যুবাইর ধনী ব্যক্তি। ওসমান খলিফা হওয়ার পর বাইতল মাল হতে তাঁর ধনরাশির বৃদ্ধিকল্পে তাঁকে প্রভূত ঋণ দান কবেছিলেন। যাব ফলে যুবাইব মক্কা, মদীনা, ইরাক ও মিশরের মত স্থানগুলোতে ধনের পাহাড় বচনা করেছিলেন। কিন্তু খলিফাব বিরুদ্ধে জনবোষ যখন একেবারেই ফেটে পড়েছিল, তখন ঐ জীবন-মৃত্যুব সন্ধিক্ষণে যুবাইব খলিফাকে সাহায্য কবা তো দূরের কথা, একটিবার প্রতিবাদও করেন নি। খলিফাব আচবণে এ হেন উপকৃত একান্ত বন্ধুও বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। জনগণ এটাও লক্ষ্য করেছিল।

তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ :

ইসলামের ইতিহাসের বড়ই মর্মান্তিক ক্ষণ ওহোদ প্রান্তরে স্বয়ং মহানবী যখন শত্রু পরিবেষ্টিত। তখন সাহবী তালহা শত তীব, শত তববাবি, শত বর্শাব বিরুদ্ধে ঢাল রূপে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি কি কবে যে এত অসংখ্য আঘাতের পব আঘাতে তাঁব দেহকে মহানবীব সম্মুখে ঢাল রূপে ধবে বেখেছিলেন, তা চিন্তাতেও আসে না। হযবত তালহা তখন তাঁব চলৎ শক্তি হাবিয়ে ফেলেছিলেন। স্বয়ং মহানবী তাঁব সম্পর্কে বলেন "যদি কোন

মৃত মানুষকে চলাফেরা করতে দেখতে চাও, তাহলে তালহা বিন ওবাইদুল্লাহকে দেখ।'' এই তালহা খলিফা ওসমানের খেলাফত কালে প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হয়েছিলেন। এবং খলিফার সাথে খুবই ভাল সম্পর্ক ছিল। বিপদেব মহা ঘনঘটায় এই তালহাও নীরব ছিলেন। তবে মোটেই চাননি—খলিফাকে বধ করা হোক। তাই প্রত্যেকে বাড়ির লোক পাঠিয়েছিলেন খলিফার প্রাণ বাঁচাতে। কিন্তু তখন অগণিত মানুষের আক্রমণে পরিস্থিতি ভয়াল রূপ ধারণ করেছিল। নিশ্চয়ই এঁরা খলিফাকে বারবার সতর্ক করে নিবাশ হয়েই নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন। কেননা এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন—অগ্নিযুগের অগ্নি পরীক্ষার মানুষ। এটা ছিল জনরোষেরই স্বচ্ছ আয়না।

আব্দুর রহমান বিন আউফ :

ইনি ছিলেন স্বয়ং মজলিশে শূরার সভাপতি। খুব বয়স্ক মানুষ, সম্মানিত মানুষ। এঁর হাত দ্বারাই হযরত ওসমান (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি একদিন মনের মহাখেদে আলীকে অনুরোধ করেছিলেন—''তুমি তরবারি ধারণ কর, আমিও ধারণ করি। তারপর তাঁর খেলাফতের পালা শেষ করে আসি।'' খলিফা ওসমানের বিরুদ্ধে এতো মহা অভিযোগ।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস :

আব্দুল্লাহ বলেন—''যখন মদীনার রাজনীতির আকাশ একেবারেই মেঘাচ্ছন্ন, যখন চারিদিকে বিপ্লব ও বিদ্রোহের বাণী আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে দিচ্ছে, সেই সময় একদিন খলিফা ওসমান আমার পিতা আব্বাসের নিকট এলেন, এবং বললেন—আলী আমার সাথে সম্পর্ক ছেদ করে দিয়েছে। আরো অনেক কথা বললেন। আমার পিতা দীর্ঘ সময় চুপ থাকার পর বললেন—''হে আমার ভাইপো! যদি আলী তোমাব চোখে ভাল না হয, তাহলে তুমিই বা আলীর চোখে ভাল হবে কি করে! কর্মের দিক থেকে, ধর্মের দিক থেকে, আত্মীয়তার দিক থেকে তোমরা তো দুজনেই কাছাকাছি। এখন অন্তরের দিক থেকে দুজনেই কাছাকাছি হওয়াব চেষ্টা করো।'' তখন হযরত ওসমান বললেন—''আমি আপনার উপর ভাব দিলাম, আপনি এই ব্যাপারে যা করার করুন।''

এই ব্যাপারে হযবত আব্বাস একদিন খলিফাব নিকট গিযে সব কিছু সবিস্তারে আলোচনা করেন। এবং বলেন—''আলোচনা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। কিন্তু আমি তাঁব ঘর হতে বেব হওযাব সঙ্গে সঙ্গেই নাটের গুরু মাবওযান প্রবেশ কবল। এবং খলিফাকে আপন দুষ্ট মতে টেনে নিল। একটু

পরেই খলিফার নিকট হতে একজন আমার নিকট এলো, এবং বললো—'খলিফা আপনার সাথে এখনই একটি জরুরী কথা বলতে চান।' আমি গেলাম। খলিফা আমাকে বললো—"আমি আপনাকে যে কাজের মীমাংসার ভার দিয়েছিলেন—তা এখন মুলতুবী থাকুক। আমি বিষয়টি আরো একটু চিন্তা করবো।" অতঃপর আমি চলে এলাম। বহুলোক জিজ্ঞাসা করলো—কি হলো ? আমি বললাম—"ও লোক তো অপরের বশীভূত।" অতঃপর হযরত আব্বাস আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করলেন—"হে আল্লাহ্, তুমি আমাকে অশান্তির পূর্বেই তুলে নাও। যাতে আমার কোনই কিছু করার নাই, তা দেখার জন্য আমাকে আর বাঁচিয়ে রেখো না। হযরত আব্বাসের প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে মঞ্জুর হলো। তিনি আগামী জুমার আগেই ইহলোক ত্যাগ করলেন। কিন্তু হযরত আব্বাস যে আশঙ্কা করেছিলেন, তা ঘটে গেল। খলিফা হযরত ওসমানের প্রতি অতি আক্ষেপ ভরেই তিনি ইহজগৎ ত্যাগ করলেন। মক্কা বিজয়ের সময় এই হযরত আব্বাসের মধ্যস্থতায় হযরত ওমরের হাত হতে আবু সুফিয়ান সদলবলে মহানবী কর্তৃক ধনে-প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন, নচেৎ সেদিন যে বাঘের হাতে পড়েছিল, তাদের আর রক্ষা ছিল না। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্য আজকের মধ্যস্থতা মাঝপথে কুচক্রী মারওয়ান কর্তৃক মার খেলো, এবং জীবনের মত মার খেলেন নিরপরাধ জ্ঞানান্ধ খলিফা ওসমান। এটা ছিল জনরোষের আর একটি হিমালয়।

হযরত আলী :

তিনি মজলিশে শূরার অন্যতম সদস্য ছিলেন। নির্বাচনে খলিফার প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি ভোট দিয়েছিলেন হযরত ওসমানকে এবং ওসমান আলীকে। হযরত আলী শুধু মহাবীর ছিলেন না, মহাজ্ঞানীও ছিলেন। সাধুতা, সততা, অনাড়ম্বর জীবন ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। হযরত ওসমান খলিফা হওয়ার পর তাঁর প্রতি আনুগত্যে তিনি ছিলেন চির অবিচল, চির অচঞ্চল। ইসলামে বিভেদ সৃষ্টি হোক এটা ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ। তিনি অহরহ খলিফার নিকট যেতেন তাঁকে সুপরামর্শ দেওয়ার জন্য। কিন্তু কুচক্রী মন্ত্রী মারওয়ান হযরত আলীর যাতায়াতকে ভাল চক্ষে দেখতেন না। তিনি খলিফাকে আলীর বিরুদ্ধে ভালভাবেই গড়ে তুলেছিলেন। এবং পরনির্ভরশীল খলিফাও পরগাছার মত গড়ে উঠেছিলেন। বহুবার হযরত আলী খলিফা দরবারে উপেক্ষিত হয়েছেন, এমনকি মাঝে মাঝে তাঁর ভাগ্যে কিছু কিছু তিরস্কারও জুটেছে। খলিফার সন্দেহপ্রবণ মন মনে করত—হযরত আলী তাঁর ছিদ্রান্বেষী। এই সমূহ ঘৃণিত কারণে হযরত আলীও যাওয়া বন্ধ করলেন।

মহাজ্ঞানী আলীর সংসারে কোনদিনই বেশ স্বচ্ছলতা ছিল না। কেননা তিনি অন্যান্যদের মত আখের গুছাতে জানতেন না। তিনি একাধারে ছিলেন মহাজ্ঞানী, অপর দিকে ছিলেন মহাবীর। সুতরাং তাঁর কার্যধারাও ছিল ঐ দুই পথে পরিচালিত। তিনি জ্ঞানের অনুশীলন, জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানাহরণ এবং জ্ঞান বিতরণ ইত্যাদি কাজে সদাই ব্যস্ত থাকতেন। আবার প্রয়োজন পড়লে ইসলামের সেবায় অস্ত্রধারণও করতেন।

জীবনে একদিনও তিনি খলিফা ওসমানের দ্বারে অর্থের জন্য আগমন করেন নি। বাইতুলমাল হতে যা সামান্য বৃত্তি পেতেন, গরিবী হালে তাতেই সংসার চলতো। খলিফা যখন বাইতুল মাল হতে লক্ষ লক্ষ দেরহাম দু'হাতে বিতরণ করছেন, তখন তাঁর কি একবার উচিত ছিল না খাইবার বিজয়ী বীর আলীকে একবার জিজ্ঞাসা করা তাঁর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। মারওয়ান পরিচালিত, মারওয়ান মার্কা চশমাতে দেখা তাঁর দৃষ্টি সবার নিকট দৃষ্টিকটু ঠেকেছিল। হযরত আলী ব্যবসা করতেন না। তিনি জ্ঞানের দরজা ছিলেন, ব্যবসার দরজা ছিলেন না। তাই সংসারে অভাব ছিল।

যেদিন খলিফার গৃহ অবরোধ হয়, সেদিন তিনি তাঁর দুই পুত্র বিবি ফাতেমার দুই নয়নের দুটো মণি ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনকে খলিফার নিরাপত্তার জন্য পাঠিয়ে দেন। এবং তাঁরা দুজনেই আঘাতপ্রাপ্ত হন। হযরত আলী সর্বদাই খলিফা ওসমানের সংশোধন চেয়েছিলেন। তাঁর খেলাফতের খতম চাননি। খলিফা ওসমানের সর্বাপেক্ষা বড় দুর্ভাগ্য হযরত আলীর মত সর্বত্যাগী মহাজ্ঞানী ও মহাবীরের প্রতি আন্তরিকতা সাথে আস্থা রাখতে পারেন নি। খলিফার চোখে ছানি এতই বেশি পড়েছিল, তিনি সিংহ ও শৃগালের মধ্যে পার্থক্য কবতে পারেন নি।

খলিফার বিরুদ্ধে অন্যান্য ভিত্তিহীন অভিযোগ

ওবাইদুল্লার বিচার :

খলিফা ওমর শহীদ হওয়ার পর তাঁর ছেলে রাগে ও ক্ষোভে নিজেই তিন দুরাচারকে বধ করেন। খলিফা ওসমান ওবাইদুল্লার অর্থদণ্ড করে তাঁকে মুক্তি দেন। এতে কিছু আলেম খলিফার বিরুদ্ধে কথা তুলেছিলেন। কিন্তু খলিফার এই রায় ও সিদ্ধান্ত তখন প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছিলেন। বিশাল সাম্রাজ্যের সমস্ত মানুষ কোন বিষয়ে একমত হবে, এটা আশা কবাটাও বাতুলতামাত্র। এখানে খলিফা খুবই বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

কোরআন দগ্ধকরণ :

বহুবার বহু স্থানে আমি এ বিষয়টি আলোচনা করেছি। এখানে সবার সাথে পরামর্শ করেই খলিফা ওসমান এমন একটা স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, হযরত আলীর মত মানুষও বলেন,—"আমার নিকট তোমরা কেউই ঐ ব্যাপারে মুখ খুলবে না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার মধ্যে আমি একজন।" সুতরাং ভুল কোরআন, অশুদ্ধ কোরআন দগ্ধকরণের সিদ্ধান্ত খলিফাকে অমর করেছে। খলিফা ওসমানের সমস্ত ভাল কাজ বাদ দিলেও এই একটি কাজেই তিনি চির অমর।

দযাবান ক্ষমাবান হযরত ওসমান্
তোমারই অমর দান বিশুদ্ধ কোরআন্।

মসজিদ- ই-নববী সম্প্রসারণ :

হযরত ওমর ফারুকের সময়ও মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ প্রয়োজন হয়েছিল। তখনও অনেকে বাড়িঘর উচিত মূল্যে দিতে গররাজি হওয়ায় খলিফা জবর দখল করেন। এমনকি অনেককে প্রয়োজনে কারাগারেও নিক্ষেপ করেছিলেন। তখন কিন্তু কেউই টুঁ-শব্দটি করতে পারেন নি। কোন বীব বা বিপ্লবীর জন্ম হয়নি। যেমনি খলিফা ওসমান ঐ একই প্রয়োজনে একই কাজ করলেন। তখনই অনেকেই খলিফাব বিরুদ্ধে দল পাকাতে থাকলেন। খলিফার দুর্বল চিত্তই এই দলাদলিকে জন্ম দিযেছিল। আসলে খলিফা এই কাজে এতটুকুও অন্যায় কিছু করেন নি। বরং আজও মসজিদ-ই-নববী মুসলিম জাহানের যত মুসলমানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে। হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁদেব অন্যতম। সুতরাং এই পবিত্র কাজে আজও তিনি শ্রদ্ধাব পাত্র। এগুলো তাঁর তুলনাবিহীন এক একটি অমব কীর্তি।

কর্মী তলিয়ে যায় অতল জলে
কীর্তি দাঁড়িয়ে বয় আপন বলে।
মস্‌জিদে-নববী, পবিত্র কোরআন—
দুটোতেই দুধ সম হযরত ওসমান।

নামায বাড়ানো ও কমানো :

হজের সময় ইযেমেনের মানুষ মীনায় ও আরাফাতে কয়েক রাকাত নামায বেশি কবে পডতেন। কিন্তু নবীজী ও বিগত দুই খলিফাব সময় ঐ বকম হতো না। বা কেউ বেশি করে নামায পডত না। খলিফা ঐ সময় ধর্ম-প্রাণ

মানুষের অতিরিক্ত নামায পড়া দেখে আকৃষ্ট হন, এবং সকলকে পড়তে অনুরোধ করেন। এই কারণে কিছু সাহাবা খলিফার বিরুদ্ধাচরণ করেন। এতে খলিফা এতটুকুও দোষের কিছু করেছেন বলে মনে হয় না। কেননা মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে পয়সা খরচ কবে হজ করতে যান এবাদতের জন্য, আল্লাহর বন্দেগীর জন্য। তা একটু বেশি কবলে দোষের কি আছে। এটা ধর্মের প্রাণহীন শুকনো বিতর্ক ব্যতীত কিছুই নয়।

হযরত ওসমান মক্কায় গিয়ে কসর (সংক্ষিপ্ত) নামায পডতেন না। তিনি পুরা নামায পড়তেন। অন্যান্য সাহাবাগণ তাঁকে প্রশ্ন করলে, তিনি উত্তরে বলেছিলেন—"আমি মক্কাতে নিজকে প্রবাসী বলে মনে করি না। তাই পুরা নামায পড়ি।" এতে কিন্তু মানুষ তাঁর প্রতি চটে যান এবং তাঁকে বলেন—নবী এরূপ করতেন না। খলিফা এ ব্যাপাবে অন্যায় কিছু করেন নি, বরং এই সমস্ত কাজে তাঁর ধার্মিক মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। মনে রাখা দরকার কতকগুলো নীতির বন্ধনে ধর্ম নাই। ধর্ম আছে—মানব-অন্তরে, মানব-অনুভূতিতে। কেবলমাত্র অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম, ধর্মই নয়।

অশ্বের উপর কর :

মহানবী ও তাঁর পরবর্তী দুই খলিফার সময় অশ্বের উপর কোন কর ছিল না। খলিফা ওসমান প্রয়োজন বোধে অশ্বের উপর কর ধার্য করেন। এতে কিছু মানুষ খলিফার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার—জগৎ পরিবর্তনশীল, সমাজ বিবর্তনশীল, সেখানকার এমন অনেক জিনিস থাকবে, তারাও পবিবর্তনশীল। সুতরাং একটি বিশাল সাম্রাজ্যের কর্ণধার তিনি—তাঁর পরিচালনায় যুগোপযোগী চিন্তা করবেন না, এটা ভাবা যায় না। মনে রাখা দরকার—ইসলামের সব কাজই নিয়েতের উপর নির্ভর করে।

চারণভূমি : মহানবী ও দুই খলিফার সময় সরকারি কোন চারণভূমির প্রয়োজন হয়নি। সেইজন্য তাঁরা কোন চারণভূমিও সংরক্ষণ করেন নি। কিন্তু দেশের পব দেশ বিজয়ের সাথে সাথে সরকারিভাবে যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য বহু অশ্ব ও উট পালনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন খলিফা এই সব জীব জন্তুদের আহার বিহারের জন্য সবকারিভাবে কিছু চারণভূমির সংরক্ষণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে কিছু মানুষ খলিফার বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে থাকলো। স্বয়ং মহানবী ও দুই খলিফা যে কাজ কবেন নি, খলিফা ওসমান তাই

করে অন্যায় করছেন। কিন্তু বুঝা দরকার তাঁদের সময় ওটার তো প্রয়োজনই ছিল না। সুতরাং এসব অভিযোগ একেবারেই অবান্তর। এই সমস্ত ব্যাপারে পরবর্তীকালে মুতাজেলা সম্প্রদায় খলিফাকে পুরাপুরি সমর্থন করেছেন।

খলিফার বিরুদ্ধে প্রধানত তিনটে মূল অভিযোগ ছিল: ১। চাকুরীতে স্বজন-পোষণ, ২। বাইতুল মালের অপচয়, ৩। জমি বণ্টন।

তাদের স্লোগান ছিল :—১। আমির মুয়াবিয়াকে বরখাস্ত কর।
কুচক্রী মন্ত্রী মারওয়ানকে বরখাস্ত কর।
অত্যাচরী আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমীরকে বরখাস্ত কর।
আব্দুল্লাহ্ বিন আবি সারাহ্‌কে বরখাস্ত কর।
২। বায়তুলমালে অপচয় বন্ধ কর।
৩। জমি বণ্টন বন্ধ কর।

খেলাফতে দাবানলের পশ্চাৎ-দৃশ্য

মহানবীর তিরোধান :

মহানবী অসভ্য-অসংযত বর্বর আরবকে পথ দেখালেন সভ্য জীবনের, সংযত জীবনের। কিন্তু তাদের পথ দেখাতে দীর্ঘ তের বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেও তারা পথ দেখলো না। বরং স্বয়ং নবীকেই আপন পথ দেখতে বাধ্য করলো। অর্থাৎ তাঁকে মক্কা ত্যাগ করতে হলো। মদীনাতে দশ বছর একটানা প্রচার চালিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই দশ বছরেও মক্কাবাসীগণ নবীকে ছেড়ে কথা বলেন নি। তাঁর সাথে যুদ্ধের পর যুদ্ধ বাধিয়েছে। তবে হেরেছে। এবং শেষ হারা হেরেছে ওখানেই যেখান হতে নবীকে তাড়িয়েছে। সেই মক্কাও হারিয়েছে। অতঃপর আর উড়তে না পেরেই ইসলামের খাঁচায় পোষ মেনেছে। কিন্তু এই দুরন্ত পোষমানা পাখীগুলোকে মহানবী ভালভাবে তালিম দিয়ে ট্রেন্ড্ করার সুযোগ পাননি। অল্পকালের মধ্যেই তিনি তিরোধান লাভ করেন। ইসলামের আদর্শ তাদের মজ্জাগত হওয়ার পূর্বেই আদর্শ দাতার তিরোধান ঘটে গেল। পরবর্তীকালে এই অবাধ্য পাখীগুলোর অসংযত আচরণ খলিফা ওসমানের জীবনে সৃষ্টি করল এক করুণতম ইতিহাস। দাবানলের অন্তরালে এইটাই ছিল প্রথম ও প্রধান দৃশ্য।

মহান সাহাবাগণের শূন্যতা :

মহান খলিফা ওসমানের খেলাফতে দাবানল যখন জ্বলে উঠল, তখন হতে মহানবীর তিরোধান বহুদিনের ব্যবধানে পর্যবসিত। বদর প্রান্তর হতে তাবুক প্রান্তর পর্যন্ত যে সমস্ত ক্ষণজন্মা বীর, আদর্শ পুরুষ, সর্বস্বত্যাগী মানুষ, শত অত্যাচারে অদমিত মানুষ, ঈমানের দুর্জয় সাধক, মহান মোজাহিদ মহানবীকে সদাই ঘিরে ছিলেন, ঐসব বিরল ব্যক্তিত্বের আজ আর কেউ নাই বললেই চলে। হযরত ওসমানের মত শত ওসমান, সহস্র ওসমান একদিন বুক দিয়ে মহানবীকে ঘিরে ছিলেন। ঐ প্রাঙ্গণে আজ ওসমান একাকী অতীতের বেদনাদায়ক করুণ স্মৃতিগুলো একের পর এক বেদনার বিদীর্ণময় অন্তরে কতই না আপশোসের সাথে স্মরণ করছেন। এই সমস্ত মহান সাহাবাদের অনুপস্থিতিও ছিল দাবানলের দ্বিতীয় কারণ।

মদীনায় সৎমানুষের শূন্যতা :

খেলাফতের শেষ প্রান্তে চির শান্ত মদীনাও যেন অশান্ত হয়ে উঠল। তখন তথাকার শান্তিপ্রিয় মানুষ, সৎ মানুষ, দক্ষ মানুষ, চিন্তাশীল মানুষ, রক্ষণশীল মানুষ, সংযত মানুষ, সাহসী মানুষ নভচারী পাখীর ন্যায় নিরাপদ বাসার জন্য অন্য বৃক্ষের সন্ধান করতে থাকলো। সিরিয়া ছিল তাদের জন্য নিরাপদ বৃক্ষ। এই বৃক্ষটিতেই তাঁরা ঋতু পরিবর্তনকারী পাখীর ন্যায় বাসা বাঁধতে থাকলো। এই বৃক্ষটির মালী ছিলেন সুশাসক, কঠোর শাসক মুয়াবিয়া। মদীনা শূন্য হলো দক্ষ ও সৎ এবং সাহসী মানুষের সহবত্ হতে, বঞ্চিত হলো ভাল মানুষের মনস্বী হতে, মৌন হলো মহামানবদের মুখ-নিঃসৃত বাণী হতে। মদীনার এই শূন্যতা, এই বঞ্চনা, এই মৌনতা খলিফা ওসমানকে মনের দিক হতে মৃতপ্রায় করে তুলেছিল। আমার শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মশাই বহু ভাষাবিদ ডঃ মোঃ শহীদুল্লাহ্ আমাকে বলেছিলেন— "ওসমান, স্থানের কোন মর্যাদা নাই, মানুষকে নিয়েই তার মর্যাদা।" মদীনা—মদীনা হলো মহানবীকে বুকে ধারণ করে। আজ নবীবিহীন মদীনা, প্রায় সাহাবাবিহীনও মদীনা। এটা ছিল অন্তরালের তৃতীয় দৃশ্য।

হাশিমীদের বৈরিতা : তখনও শেরে খোদা হযরত আলীর মত মানুষ মদীনাতে আছেন। আজও যাঁর পবিত্র নামোচ্চারণে সমগ্র মুসলিম জাহানের বীর সন্তানগণ তাদের শরীরের শিরায় শিরায় সিংহের অমিত শক্তি লাভ করেন। কিন্তু বাংলায় একটি প্রিয় প্রবাদ আছে—"অভাগা যে দিকে যায়, সাগর শুকায়ে যায়।" আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি—খলিফা তাঁর

চরম ভুল ও দুর্ভাগ্যবশত এহেন মানুষটিকে দূরে সরিয়ে ফেলেছেন। শুধু তাই নয়—কুচক্রী মারওয়ান হাশিমী বংশের কাউকেই খলিফার ত্রিসীমানায় আসতে দিতেন না। এইভাবে নবীজীর আসল ও মূল গোত্রটি, যে গোত্রে ইসলাম জন্ম নিল, সেই মহান গোত্রের সমুদয় মানুষকেই তারা শত্রু ভেবে বসল। একবারও চিন্তা করল না যে, এঁরা কোন দিনই ইসলামের শত্রু হতে পারেন না। তবে এটাও সত্য উমাইয়াকুলে তখন ইসলামের কিছু ছিল বলে মনেও হয় না। তাঁরা হাশিমীগণকে ইসলামের শত্রু ভাবেন নি। ভেবেছিলেন তাঁদেরই শত্রু। এইভাবে খেলাফতে হাশেমী বিয়োগান্ত নাটকটি দাবানলের অন্তরালে কম ইন্ধন জোগায় নি। এটা ছিল চতুর্থ দৃশ্য।

কুফা-বসরা, পারস্য ও মিশর :

এই স্থানগুলো মুসলিম বাহিনী বাহুবলে জয় করেছিল। তথাকার বিত্ত ও বৈভবশালী সর্দারগণ যারা বিলাসিতা ও আত্মম্ভরিতায় ডুবে ছিল, তাঁরা ইসলামকে গ্রহণ করেছিলেন পরাজয়ের গ্লানি ও দুর্ভোগকে এড়াবার জন্য। স্বল্প দিনের মধ্যেই এঁরা ইসলামের প্রাঙ্গণে নামলেন মুসলিম যোদ্ধাদের সাথে। বিজয়ের পর বিজয়, মালের পর মাল লাভ, সম্পদের পর সম্পদ, সৌধের পর সৌধ লাভ তাদের চরিত্রে নিয়ে এলো—অসংযত ভাব, উদ্ধত স্বভাব, অতীতের চরম বিলাসিতা, আত্মম্ভরিতা-অহমিকা, অহংকার, অসহযোগ, নানা বদভ্যাস। এই লোকগুলোর জন্য একমাত্র উপযুক্ত শাসক ছিলেন হযরত ওমর ফারুক। কেননা ওমরের বেত্রাঘাত অন্যের তরওয়াল অপেক্ষাও কঠিন ছিল। এ কথাটি আরবের শিশু হতে বনের পশুও জানত। খলিফা ওসমান ছিল অতীব বিনীত ও বিনম্র লাজুক মানুষ। এই চারিটি স্থানের অসংযত মানুষগুলো প্রধানত বিপ্লবকে বিদ্রোহের রূপ দিয়ে খেলাফতকে করল চরমভাবে বিপন্ন ও খলিফাকে করল চরম বিপদাপন্ন। পশ্চাতে এরাই ছিল মূলত বিপ্লবের বহ্নিশিখা ও বিদ্রোহের দাবানল।

আরব বেদুঈন :

আরব-বেদুঈন ছিল চির বল্গাহীন। তারা জানতো না কোন বাধা বন্ধন, ছিল না কোন নাড়ীর টান। রাখতো না কোন নীতির বালাই, দুর্বার জীবনে ছিল চির দূরন্ত আশা, অবলীলায় বরণ করতো আত্মঘাতী নেশা, অবহেলায় হারিয়ে দিতো কতই না অমূল্য ধন, তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের পশ্চাতে ছিল দুঃসাহসিকতা, চরিত্রের ভয় ভীতি লজ্জা শরম সকল কিছুকে মরু-বেদুঈন অতি নির্মম চিত্তে বিদায় দিয়েছিল।

বনচারীমুক্ত মরু বেদুঈন অজগর আজ ইসলামের চিড়িয়াখানায় ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, জ্ঞানে-অজ্ঞানে বিনম্রচিত্ত খলিফার বিনীত ব্যবহারের সুযোগে খেলাফতে কম বিপদ ঘটায় নি। বিদ্রোহের যজ্ঞশালায় বিপ্লবের বীজ মন্ত্রে এরাও ছিল অন্যতম। এটা ছিল পঞ্চম দৃশ্য।

আদর্শের দ্বন্দ্ব :

মক্কার অভিজাত কোরাইশকুল অধিকাংশই মহানবী কর্তৃক মক্কা বিজয়ের পর ও মহানবীর উপর ইসলামের উপর আপনাদের জেদ্ পরিত্যাগ করলেও মনের খেদ পরিত্যাগ করেনি। অগত্যা তারা মুসলমান হলো। চারিদিকে ইসলামের জয়জয়কার। পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে এবার তারা তাদের মূল উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য প্রস্তুত হলো—নিজেদের প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করতে। হযরত ওমর ফারুক পর্যন্ত, তাদের এই দুর্নীতি আশা দুর্বার মনের মাঝে সংযত হয়েই ছিল। যখনই নরম চরিত্রের মানুষ হযরত ওসমান (রাঃ) খেলাফতের দায়িত্ব নিলেন, তখনই তাঁরা আপন স্বরূপে ডানা মেলে ধরলেন। যখনই যেখানে এই কোরাইশগণ আপন আপন আস্তানা গেড়েছেন, দেখা গেছে সেখানেই মনুষ্যত্বের পতন ঘটেছে। মানব-চরিত্রের উন্নতির স্থলে অধঃপতন ঘটেছে। দুর্নীতি, অবনতি, দুরাচার, পাপাচার এবং বিত্ত ও বৈভব এনেছে আবিলতা উচ্ছৃঙ্খলতা।

কিন্তু মহানবী মদীনাতে পা দেওয়ার পরই সেখানে গড়ে উঠেছিল খাঁটি ইসলামি তাহ্জীব্-তমাদ্দুন-সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইসলামি আখলাক। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফতে ইসলামের এই খাঁটি আখলাকের সাথে কোরাইশদের (উমাইয়া) আবিলতাপূর্ণ আখলাকের আরম্ভ হলো সংগ্রাম। স্বয়ং হযরত আলী এই খাঁটি ইসলামি আখলাকের নেতৃত্ব দান করছিলেন। খলিফা ওসমান এই উভয় দলের মাঝখান থেকে শুভ মিলনের চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তাঁদের গতি এতই প্রখর ছিল, খাদ এত গভীর ছিল, খলিফা যেন শেষাবধি নিজেই ভেসে গেলেন। হযরত ওমর ফারুকের সময় উমাইয়াদের এই খাদ্ এত গভীর ও খরস্রোত হওয়ার সুযোগ পায়নি। সেদিনের আরবের সমাজ-নদীতে সভ্যতার যে দুটো ধারা বেগবান গতিতে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছিল, দুর্ভাগ্যবশত তাদের মিলন হলো না। বরং বিরোধের বাঁধ, দূরত্বের সীমানা বিরাট আকারে দেখা দিল। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফতে দৌলত বনাম আদর্শেরও দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়েছিল। এই দ্বন্দ্ব বহির্দ্বন্দ্বেও এসে গিয়েছিল। ইসলামি সভ্যতা, আভিজাত্য ও কৌলিন্য বলতে হযরত

ওমর যা বলেন :—

"এই পৃথিবীতে আমরা যে মর্যাদার আসন লাভ করেছি, এবং পরকালে আমরা আমাদের সৎকর্মের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট যে পুরস্কারের আশা রাখি—এ দুটোই একমাত্র নবী মহম্মদ (সাঃ)-এর জন্য। তিনিই আমাদের ইসলামি আভিজাত্য দান করেছিলেন।

খলিফা নির্বাচনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে মতপার্থক্য :

মহানবীর ওফাতের পরই তার মরদেহ কবরস্থ হওয়ার পূর্বেই নির্বাচনী কলহ মাথা চাড়া দিয়েছিল। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে খলিফা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরাট মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। আনসাররা দাবী করলেন আমাদের মধ্য থেকেই খলিফা নির্বাচিত হবে। কারণ আমরা রসুলুল্লাহ্‌কে মদিনায় আশ্রয় দিয়েছি। ইসলামের সেবায় আমাদের অবদান অবিস্মরণীয়। পক্ষান্তরে মুহাজিরগণ দাবী করলেন যে, রসুলুল্লাহ্ আমাদের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নবীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সর্বোপরি ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আমাদের যেরূপ বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছিল তার কোন তুলনা পাওয়া যায় না। এমনকি আমাদের মধ্যে রসুলুল্লাহ্‌র পছন্দসই উপযুক্ত ব্যক্তিও বিদ্যমান। এরূপ বাদানুবাদকালে হযরত ওমর ও আবুবকর তথায় উপস্থিত হন। অবশেষে যখন খলিফা নির্বাচনের জন্য উভয় পক্ষ একে অন্যের নামপ্রস্তাব করছিলেন সেই সময় হঠাৎ হযরত ওমর জ্ঞানবৃদ্ধ হযরত আবুবকরের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। পরে উভয় দলের সকলেই ধীরে ধীরে ওমর ফারুকের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। এভাবে সর্বসম্মতিক্রমে খলিফা নির্বাচিত হন হযরত আবুবকর (রাঃ)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ঐ সময় হযরত আলী অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি রসুলুল্লাহ্‌র অন্তিম কার্য সমাপনে ব্যাপৃত ছিলেন। পরে অবশ্য তিনিও হযরত আবুবকরের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন।

মুয্‌হারাইত ও হিমারাইত :

আরবে আদি দুটো গোত্র ছিল। একটি মুয্‌হারাইত্ অপরটি হিমারাইত্। এই দুই দলেও ঝগড়ার কোন শেষ ছিল না। একমাত্র মহানবীর অকল্পনীয় ব্যক্তিত্বে সেটা কিছুদিনের জন্য বন্ধ ছিল। প্রথম দুই খলিফার সময়ও তেমন মাথা চাড়া দেয়নি। কিন্তু তৃতীয় খলিফার কালে ঐ প্রাচীন কলহ নূতন কলেবরে রূপ লাভ করে। এবং খলিফাকেও যথেষ্ট বিব্রত করে। খলিফার জীবনে ব্যর্থতার মূলে ছিল—তাঁর বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা, স্বভাবজাত কোমলতা,

মারওয়ানের প্রতি অন্ধ নির্ভরতা ইত্যাদি। তাঁর খেলাফতের প্রথম ছয় বছর গৌরবময় ছিল। তাই তখন তাঁর সুনাম ছিল একেবারেই মধ্য গগনে। এই ছ'বছর পরেই সপ্তম বর্ষে তিনি মহানবীর হাতের অঙ্গুরীটি হারান, যেটি দ্বারা তিনি (মহানবী) সীলমোহর করতেন। অনেকের মতে এই ঘটনাটি হযরত ওসমানের দুর্ভাগ্যের সূচনা করেছিল, ইঙ্গিত দিয়েছিল সাবধানে।

বিপ্লব আজ বিদ্রোহ : আব্দুর রহমান বিন আউফ :

স্বয়ং মজলিশে শুরার সভাপতি আব্দুর রহমান বিন আউফ যেন আপন অজ্ঞাতে ক্ষোভে ও প্রচণ্ড রাগে নিজ হাতে গড়া খেলাফতকে আপন হাতে ভাঙতে শুরু করলেন। মজলিশে শুরার সভাতে এই প্রবীণ সাহাবী আব্দুর রহমানেরই সভাপতিত্বে ও পূর্ণ সম্মতিতে-সমর্থনে-সহানুভূতিতে ও সক্রিয় সাহায্যতে একদিন গড়ে উঠেছিল হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফত ও খলিফার সম্মানিত সিংহাসন। তিনিই প্রথম একদিন ধৈর্যহারা হয়ে একটি উট জবাইকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্য বিদ্রোহের দ্বারোদঘাটন করলেন।

ঘটনাটি ছিল, একদিন এক বেদুঈন সর্দারের নিকট হতে খলিফার নিকট কিছু খাজনা আসে, এবং তার সঙ্গে আসে খুব সুন্দর একটি উট। উটটিকে দেখার জন্য বহু মানুষের ভীড় জমে যায়। সকলেই মুগ্ধ হলো। ধীরে ধীরে মানুষ আপন আপন স্থানে ফিরে যায়। অতঃপর খলিফা উটটিকে তাঁর এক প্রিয়জনকে উপহার দেন। এই কথাটি আব্দুর রহমানের শ্রুতিগোচর হলে তিনি প্রথমত বিশ্বাস করেন নি। কেননা ওটা ছিল সরকারি উট। কেউ পেতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশত উটটিকে যখন ঐ ব্যক্তি নিয়ে আপন বাড়ি ফিরছিলেন, তখন কিছু মানুষ তাঁকে ডেকে আনেন দেখার জন্য। প্রবীণ সাহাবী যেন আপন চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি যেন প্রথম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। ক্ষণিকের মধ্যেই সম্বিৎ ফিরে পাওয়া মাত্রই উটটিকে আপন হাতে আটকালেন। এবং সকলকে ডাকলেন ও বললেন—"বাইতুল মাল গরীব দীন-দুঃখীদের জন্য। জনসাধারণের জন্য, এটি খলিফার খেয়াল খুশীর ধন-ভাণ্ডার নয়। তাঁকে কিছু করতে গেলে মজলিশে শুরার অনুমতি নিতে হবে। এই চমৎকার নয়ন জুড়ান উটটিকে তিনি তাঁর আপন জনকে খুশীমত দান করে জনসাধারণের কাছে অবিশ্বাসী হয়েছেন। সুতরাং আমরা তাঁর সিদ্ধান্ত খারিজ করলাম।" অতঃপর তিনি অন্যান্য সকলকে নিয়ে উটটিকে জবেহ করলেন। এবং তার গোস্ত সকল গরীব জনসাধারণের

মধ্যে নিজ হাতে বিতরণ করে দিলেন। এ কথাটি সারা মদীনাতে রাষ্ট্র হযে গেল। খলিফা নীরব থাকলেন। সকলেই বুঝল—এই রাষ্ট্রে খেলাফত আইন-কানুন বলে আর কিছুই নাই। খলিফা ওমরের সময় সমগ্র আরব জাহান একত্র হলেও এরূপ একটি কাজ করতে পারতেন না। এইভাবে খোদ রাজধানীতেই খোদ মজলিশে শুরার সভাপতি কর্তৃক বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিপ্লব ও বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করল। কোথায় খলিফা, কোথায় খেলাফত!

হযরত আলী ও খলিফার কথোপকথন :

হযরত আলী : এই ঘটনা সমগ্র মদীনাবাসীকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যে আইন ও শাসন, নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খলা বলতে আর কিছু বাকি নাই। মদীনার কিছু প্রবীণ সাহাবা দারুণ উদ্বেগেব সাথে হযরত আলীকে অনুরোধ করলেন—তিনি যেন অতি সত্বর খলিফার সাথে দেশের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা করেন। হযরত আলী সেই মত খলিফার সমীপে গমন করলেন। এবং খলিফাকে জানালেন—"আমাকে মদীনাবাসীগণ অনুরোধ করেছেন—আপনার সাথে দেশের আইন-শৃঙ্খলা ব্যাপারে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে আসাব জন্য। কিন্তু আমি আপনাকে কি বলবো। আপনি সবই জানেন। আপনি প্রবীণ সাহাবী রসুলের জামাতা। দেশে যা ঘটছে, তা আপনি জানেন, এবং যা ঘটবে তাও আপনি বুঝেন। তবুও আমার জিজ্ঞাসা–আপনি কেন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছেন ? আপনি তো জানেন—একবার রক্তপাত আরম্ভ হলে, তা আর বন্ধ হবে না। একবাব আইনের শাসন শিথিল হলে তা আর সবল হবে না। ন্যাযের শাসন যদি বিলুপ্ত হয়, তাহলে তার স্থান দখল করবে---অন্যায়, অবিচাব, অবিশ্বাস, বিশ্বাসঘাতকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ইত্যাদি। হযরত আলী সরাসরি না বললেও পরোক্ষভাবে খলিফাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন তাঁর নিয়োজিত প্রশাসকদের অবিচার অত্যাচাব দুর্নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে।

অতঃপর খলিফা বললেন—"হযবত আলীর মত ব্যক্তি যাঁরা এই রাষ্ট্রের স্তম্ভস্বরূপ, তাঁরা আমার সাথে সহযোগিতা করছেন না। আমি জনসাধারণের ক্ষোভ নিবারণেব যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তুমি যাঁদের সম্পর্কে বলছো, তাঁরা (মুযাবিয়া---মুগিরা—ইবনে আমির) তো অনেকে স্বয়ং খলিফা ওমর কর্তৃক নিযুক্ত হযেছিলেন।" এবার আলী উত্তব দিলেন—"মদীনাবাসীগণ তাঁদের নিযুক্তি নিযে কোন কথা তুলতে চান না। তাঁদের বরখাস্তও করতে বলেন না। তাঁবা বলেন—খলিফার গভর্ণবগণ দেশ শাসন কবছেন। কিন্তু খলিফা

কেন তাঁদের শাসন করছেন না? তাঁরাই তো অত্যাচারী হয়ে উঠেছেন, তা হলে তাঁরা কি করে অত্যাচার দমন করবেন। তাঁরাই তো আজ পাপাচারী, অমিতব্যয়ী, উচ্ছৃঙ্খল। মদীনাবাসীদের অভিযোগ—আপনি আপনার বহু অপদার্থ অযোগ্য আত্মীয়কে বড় বড় পদে বসিয়েছেন, এবং আত্মীয়, অনাত্মীয় কোন শাসকেরই উপর আপনার এতটুকুও শাসন নাই। তাই এই বিশৃঙ্খলা। আপনি শুনেও শুনেন না, দেখেও দেখেন না। অথচ আপনি খলিফা।''

খলিফার ভাষণ জনসাধারণের নিকট :

আলী জনগণের পক্ষ হতে গিয়েছিলেন, তাই খলিফা জনগণকেই উত্তর দেওয়ার জন্যই মসজিদে নববীতে নামাযের পর মিম্বরে দাঁড়ালেন। এবং বললেন—''হে ভাই সকল। তোমরা আজ খলিফার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছ। খলিফার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নিন্দা করছ। এবং এমন কতকগুলো মানুষের অনুসরণ করছো, যাঁদের কাজই হচ্ছে খলিফার কলঙ্ক রটনা, তাঁর ভাল কাজগুলোকে চেপে মন্দ কাজ তুলে ধরা। খলিফার সকল গুণকে বেমালুম উড়িয়ে দিয়ে দোষগুলোকে দেদার ভাবে প্রচার করা। তোমরা এমন কতকগুলো কাজের জন্য আমাকে দোষারোপ করছ, যেগুলো তোমরা খলিফা ওমরের সময় হাসিমুখে মেনে নিয়েছিলে। তিনি তোমাদের গালাগালি করতেন, বেত্রাঘাত করতেন। আর আমি তোমাদের কোনদিন গালাগালি ও বেত্রাঘাত তো বহু দূরের কথা, একটু কর্কশ কথার দ্বারাও তোমাদের মনে কষ্ট দিইনি। আর তোমরা আজ আমারই বিরুদ্ধে মাথা তুলে যার যা ইচ্ছা, সে তাই বলছো। আমি তোমাদের মনে কষ্ট দিইনি, কিন্তু আজ কি তোমরা আমার মনে কষ্ট দিচ্ছ না? তোমরাই বলো—আজ পর্যন্ত আমি কত মানুষের কত উপকার করেছি। তোমরাই বলো—আজ পর্যন্ত আমি ব্যক্তিগতভাবে কোন মানুষের কোন ক্ষতি করেছি কি?''

খলিফার এই মর্মস্পর্শী বক্তব্য রাখার পর সমস্ত বিষধর সর্পের ফণা যেন ক্ষণিকের মধ্যে কোন এক মায়ামন্ত্রে মাটিতে মিশে গেল। কিন্তু আপসোস খলিফার দুর্ভাগ্যের ফণা যেন মাটিতে ঠেকল না। হঠাৎ মারওয়ান অতি উচ্চস্বরে বলে উঠলেন—''এর পরও যদি তোমরা খলিফার বিরোধিতা করো, তা হলে তরবারি তোমাদের শিক্ষা দেবে।'' মন্ত্রী মারওয়ানের এই একটি কথাতেই খলিফার সব বক্তৃতা পণ্ড হয়ে গেল। সমবেত মানুষ আবার যেন উত্তাল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে খলিফা মারওয়ানকে জোর ধমক দিয়ে বললেন—'চুপ কর, তুমি কথা বলার কে? তোমাকে কি আমি চুপ থাকতে নির্দেশ দিই

নি।" অতঃপর খলিফা মসজিদ ত্যাগ করলেন। কিন্তু শেষাবধি জনগণের অসন্তোষ, জনরোষ জনগণকে ত্যাগ করল বলে মনে হলো না।

এটা ছিল হিজরীর ৩৫ সন। খেলাফতের এগার বছর হজের মৌসুম আগতপ্রায়। খলিফা অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও পবিত্র হজ উদযাপন করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলেন। এটাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ হজের শেষ প্রস্তুতি। কোন মানুষই জানে না, কখন কার শেষ। কোরআন-সূরা লোকমান—৩১ : ৩৪।

দুর্ভাগ্যের দুটো পূর্বাভাষ :

মহানবী মদীনায় গমন করলেন। অতঃপর ইসলামের বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হলো। ঐ সময় মহানবী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি হতে বহু রাজ রাজড়াকে ইসলামের আমন্ত্রণ জানানর জন্য পত্র দিতেন। সেই পত্রগুলো সীলমোহর করার জন্য একটি রূপার অঙ্গুরী তৈরি করেন। যাতে তিনটি শব্দ ছিল—"মুহম্মাদুর রসুলুল্লাহ" অর্থাৎ মহম্মদ আল্লাহর রসুল। মহানবীর পর দুই খলিফা এটিকে সীলমোহরের কাজে ব্যবহার করেন। তবে হাতেও দিতেন।

খলিফা ওসমানের আজীবন নেশা দান খয়রাত করা। আরবে চিরদিন পানির অভাব। খলিফা তাই আপন স্বভাব বশতও নানা স্থানে কূপ খনন করাতেন। একবার মদীনার দু মাইল দূরে আরিশ নামক একটি গ্রামে কূপ খনন করাচ্ছিলেন। শ্রমিকদের নিজ হাতে কাজ দেখাতে গিয়ে হঠাৎ হাতের ঐ অঙ্গুরীটি কূপে পড়ে যায়। খলিফা ওটিকে উদ্ধার করার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। ফল হলো না। তখন কূপের সমুদয় পানি তোলার নির্দেশ দিলেন, পানি কয়েক জনের সাথে নিজে পরীক্ষা করতে থাকলেন। কাজ হলো না। তখন কাদা পর্যন্ত তোলার নির্দেশ দিলেন। বহুজনের সাথে নিজেও কাদা পরীক্ষা করলেন। তাতেও কোন কাজ হলো না। খলিফা নিরূপায় হয়েই অত্যন্ত বিষণ্ন চিত্তে বসে পড়লেন। এই অঙ্গুরীটির জন্য তাঁর দুঃখের কোন সীমা থাকল না। তিনি দিনের পর দিন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়তে থাকলেন। তাঁর মনে হতে থাকল—কোথায় কোন দুর্ভাগ্য-অভিশাপ তাঁকে যেন গ্রাস করতে বসেছে। মানুষের যখন দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসে, তখন ভুলও অনেক হতে থাকে। বিভ্রাটও বহু ঘটতে থাকে। এরূপ নানা দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা খলিফাকে যেন পেয়ে বসল। কথাটা সারা আরবে জানাজানি হলো।

অতঃপর খলিফাকে এই নিরাশা ও হতাশাগ্রস্ততা থেকে বাঁচাবার জন্য প্রবীণ সাহাবা আব্দুর রহমান বিন আউফ, যাঁর সভাপতিত্বে একদিন তিনি খেলাফতের ভার গ্রহণ করেছিলেন, খলিফাকে পরামর্শ দিলেন—দ্বিতীয় একটি অঙ্গুরী তৈরি করতে। খলিফা তাঁর পরামর্শ মত তাই করলেন। এটা ছিল তাঁর খেলাফতের সপ্তম বর্ষ অর্থাৎ মধ্য গগন। যশ-মান-খ্যাতি তখন তাঁর তুঙ্গে। অঙ্গুরীটি হারানর পরই তিনি যেন বুঝতে পারলেন—আজ তাঁর জীবনে যশ-মান-খ্যাতির সূর্য জীবনাকাশের মধ্য গগন হতে ঢলে পড়লো। তাঁর এই ধারণা তাঁর জীবনে সত্যে পরিণত হয়েছিল।

খেলাফতের দ্বাদশ বর্ষে যখন তাঁর ভাগ্যাকাশে ঘনঘোর কালো মেঘে পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠল, যখন চারিদিকে বিপ্লবের বন্যা প্রবল বেগে ধাবিত, যখন বিদ্রোহ তার সকল বাঁধ অতিক্রম করে রাজধানীকেও গ্রাস করে ফেলেছে, হেনকালে হঠাৎ শুনতে পেলেন চিরহিতাকাঙ্ক্ষী মহানবীর প্রবীণতম সাহাবা হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ আর নাই। খলিফা সব দিক থেকে যেন ভেঙ্গে পড়লেন। আজ কে তাঁকে সতর্কবাণী শোনাবে, কে তাঁকে সংশোধন করবে, কে তাঁকে ভর্ৎসনা করবেন। শুরা আজ তার প্রাণ-পুরুষকে হারাল। খলিফা হারালেন তাঁর নাড়ীর বন্ধন ও প্রাণ-স্পন্দন। সেদিনের অঙ্গুরী হারানতে বুঝতে পেরেছিলেন সৌভাগ্য সূর্য মধ্য গগন অতিক্রম করল। আজ আবার অত্যন্ত বেদনার সাথে বুঝতে পারলেন—সৌভাগ্য সূর্যের অস্তগমনে আর দেরি নাই। কুলক্ষণের ফুল কুক্ষণেই ফুটে উঠে। সৌভাগ্যের সূর্য সুসময়েই উদিত হয়।

গুপ্তচর প্রেরিত :

আব্দুর রহমান বিন আউফ যতদিন বেঁচে ছিলেন, শহরে আর যাই হোক, প্রকাশ্যে কোন বিপ্লব বা বিদ্রোহ দেখা দেয়নি। যে যা করত অতি গোপনে। তাঁর তিরোধানের পর আর কোন গোপন কিছু থাকল না। ষড়যন্ত্রকারীরা প্রকাশ্যে জটলা করতে আরম্ভ করলো। তাদের কথা সারা দেশে প্রচার হতে থাকল। মদীনা সমগ্র দেশকে রক্ষা করবে কি, দেশই চিন্তা করতে থাকলো মদীনাকে কিভাবে রক্ষা করা যায়। এইভাবে সারা দেশ জুড়ে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ গড়ে উঠল। সমগ্র দেশবাসী উৎসুক হয়ে পড়ল—মদীনায় কি ঘটছে, কি ঘটবে, কি ঘটতে চলেছে। এই অবস্থাতে মদীনার বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি খলিফাকে পরামর্শ দিলেন—বসবা, কুফা, মিশব ও সিবিয়াব বর্তমান

প্রকৃত পরিস্থিতি কি চলছে, তা জানার জন্য কয়েক জন গুপ্তচর পাঠান প্রয়োজন। খলিফা তাঁদের পরামর্শ মত চারজন গুপ্তচর চার স্থানে পাঠালেন—বসরা—আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর, কুফা—উসামা ইবনে যায়েদ, মিশর—আম্মার, সিরিয়া—মহম্মদ ইবনে মুসলামা।

একমাত্র মিশরের দূত আম্মার ব্যতীত সকলেই ফিরে এসে ভালই রিপোর্ট দিলেন। দেশে কোথাও কোন বিপ্লব বা বিদ্রোহ নাই। আম্মার মিশরীয় বিদ্রোহীগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হন। অতঃপর খলিফা দেশের সকল গভর্ণরকে একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানিয়ে দিলেন—"অন্যান্য বারের মত এবারও হজের পর মদীনাতে সকল গভর্ণরদের নিয়ে একটি প্রকাশ্য সম্মেলন হবে। ঐ সম্মেলনে জনসাধারণ যার যা বলার আছে সে প্রকাশ্যভাবে বলবে, এবং কোথাও কোন অন্যায় অবিচার হতে থাকলে তার আশু প্রতিকার করা হবে। এমনকি খলিফার বিরুদ্ধেও যদি কোন অভিযোগ থাকে তাও তোলা হবে, এবং তার যথাযথ মীমাংসা করা হবে, যদি কোন অভিযোগ না থাকে, বা অভিযোগ থাকলে, তা প্রমাণ অভাবে নাকচ হয়, তা হলে খলিফার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অপবাদ দেওয়া হচ্ছে, তা প্রত্যাহার করতে হবে।"

গভর্ণর সম্মেলন :

পবিত্র হজ শেষ হল। সকল গভর্ণর মদীনাতে খলিফার আম দরবারে একত্রিত হলেন। খলিফা তাঁদের বললেন—"হে আমার প্রিয় আমিরগণ! আমি আপনাদের সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট হতে নানা অভিযোগ শুনছি। আমাব মনে হচ্ছে—আপনাদের মধ্যে কিছু ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। এবং সেরূপ কিছু হলে, তার জন্য আমিই দায়ী হবো। কেননা আপনাবা আমার প্রতিনিধি।" আমিরগণের উত্তর—"আপনাব গুপ্তচবগণ বিভিন্ন স্থানে গিয়েছিলেন। তাঁবা কোথাও দোষের কিছু পাননি। তা হলে আমাদের দোষ কোথায়।" অতঃপব খলিফা বললেন—"এই অবস্থায় আমি কি করতে পারি?" তখন আমিরগণ আপন আপন মতামত দিলেন—

সা'দ বিন আবি ওক্কাস: "যারা অন্ধকারে অকাবণে জনসাধারণকে নানা মিথ্যা কথায় নাচাচ্ছে, তাদের কঠোব শাস্তি দেওযা হোক. তাহলে বিদ্রোহ থেমে যাবে।"

আমির মুয়াবিয়া: সিরিয়াতে কোন বিদ্রোহী নাই। আমাব বিশ্বাস অন্যানা প্রদেশেও তাই হবে যদি জনগণ ন্যায বিচাব পায় এবং শাসন কঠোবভাবে চলতে থাকে।

আব্দুল্লাহ বিন আমীর: "চঞ্চল, অস্থির মতি, অশান্ত মানুষগুলোকে যুদ্ধে পাঠান হোক। তারা খুশী হবে, দেশও শান্ত থাকবে।"

সাঈদ ইবনে আল্ আ'স্ : "যারা রাজভক্ত তাদের বার্ষিক বৃত্তি বাড়ান হোক, এবং অবাধ্যদের কমান হোক"।

জনগণের পক্ষে আমর ইবনুল-আ'স: তিনি খলিফার দুর্বলতার জন্য খলিফাকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করলেন, এবং সব কিছুর জন্য তাঁকেই দায়ী করলেন। এইভাবে নানাজনে নানা কথা বলতে থাকলেন। সর্বশেষ কথা উঠল—"আমিরগণ তাঁদের আচরণের সংশোধন করুন, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

খলিফা : "জনগণের সাথে জুলুম ও কঠোরতা করা যাবে না। আমি কোন অবস্থাতেই এটা বরদাস্ত করবো না। তারপরও দেশে যদি বিপ্লব ও বিদ্রোহ হয় কেউ আমাকে দায়ী করতে পারবে না।" সবশেষে খলিফা সকল আমিরকে বললেন—"তাঁরা কোরআন-হাদিস অনুযায়ী কাজ করবেন, এবং আপন আপন বিবেকের প্রয়োগ করবেন, যেন প্রজাসাধারণের কোন ক্ষতি না হয়, তারা কোন কষ্ট না পায়, দুঃখ না পায়।"

খলিফা ও আমির মুয়াবিয়া :

আমির মুয়াবিয়া তাঁর বিদায়কালে গতানুগতিক সভা শেষ করে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব খলিফাকে দিলেন বিবেচনা করার জন্য।

আমির : "আপনি এই বিপদসংকুল অবস্থাতে সিরিয়া চলুন, সেখান হতে শাসনকার্য চালাতে পারবেন। এখানে আপনাকে কেউ রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে পারবে না, কিন্তু ওখানে বহু লোক আছে, যারা এ দায়িত্বটি খুব ভালভাবেই পালন করতে পারবে।"

খলিফা : "আমি আমার মসনদের জন্য এতটুকুও চিন্তিত নই, মসনদ আমার নিকট কিছুই না। যে শহর একদিন দ্বীনের নবীকে আশ্রয় দিয়েছিল, যে শহরে নবীর পবিত্র দেহ মুবারক শায়িত আছে—আমি আমার প্রাণ রক্ষার জন্য কোন অবস্থাতেই ঐ শহর ছাড়তে প্রস্তুত নই।"

আমির : "তা হলে অনুমতি দেন, আমি একদল যোগ্য ও বিশ্বস্ত দেহরক্ষী পাঠিয়ে দিই। যারা আপনার দেহকে রক্ষা করবে।"

খলিফা : "তা হয় না। আমার দেহ রক্ষার জন্য কোন সেনাবাহিনীকে এখানে স্থান দিলে এখানকার স্থানীয় মানুষের প্রতি অত্যাচার

হতে পারে, এমনকি নবীর রওজা শরীফেরও অসম্মান হতে পারে। তাই ও কাজ করা যাবে না।"

আমির : "তা হলে পরিণামে আপনার ধ্বংস ব্যতীত আর কিছু তো দেখছি না।"

খলিফা : "এ অবস্থায় আল্লাহই আমার রক্ষক, তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট।"

আমির : "বিদায়, আপনার মঙ্গল হোক"। বলে আমিরের প্রস্থান। অতঃপর আমিরের সাথে খলিফার আর সাক্ষাৎ হয়নি। বিচক্ষণ আমিব মুয়াবিয়া বুঝতে পেরেছিলেন—কি ঘটতে চলল, পরিণাম কত ভয়াবহ হতে চলল। দূরদর্শী আমির কোন পরামর্শই অসঙ্গত দেননি, সবই ছিল অত্যন্ত যুক্তিসংগত। খলিফা ভাবাবেগে ভেসে গেলেন।

আমির মুয়াবিয়া ও হযরত আলী :

আমির মুয়াবিয়া যখন সিরিয়ার পথে চলছেন, হঠাৎ পথিমধ্যে হযরত আলী ও যুবাইরের সাথে দেখা। সামান্য ক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁদের বললেন—"তোমরা কি আবার সেই অন্ধকার যুগে ফিরে যাচ্ছ। আমি অসহায় খলিফাকে তোমাদের হাতে সঁপে দিলাম। তোমরা তাঁকে সাহায্য কর। আল্লাহ মযলুম ও দুর্বলের পক্ষে শক্তিশালী প্রতিকার গ্রহণকারী। তোমরা খলিফাকে রক্ষা কর। ইহা তোমাদের জন্য, সবার জন্য কল্যাণকর, ভাল কাজ। তোমরা শান্তিতে থাক। বিদায়—বিদায়।"

হঃ আলী : "আমাদের সাধ্যমত তাই করতে হবে, যা আমির বললেন।"

হঃ যুবাইর : "আল্লাহর কসম; সত্যই তোমার উপর ও আমার উপর ওসমানের রক্ষা করা অপেক্ষা কঠিন দায়িত্ব আর কখনও চাপে নাই।"

খলিফা মদীনায় গৃহবন্দী

বিদ্রোহীদের প্রথম সম্মেলন :

খলিফা যখন দেশের গভর্ণর বা আমিরগণকে নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত, যখন তিনি দেশে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে আলোচনা রত, যখন তিনি পরিস্থিতি নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন ঠিক সেই সময় সুযোগ বুঝে কুফা-বসরা

ও মিশরের বিদ্রোহীগণ একত্রিত হলো, কি করে তারা তাদের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। কারণ ঐ সময় কোন আমিরই প্রদেশে ছিলেন না। তারা খোলা মাঠে গোল দিতে পেরেছিল। তাদের আলোচনায় সিদ্ধান্ত হলো যে, তারা বিভিন্ন কেন্দ্র হতে মদীনাতে সমবেত হবে। এবং একটি মজবুত শক্তিশালী দল গঠন করবে, যারা মদীনাবাসীদের পরোয়া করবে না, যাদের মদীনাবাসীগণ ভয়ের চোখে দেখবে। তারা একযোগে খলিফার প্রাসাদ অবরোধ করবে, এবং খলিফার নিকট তাদের দাবী-দাওয়াগুলো পেশ করবে। তাদের দাবী ছিল মূলত একটিই—কিছু কিছু আমিরের পদচ্যুতি—কুফা, বসরা, সিরিয়া ও মিশর প্রধান। খলিফা এটা করতে সম্মত না হলে তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে, এবং তিনি যদি পদত্যাগ করতেও সম্মত না হন, তা হলে তারা তরবারির সাহায্যে তাদের দাবী পূরণ করবে।

সর্বশেষ তাদের মধ্যে কথা উঠল—যদি তরবারির সাহায্যেই তাদের দাবী পূরণ হয়, তাহলে পরবর্তী খলিফা কে হবেন। কুফাবাসীদের প্রার্থী ছিলেন—যুবাইর, বসরার ছিলেন তালহা, মিশরের ছিলেন হযরত আলী। এই আলোচনা যখন চলছে তখনই খলিফার আম দরবারের সভা শেষ করে আমিরগণ আপন আপন দেশে ফিরলেন। বিদ্রোহীগণ তখন আর নিশ্চিন্তে ও নিরিবিলিতে আলোচনা চালাতে পারল না। কিন্তু ভাবী খলিফা সম্পর্কে তাদের শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বেই সভা মুলতুবি হয়ে গেল। কাজ আবার গোপনে আরম্ভ হলো। বছর শেষ হলো এখানেই।

আমরা এখানে একটা জিনিস পেলাম—বিদ্রোহীদের সামনে ছিলেন তিনজন জননেতা পছন্দসই। খলিফা যদি এই তিনজনকে আলোচনার পথে আনতে পারতেন, তাহলে বিদ্রোহের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত। কিন্তু খলিফা মন্ত্রী মারওয়ান ও দু-একজন আমিরের চাপে তা পারলেন না। ফলে মাত্র এই কয়েকজনের ঝগড়া সারা দেশের ঝগড়াতে রূপ নিল। যার একদিকে ছিলেন—কুফা-বসরা-সিরিয়া ও মিশরের আমির, এবং এই চারজনের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মন্ত্রী মারওয়ান, এবং অন্য প্রান্তে ছিলেন—হযরত আলী তালহা ও যুবাইর প্রমুখ ব্যক্তিগণ, মাঝখানে ছিলেন—খালিফা ওসমান।

নূতন বছরে নূতন ঝামেলা :

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি—খলিফা ওসমান তাঁর মন্ত্রী মারওয়ানের পরামর্শ মত মহান আবুযার গিফারীকে নির্জন মরুভূমিতে রাবযা নামক অঞ্চলে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিলেন। মন্ত্রী মারওয়ান চেয়েছিলেন—ঐ আপদ্টা

ঐখানেই শেষ হয়ে যাক সত্বর। তিনি চিন্তাও করতে পারেন নি যে, তিনি যত সত্বর শেষ হবেন, তত সত্বরই তাঁরও ভাগ্যদীপ নিভে আসবে, মন্ত্রী বুঝতে চেষ্টা করেন নি—মরুঝড় কত বেগবান হবে, এবং কত বেগবান হতে পারে। মন্ত্রী বুঝেও বুঝেন নি—কোন মহামানবই মরেণ না। তাঁরা জীবন্তাবস্থায় যত সক্রিয়, মরণে তাঁরা আরো সমধিক সক্রিয়। মহান আবুযাব গিফারী এ বিষাক্ত মরু অঞ্চলে অনাহারে অযত্নে অনিদ্রায় অভাবে অনটনে মৃত্যুব কোলে ঢলে পড়লেন। সমগ্র মনুষ্য সমাজের দরিদ্র মানুষ হারাল তাদের দরদী মানুষটিকে। যখনই মহান গিফারীর অপমৃত্যুর কথা আরব জাহানে ছড়িয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আরব দুনিয়া খলিফাকে জানাল ধিক্কার, আরবেব এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দরিদ্র মানুষ দলে দলে একত্রিত হলো খলিফার নিকট তাঁর অপমৃত্যুর কৈফিয়ত চাইতে। আরব আবার উত্তাল তরঙ্গে নেচে উঠার আর একটি চমৎকার উপায় পেল। খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীগণ এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে এতটুকুও ভুল করেনি।

দ্বিতীয় ঝামেলা : ইতিমধ্যে মিশরের আমির আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি সারাহ্ তাঁর বিরুদ্ধে একজন বক্তব্য রাখায় তিনি তাঁর প্রাণদণ্ড দিলে সমগ্র মিশরে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। এবং এই বিদ্রোহ পার্শ্ববর্তী অন্যান্য প্রদেশেও বিস্তার লাভ করে। আমিরের বিরুদ্ধে নানা সত্য মিথ্যা জনস্রোতে গতি লাভ করে। ফলে কুফা-বসরা, ইরাক ও মিশরের বিদ্রোহীগণ সমবেত হওয়াব বিরাট সুযোগ হাতে পেয়ে যায়। এককথায় বিদ্রোহের দাবানল যেন সর্বত্র জ্বলে উঠল। বিদ্রোহীগণ সুযোগ নিল।

নববর্ষে বিদ্রোহের নূতন পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ :

ইসলামের ইতিহাসে মর্মান্তিক সন ৩৬ হিজরী। খলিফা ওসমানের জীবনের চরম বেদনাদায়ক বছর। খেলাফতের মহাসংকট কাল। চরম অশান্তির সূচনা ও আরম্ভ কাল। ৩৬ হিজরী ইসলামের ইতিহাসের কলঙ্ক ও কালিমার যুগ। নূতন বছরে কয়েক মাস অতিবাহিত হয়েছে। বিদ্রোহীগণ গোপন পরামর্শে মত্ত হলো। তারা ঠিক করলো—কোন এক অছিলায় সকলকে মদীনায় হাজিব হতে হবে। কেউ যেন বুঝতে না পারে কি জন্য। তাই তারা ঠিক করলো—আগামী হজের তিন মাস পূর্বে তারা 'উমারাহ্' (ছোট অসামরিক) হজ উদযাপন করার নামে সকলেই মদীনাতে একত্রিত হবে। তাহলে মদীনাবাসীগণ বাধা দেবে না। খলিফাও ভুল বুঝবেন না। এবং মওকা বুঝে

তারা তাদের কাজ হাসিল করবে। এইভাবে তাদের গোপন পরামর্শ পাকা-পোক্ত হয়ে গেল।

এই বিপ্লবী ও বিদ্রোহীদের কাজে একটা সুর লক্ষ্য করা যাচ্ছিল যে, তারা সকলেই তাদের মতে ও পথে ছিল একেবারেই এক। অনেক সময় মতে মিল থাকলেও পথে মিল না থাকায় কার্য সিদ্ধিলাভ করে না। কিন্তু এরা মতে ও পথে এক ছিল। তাই তারা আপাত সিদ্ধিলাভও করেছিল। পরে কালক্রমে ঐ আমির মুয়াবিয়ার হাতেই কম শাস্তি তাদের পেতে হয়নি। কেননা তারা খলিফা নির্বাচনে তাদের মত ও পথ এক রাখতে পারেনি। এবং এটিই ছিল মূল কাজ, মূল লক্ষ্য। ওখানে তারা লক্ষ্যচ্যুত হয়েছিল।

মিশর হস্তচ্যুত : মিশরের আমির তাঁর গুপ্তচর মারফত বিদ্রোহীদের গোপন পরামর্শ জানতে পেরে কালবিলম্ব না করেই খলিফাকে জানালেন। খলিফা এই সংবাদ পাওয়ার পর আমিরকে নির্দেশ দিলেন—বিদ্রোহীগণকে মিশরেই আটকাতে। তারা যেন মদীনা যাত্রা করতে না পারে। খলিফার নির্দেশ আমিরের নিকট পৌঁছাবার পূর্বেই পাখী খাঁচা ছাড়া হয়ে গেছে। বিদ্রোহীগণ তখন মিশর হতে বহুদূরে। আমির নিরুপায়। অধিকন্তু আমির যে প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন তার জন্য সমগ্র মিশরবাসী আজ আমিরের প্রাণ নাশের হুমকি দিলে আমির প্রাণ-ভয়ে প্যালেস্টাইনে আশ্রয় নিলেন। মিশর আজ বিপ্লবী ও বিদ্রোহীদের কবলে। আজ তারাই মিশরের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। এই প্রথম একটি প্রদেশ (মিশর) খলিফার হস্তচ্যুত হলো।

খলিফার ভাষণ : খলিফা গোপনে বিদ্রোহীগণের মদীনা আগমনের সংবাদ জানতে পেরে মসজিদে-নববীতে সকলকে আহ্বান জানালেন। সমবেত জনমণ্ডলীর সামনে খলিফা মিম্বরে উঠে আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন।

"বিদ্রোহীদের অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে। তোমরা সত্বর লক্ষ্য করবে আমার উপর কি ভয়ংকর বিপদ নেমে আসবে। তোমরা নিশ্চয়ই আশা করবে যাতে এই বিপদ বিলম্বিত ও বাধাপ্রাপ্ত হয়। কেননা তোমরা বুঝতে পারছ, এর পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। শহরে দিবা-রাত্র হৈ হট্টগোল-বিশৃঙ্খলা, কলরব-কলহ, অশান্তি আন্দোলন চলবে, শাসন-ব্যবস্থাও একেবারেই শূন্য হবে, বিপ্লবের জন্য বিদ্রোহীদের দ্বারা পবিত্র মদীনাতে রক্তস্রোত বইবে। আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘিত হয়ে অধর্ম ধর্মকে গ্রাস করবে। নবীজীর শান্তির শহর মদীনা অশান্তিতে ভরে উঠবে।"

খলিফার মর্মস্পর্শী ভাষণে মদীনার মানুষ জাগরিত হল। যেমন জাগরিত হয়েছিল খলিফা আবুবকরের সময়ে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে। সকলেই তৈরি হলো বিদ্রোহীগণকে ঠেকিয়ে দিতে। তখনও বিদ্রোহীগণ মদীনার বাইরে তিনটি শিবিরে বিভক্ত—কুফা, বসরা ও মিশর।

বিদ্রোহীগণের ছলনা :

বিদ্রোহীগণ অবস্থা অনুকূল না দেখে নিজদের সিদ্ধান্ত আপাত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল। ছলনার আশ্রয়ে নবী পত্নী ও শহরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রতিনিধি পাঠিয়ে বলতে লাগল যে, তারা নবীজীর রওজা শরীফ যিয়ারত করবে ও খলিফাকে তাদের অভিযোগ পত্রটি দেবে। সুতরাং তাদের মদীনাতে ঢুকতে দেওয়া হোক। খলিফা তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করে জানিয়ে দিলেন—তিনি তাদের দাবীগুলোর কথা বিবেচনা করবেন।

এবার বিদ্রোহীগণ আপন আপন মনোনীত ব্যক্তিদের নিকট লোক পাঠালেন তাঁদের মতামত জানতে। প্রথমেই মিশরবাসীগণ হযরত আলীর নিকট লোক পাঠালেন—তাঁর মতামত জানার জন্য। হযরত আলী তাদের অত্যন্ত কড়া উত্তর দিলেন—"তোমরা রাজদ্রোহী, তোমরা বিদ্রোহী, ইসলামে বিদ্রোহের কোনই স্থান নাই, তোমরা নবীর অভিশপ্ত।" তালহা ও যুবাইর প্রায় একই উত্তর দিয়েছিলেন।

অতঃপর বিদ্রোহীগণ গোপন পরামর্শে স্থির করল, এবার এইভাবে তারা কৃতকার্য হতে পারবে না। মদীনাবাসীদের চোখে ধুলো দিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করতে হবে, এই তারা স্থির করলো। অতঃপর হঠাৎ ঘোষণা করল—তারা খলিফার কথাতে খুশী, যেহেতু খলিফা কথা দিয়েছেন তাদের কথাগুলো বিবেচনা করবেন। তারা এখন আপন আপন দেশে ফিরে চলল। এইভাবে বিদ্রোহীগণ আস্তানা ছেড়ে চলে গেল। মদীনাবাসীগণ এখন সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁরা ভাবলেন মদীনার আকাশে মেঘ কেটে গেল। খলিফাও কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। তিনি আবার নিয়মিতভাবে মসজিদে নববীতে নামায পড়তে ও পড়াতে থাকলেন।

ঐতিহাসিক পত্র :

বিদ্রোহীগণ মদীনা ত্যাগের কয়েকদিনের মধ্যেই আবার মদীনার উপকণ্ঠে সকলেই হাজির। মদীনাবাসীগণ আশ্চর্য। খলিফা অবাক। বিদ্রোহীগণ

আহ্লাদিত। এর কারণ জানতে মদীনার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হযরত আলীকে নেতারূপে মনোনীত করে তাদের নিকট গমন করলেন। তাঁরা বললেন ও দেখালেন একটি পত্র। পত্রটি খলিফার নামে সীলমোহর অঙ্কিত ছিল। পত্রটির বাহক ছিল খলিফার একজন ভৃত্য। পত্রটি দেওয়া হয়েছিল—মিশরের আমিরকে। পত্রের মধ্যে লেখা ছিল—"বিদ্রোহীগণ ফিরে গেলে ওদের ধরবে, মারবে, কারাগারে ভরবে, এবং বদমায়েসের ধাড়ীগুলোকে কতল করবে।"

হযরত আলী তাদের প্রশ্ন করলেন—"এই সংবাদ তোমরা পেলে, কিন্তু বসরা ও কুফাবাসীগণ কি করে এই সংবাদ এত সত্বর পেয়ে তোমাদের সাথে মিলিত হলো ? এটা তো একটা ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনা বলে মনে হচ্ছে।" তারা বলল—"আপনি চিঠি দেখুন এবং খলিফার চাকরকেও দেখান।"

হযরত আলী খলিফার নিকট গমন করত তাঁকে সমস্ত কথা জানালেন। তিনি বললেন—"এ ব্যাপারে তাঁর কিছু জানা নাই।" তবে কিনারা করার জন্য তিনি বিদ্রোহীদের দু-একজন নেতার সাথে কথা বলতে রাজী হলে হযরত আলী তাদের নিয়ে খলিফার সমীপে উপস্থিত হলে বিদ্রোহীগণ চরম বেয়াদবী বশত খলিফাকে 'সালাম'টুকু পর্যন্ত জানাল না। অধিকন্তু প্রথমেই উদ্ধত ভাব দেখাল। এতে বীর আলী বিব্রত বোধ করলেন এবং বিদ্রোহীদের অসৌজন্যমূলক ব্যবহারে বিরক্তও হলেন। বিদ্রোহীগণ খলিফাকে বলল—"আপনি আমাদের ওয়াদা দিয়েছিলেন যে, আপনি আমাদের অভিযোগগুলো সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করবেন। কিন্তু তা না করে বরং তার পরিবর্তে আপনি আমাদের প্রাণদণ্ডের ফরমান লিখিতভাবে আপন ভৃত্য দ্বারা পাঠিয়েছেন। কেন জানতে চাই। আপনি আপনার চিঠি দেখুন।"

এর উত্তরে খলিফা বললেন—"আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানি না।" তখন বিদ্রোহীগণ বলল—"তবে বলুন, কে এই পত্র লিখেছে।" খলিফা আবার বললেন—"তাও আমি জানি না।" তখন বিদ্রোহীগণ বলল—"আপনার কথা সত্য হলেও আপনি এখন খলিফা পদের অযোগ্য। কেননা কথা ভঙ্গ করেছেন, আর মিথ্যা হলেও আপনি অযোগ্য। কেননা মিথ্যাবাদী খলিফার অযোগ্য। অতএব আপনি পদত্যাগ করুন, কিংবা প্রাণত্যাগ করুন। আমরা এই দুটোর যে কোন একটিতে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।"

খলিফা বললেন—"আমি তোমাদের বহুবার বলেছি, আবার বলছি আমার প্রাণরক্ষার জন্য ও আমার গদি রক্ষার জন্য আমার সেনাবাহিনী নয়। তারা

আমার জন্য আমার জাতির সাথে সংগ্রাম করবে, রক্ত ঝরাবে, এ বাসনা ও ইচ্ছাও আমার নাই। তবে আমি তোমাদের নিকট আপন প্রাণের ভয়ে, আল্লাহ্ আমার উপর খেলাফতের যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তাও ত্যাগ করব না।''

প্রচণ্ডভাবে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হলো, প্রবলভাবে বাকবিতণ্ডা চলতে থাকল। কে চিঠি লিখল, কে পাঠাল, এসব গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো চাপা থাকল। এও এক রহস্য। হযরত আলী বিরক্ত হয়ে স্থান ত্যাগ করলেন। এ যাত্রায় বিদ্রোহীরা লাভবান হল। গতবারে মদীনায় পা রাখার স্থান পায় নি। এবার দাঁড়াবার স্থান হলো। কয়েকদিনের মধ্যে বসবারও জায়গা মিলল। খলিফা তখনও যথারীতি মসজিদে যেতেন নামায পড়তে। বিদ্রোহীগণও ঐ একই মসজিদে নামায পড়তে যেতো। আরম্ভ করলো সদাশয় নিরীহ্ খলিফার প্রতি বিদ্রূপবাণ । কখন কিছু ছুঁড়ে দেওয়া, কখন অন্যভাবে অসম্মান করা। এবার কিন্তু মদীনাবাসীগণ ঐ পত্রের ডামাডোলে পূর্বের জোস হারিয়ে ফেলল। বিদ্রোহীগণ ছলে-বলে-কৌশলে এইটাই চেয়েছিল, মদীনাবাসীগণ নীরব থাকুক। পরিণতিতে (এক পত্রে) তাই হলো।

জুম্মার নামাযে আঘাতপ্রাপ্ত খলিফা :

খলিফা জুম্মার নামায শেষ করে যথা নিয়মে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন বিদ্রোহী উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে খলিফাকে সতর্ক বাণী শুনালেন—''খলিফা, আপনি বক্তৃতা দেওয়ার পূর্বে কোরআনের নির্দেশমত জীবন যাপন করুন।'' খলিফা তাকে বসতে বললেন। আবার কিছুক্ষণ পরে একই কথার পুনরাবৃত্তি করল। তখন খলিফা বললেন—''তোমরা কি জান না, মদীনাবাসীগণ তোমাদের নবীর অভিশপ্ত বলে জানে। কেননা তোমরা নবীর খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ। তোমরা এখন অনুতাপ কর তোমাদের আচরণের জন্য, সুকাজ দ্বারা কুকাজের প্রায়শ্চিত্ত কর।''

খলিফার কথায় মসজিদের বহু মুসুল্লী প্রথম দিকে সাড়া দিলেন। বিশেষ করে সাহাবা মুহম্মদ ইবনে আসলাম ও কোরআন সংকলনকারী যায়েদ ইবনে সাবিত খলিফাকে সমর্থন জানিয়ে কিছু বলারও চেষ্টা করলেন। কিন্তু কুফার ঐ হাকিম বিন জাবালা ও মহম্মদ বিন কোতাইবা তাঁদের দু ধমকেই বসিয়ে দিলেন। মসজিদের মধ্যে আরম্ভ হলো মহা হট্টগোল। নিরীহ মুসুল্লীগণ নামায পড়তে এসেছেন, তাঁরা বিদ্রোহ করতে যেমন আসেন নি, তেমনি

বিদ্রোহ বন্ধ করতেও আসেনি। আর বিদ্রোহীরা এসেছিল নামাযের নামে বিদ্রোহ বাধাতে। সামান্য ক্ষণের মধ্যেই বিদ্রোহীগণের প্রচণ্ড প্রতিবাদে মুসুল্লীগণ আপন আপন পথ দেখলেন শান্তির পথে। স্বয়ং খলিফা একটি প্রস্তরাঘাতে পড়ে গেলেন। তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। মসজিদে-নববী আজ প্রকারান্তে বিদ্রোহীদের হাতে চলে গেল। তাদের উদ্দেশ্য সফল হলো। বিদ্রোহীরা এই কাজ করবে বলেই মানসিক প্রস্তুতি সহ এসেছিল। কিন্তু মুসুল্লীগণ নামায পড়তে এসেছিলেন, তাই হেরে গেলেন। খলিফার আঘাত জোর ছিল না, তাই বেঁচে গেলেন। কিন্তু ঐ যে বাড়ি ফিরলেন, আর বের হতে পারেন নি। এদিকেও বিদ্রোহীগণের পদক্ষেপ সফল হলো। এই মসজিদেই খলিফা কর্তৃক আঘাতপ্রাপ্ত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কথা আজ মনে পড়ে।

বিদ্রোহীদের হাতে মসজিদে-নববী :

খলিফা আঘাত পাওয়ার পর অনেকেই তাকে দেখতে গেলেন। হযরত আলীও গেলেন, এবং তাঁর সঙ্গে বেশ কিছু অন্যান্য সাহাবাও গেলেন। হযরত আলীকে দেখা মাত্র মন্ত্রী মারওয়ান মূর্খের মত আরো একটি মহাভুল করলেন—সরাসরি হযরত আলীর মত মানুষকে দোষারোপ করে। হযরত আলীকে অন্যায়ভাবে, মিথ্যাভাবে দোষারোপ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকলেই রাগে-ক্ষোভে ও কঠোর প্রতিবাদে খলিফার ভবন ত্যাগ করলেন। সেখানকার সকলেই সমবেত কণ্ঠে মন্ত্রী মারওয়ানকে মুখের উপর জওয়াব দিলেন—"তোমার মত মানুষের মুখে হযরত আলীর মত মানুষের প্রতি অভিসম্পাত খাটে না। তোমার লোভ, লালসা, কুচিন্তা, কুমন্ত্রণা, অন্যায়, অত্যাচার, পাপাচার আজকের এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী।" আমরা লক্ষ্য করছি কুচক্রী মারওয়ান যখনই যেখানে মুখ খুলেছেন, পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটেছে। আজও তাই হলো। অতি বৃদ্ধ, অতি ভাল মানুষ, অতি দয়াশীল খলিফার কিছুই করার ছিল না। তিনি যেন শুধু নিমিত্তের ভাগী হয়ে দাঁড়ালেন।

বিদ্রোহীদের কি সুবর্ণ সুযোগ। খলিফাকে অন্তরীণ করেছেন। আর বেকুফ মারওয়ান হযরত আলীকে দায়ী করতে গিয়ে মদীনাবাসীদের বিরাগ ভাজন হলেন। খলিফা হারালেন তাঁদের বন্ধুত্ব। বিদ্রোহীগণ অনায়াসে মদীনার প্রাণকেন্দ্র মসজিদে-নববীর দখল নিলো। শুধু তাই নয়, এই ঐতিহাসিক বিপ্লব ও বিদ্রোহের মূল নায়ক আল্-গাফিকী মসজিদের ইমামের আসন

দখল করে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। মসজিদ এখন তাদের দুর্গে পরিণত। আর খলিফা এখন আপন প্রাসাদে গৃহবন্দী। পরিস্থিতিব এত দ্রুত অবনতি ঘটত না, যদি কুচক্রী মন্ত্রী মারওয়ান শেরে-খোদা আলীর সাথে মূর্খামি না করতেন। তা হলেও শেষ আশা ছিল। হযরত আলী নিরুত্তর হওয়ার পর মদীনাও নীরব হয়ে গেল।

খলিফার সতর্কবাণী : বিদ্রোহীগণের জবাব :

খলিফা কোনদিনই আপন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মদীনাতে কোন সেনাবাহিনী রাখতেন না। আজও ছিল না। তাঁকে রক্ষা কবছিলেন তাঁর আপন আত্মীয় স্বজন, সঙ্গে আলী, তালহা ও যুবাইয়েরের পুত্রগণ। এই অবস্থায় খলিফা একদিন হযরত আলী, তালহা ও যুবাইয়ের সাথে আলাপ আলোচনার জন্য ডেকে পাঠালেন। তাঁরাও এলেন। কিন্তু খলিফার প্রাসাদে প্রবেশ করতে পারলেন না। বিদ্রোহীগণ সারা প্রাসাদ অবরোধ করে রেখেছে। খলিফা ছাদ হতেই কিছু কথা উচ্চস্বরে বললেন। সকলেই শুনলেন। কিন্তু খলিফার সাথে তাঁরা কোন একান্ত আলোচনা করার সুযোগ পেলেন না। খলিফা অবস্থা বুঝেই ছাদ থেকে বলতে থাকলেন—

"হে আমার প্রিয় নাগরিকগণ! আমি আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের জন্য ও খেলাফতের জন্য দোয়া করছি—তিনি যখন আমাকে নেবেন, তিনি যেন সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যবস্থাও করেন, যাতে নবীর খেলাফত ঠিক মত চলতে থাকে। অতঃপর তিনি ইসলামের সেবায় কি করছেন, তার একটি মর্মস্পর্শী বর্ণনা দেন। তারপর তিনি বিদ্রোহীগণকে সম্বোধন করে বলেন—হত্যা তিন কারণে করা বৈধ—কুফরীর জন্য, নরহত্যার জন্য, ব্যভিচারের জন্য। তোমরা আজ যে তলোয়ার আমার গর্দানের উপর ঝুলিয়েছো, আগামীকাল ওটা তোমাদেরই গর্দানে পড়বে, তোমরা অন্যায় রক্তপাতের জন্য যে তলোয়ার আজ বের করছ, ঐ তলোয়ার তোমরা আর কোনদিনই ঘরে ঢোকাতে পারবে না।"

বিদ্রোহীগণ বলে উঠল—"হে খলিফা, হত্যার আরো একটি কারণ আছে, যখন হক বাতিল হয়, যখন ইনসাফ্ বে-ইন্সাফ হয়, যখন মযলুম জুলুমের জন্য আহাজারী করে, যখন সরকারি দপ্তরে স্বজন-পোষণ প্রাধান্য পায় আল্লাহব নাফরমানীর জন্য ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্য আপন'কে পদত্যাগ করতে হবে, নতুবা মৃত্যুকে বরণ করুন।" এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ৪০ দিন চলল।

খলিফার প্রাসাদ অবরুদ্ধ

চরম বর্বরতা :

এতদিন খলিফা গৃহবন্দী ছিলেন। কিন্তু মদীনার সাধারণ মানুষ অবাধে তাঁর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছিল। আজ যখন তাঁর প্রাসাদ অবরুদ্ধ হলো, তখন মদীনাবাসীদের সাথে তাঁর সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলো। তিনি আজ নিঃসঙ্গ একাকী। এই অধ্যায়ের করুণতম ঘটনা ইসলামের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করল। তামাম আরব জানে, খলিফা ওসমান মরুবাসী আরবদের পানির কষ্ট নিবারণ করার জন্য কি করেছেন। এককথায় বলতে গেলে এই পানির ব্যাপারে সমগ্র আরব জাতি যা করেছে, একা হযরত ওসমান (রাঃ) তা অপেক্ষাও বেশি করেছেন। সেই ওসমানের পানি বন্ধ করল বিদ্রোহীগণ। অনেকে প্রাণের টানে রাত্রিবেলায় গোপনে কিছু পানি দিতেন, সমগ্র পরিবারবর্গ তাতেই কোন রকমে দিন চালাতেন। বিদ্রোহীগণ যে শুধু নিষ্ঠুর ছিল, তা নয়। চরম বর্বরও ছিল। মরুচারী আরবের চরম বর্বরতা তাদের পেয়ে বসেছিল।

খলিফা এই ব্যাপারে হযরত আলীকে হস্তক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ করলেন। বীর আলী হস্তক্ষেপ কবলেন। তারা মানতে চায় না। তখন তিনি-বলেন—"রোমান ও পারস্যের যুদ্ধবন্দীদের যুদ্ধের ময়দানে তোমরা যে ব্যবহার দান করো, তোমাদের খলিফার প্রতি সেই ব্যবহার দিতে তোমরা কুণ্ঠিত কেন ? মুসলমানরা তো বহু দূরের কথা, কাফেরগণও পিপাসার্ত শত্রুকে কোন সময় পানিব কষ্ট দেয় না। তোমরা কি তাদের অপেক্ষাও হীন।" কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় বিদ্রোহীগণ হযরত আলীর কথায় কর্ণপাত করল না। তখন এই নিদারুণ অবস্থা দেখে 'উম্মুল-মুমেনীন' (নবী-পত্নীগণ)। স্থির থাকতে না পেরে একজনকে পাঠালেন পানি দিতে, এই ভেবে যে তারা তাঁকে অন্তত বাধা দেবে না। কিন্তু কি আশ্চর্য, যখন আবু সুফিয়ানের কন্যা আমির মুয়াবিয়াব বোন স্বয়ং মহানবীর পত্নী উম্মে হাবিবা হযরত আলীর সাহায্যে একটি খচ্চরের পিঠে কিছু পানি নিয়ে খলিফার প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলেন, তখন ঐ বিদ্রোহীগণ পাগলের মত ; মাতালের ন্যায়, পশু আচরণে তাঁরও পথ অবরোধ করলেন। তিনি ভীষণভাবে অপ্রস্তুত হলেন। পানি সেখানেই নষ্ট হলো।

ক্ষমাহীন ত্রুটি : এই কাজের দ্বারা বর্বর বিদ্রোহীগণ যে বর্বরতার পরিচয় দিল, তা সকল বর্বরতার সীমা ছাড়িয়ে গেল। সকল পাপের সকল অন্যায়ের সীমা অতিক্রম করল। এখানে আমাদের একটা প্রশ্ন অতি স্বাভাবিকভাবেই প্রাণে সাড়া জাগায়। যে মদীনাবাসীগণ একদিন সংখ্যাতে

অতি নগণ্য, সম্পদের অতি সামান্য, সাহসে অতি তুচ্ছ হয়েও খন্দকের যুদ্ধে মক্কার কোরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের বিশাল বাহিনীকে রুখে দিয়েছিলেন, তাঁরা আজ সংখ্যাতে অনেক, সম্পদেও অনেক ধনশালী হয়েও মাত্র কয়েক হাজার উচ্ছৃঙ্খল মানুষরূপী বানরের নিকট হীনতা ও বশ্যতা স্বীকার করলো। মদীনাবাসীগণ নিশ্চয় সেদিন কাপুরুষের কাপড় পরে নারী অপেক্ষাও অধম হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে তালহা ও যুবাইর কি করছিলেন। তাঁরা কি আপন আপন ধনভাণ্ডার গোছাতে ব্যস্ত ছিলেন। আরো দুঃখ 'শেরে খোদা', হযরত আলীকে যখন তারা বাধা দিলেন। এবং তিনি বাধা মেনে নিলেন। তাহলে তখন কি তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, তিনিই ইসলামের 'শেরে খোদা'। এরপরও যখন দ্বিতীয় পর্যায়ের ঘটনা ঘটল নবী-পত্নীকে নিয়ে তখনও তিনি কোন কারণে, কিসের ভয়ে খাইবারের সেই ঐতিহাসিক তলোয়ারটি বার করলেন না। বিচক্ষণ আলী, মহাজ্ঞানী আলী, মহাবীর আলী, সেই অবস্থার পূর্ণ মোকাবিলা করতে তিনি যা কিছুই করতেন, তাতে কি তাঁর বীরত্ব ও মহত্ত্ব কমে যেতো, না আরো বেড়ে যেতো। তাঁদের সেদিনের সেই মনোভাবকে ইসলামের ইতিহাস কোন পথে কোন্ সূত্রে ক্ষমা করবে। যদিও মহান আলী বড়ই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

পাপকে করিয়া ঘৃণা করিও মানা
কভু না করিও যেন পাপীকে ঘৃণা।
তোমার বিশাল বুকে পাপীকে চুমি
শোধিতে সুযোগ দাও পাপীকে তুমি।—হাদিস

খলিফার মর্মস্পর্শী বাণী :

"হে বিদ্রোহিগণ! তোমরা কি জান, তোমরা আমাকে ঐ মসজিদ হতে নামায পড়াতে বঞ্চিত করলে। যে মসজিদের জন্য স্বয়ং নবীজী বলেছিলেন—"মুসলমানদের মধ্যে এমন কে আছে, যে এই মসজিদের জন্য জমি খরিদ করে ওয়াকফ্ করে দেবে, এবং তার বিনিময়ে সে জান্নাতে মনোরম স্থানের অধিকারী হবে।" তখন আমিই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। আর আজ তোমরা আমাকে সেই মসজিদ হতে দূরে সরিয়ে রেখেছো।"

"হে বিদ্রোহিগণ! তোমরা কি জান, একদিন নবীজী বললেন—"তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো, একটি কূপ খরিদ করে মুসলমান ভাইদের জন্য ওয়াকফ্ করে দেবে, আর তার বিনিময়ে আল্লাহ্ তাকে আরো ভাল জিনিসের মালিক করবে।" তখন আমিই তাঁর কথামত মুসলমানদের জন্য রুমাকূপ ক্রয় করে সকলেরই পানির অভাব লাঘব করি। আর আজ তোমরা সেই কূপের পানি হতে আমাকে বঞ্চিত করেছো।"

খলিফার জীবনে এরূপ আরো বহু কাজ ছিল। তিনি যেগুলোর কিছু কিছু উল্লেখ করলেন। তাঁর এই মর্মস্পর্শী কথাতে বিদ্রোহীগণের অনেকেই বিচলিত

হয়ে উঠল, অনেকেরই মনও বিগলিত হল। তখন তাদের নেতা মালিক বিন উশতার বলল—"সাবধান খলিফা তোমাদের সাথে ছলনা করছেন, তোমাদেব ঠকানোর চেষ্টা করছেন।" এইভাবে বিদ্রোহী জুনদুব, কামিল ও আমির প্রমুখ নেতাগণ আক্রমণ চালাতে বদ্ধপরিকর থাকলো।

তুমি যে পবিত্রকুল প্রশস্ত হৃদয়
পাপীর পার্শ্বেতে তার হোক পরিচয়।

হজ উপেক্ষিত :

দেখতে দেখতে হজের সময় এসে গেল। হজের ব্যাপারে খলিফাব একটি বিরাট দায়িত্ব আছে। তিনি আপন দায়িত্ব পালনের জন্য ঐ বিপদেব দিনে তাঁর আপন প্রহরী ইবনে আব্বাসকে ভার দিলেন। ইবনে আব্বাস আপন গুরুদায়িত্ব ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু খলিফাব বারবার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়েই তিনি হজের দায়িত্ব নিলেন। অন্যান্য অনেকের মত প্রথম প্রথম বিবি আয়েশাও খলিফার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি আপন ভ্রাতা মহম্মদকে বিদ্রোহীদের নিকট হতে টেনে নেওয়ার জন্য বহু চেষ্টা করেও সফল হননি। শেষের দিকে বিবি আয়েশা বিদ্রোহীদের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হয়েই হজযাত্রীদের সাথে মক্কা গমন করেন। উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহীগণ নিজেরা তো হজ করলই না, খলিফাকেও হজে যোগদান করতে দিলো না। এতবড় ঘটনাতেও মদীনার বিবেকে সাড়া জাগল না।

বিবেকের দংশনে বিবেক জাগুক
অপরের দ্বারা নয় আপনি শিখুক।

শাহাদতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় শাহাদত (৬৫৬ খ্রীঃ)

তিনিই তাঁর সৈনিক :

সমগ্র পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে একটি করুণতম সময় ঘনিয়ে এলো। সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে এই শাহাদতেব দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত নাই। মানব জাতির রাজা-বাদশাব ইতিহাসে এইরূপ একটি ক্ষণ ও খুন আর দ্বিতীয়টি নাই। যে মানুষটির হাতে এত সৈন্য, এত সামন্ত, যা'ব সারা পৃথিবীর দিগ-দিগন্ত কাঁপিয়ে তুলছে, যে-মানুষটির হাতে এত বীর-যোদ্ধা, এত সাহসী প্রাণ সদাই উন্মুখ, যারা সাবা বিশ্বেব দুই অপ্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ শক্তিবর্গকে শিক্ষকেব মত সমরে শিক্ষা দেয়, এককথায় সেদিন যাদের পদভারে সারা পৃথিবী কম্পমান ছিল, যাদের কৃপাণ ও তরওয়াল আঘাতে পাহাড়-পর্বত-নদীনালা এক সাথে ঝলসিযে উঠেছে, সেদিন নীল আকাশেব নিচে ও মাটির উপরে এমন কোন শক্তি ছিল না, যা ঐ বাহিনীকে দেখে বিচলিত

ও বিহ্বল হয়ে উঠেনি, যাদের দেখে অনেক ক্ষণজন্মা বীরের তরবারি হাত থেকে খসে পড়েছে, আরম্ভ হয়েছে কত বীরের হৃদ-কম্পন, কত বীর চোখে সরষে ফুল দেখেছেন, কত সেনাপতি যাদের দেখা মাত্র সম্বিৎ ফিরে পেয়েছেন, কত সেনাধ্যক্ষ যাদের দেখে সাক্ষাৎ যম-দূত আজরাইলের স্বরূপ দেখেছেন; যে মানুষটির হাতের মুঠোয় এঁরা ছিলেন, যে মানুষটির ইঙ্গিতে এঁরা ধরাকে সরা রূপে ব্যবহার করতে পেরেছেন, সেই মানুষটিই ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা অবলীলায় শাহাদত বরণকারী হযরত ওসমান গনী (রাঃ)। ৮।

ভাবতেও ভয় হয়, কল্পনা করতেও কষ্ট হয়, চিন্তা করতেও চরম উদ্বেগ আসে, বিশ্বাস করতেও শত বাধা মনকে বাধা দেয়, কি করে কয়েক শত বালখিল্যের হাতে প্রাণ দিলেন ঐ মহাপুরুষটি। যত দিন মানুষ থাকবে, যতদিন রাজ-রাজত্ব থাকবে, ততদিন এ জিজ্ঞাসার কোন শেষ নাই, অন্তহীন জিজ্ঞাসা রেখে গেছেন হযরত ওসমান (রাঃ)। উত্তর শুধু একটাই যেটিকে ন্যায়োচিত ভেবেছেন, তাকে মাথায় তুলে অন্যায়ের নিকট মাথা নত করেন নি। এই নীতির সংগ্রামে তিনিই ছিলেন তাঁর একমাত্র সৈনিক।

শাহাদত ত্বরান্বিত :

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদতকে দুটো জিনিস ত্বরান্বিত করেছিল। প্রথমটি বিদ্রোহীগণ বুদ্ধির সাথে পবিত্র হজের সময়টিকে বেছে নিয়েছিল। কেননা ঐ সময় মদীনার বিশিষ্ট ও বেশির ভাগ মানুষ হজ পালনে মক্কায় চলে যান। মদীনা প্রায় শূন্য থাকে। সুতরাং কার্য উদ্ধারের জন্য এটি তাদের জন্য উপযুক্ত সময় বলে বিবেচিত হয়েছিল। দ্বিতীয় কারণটি ছিল—খলিফাকে রক্ষার্থে সিরিয়া ও বসরা হতে সৈন্য আগমনের বার্তা। যখনই বিদ্রোহীরা শুনল বা জানতে পারলো যে, বহু সৈন্য আসছে খলিফাকে সাহায্য করার জন্য,তখনই বিদ্রোহীগণ আর কালবিলম্ব করতে ধৈর্য ধরল না, আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য খলিফার প্রাণহরণকে ত্বরান্বিত করলো। এই যে সৈনিক আসার সংবাদ, এটা খলিফা মোটেই জানতেন না। তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে আমির মুয়াবিয়া তাঁকে বহু পূর্বেই অনুরোধ করেছিলেন—সিরিয়া যাওয়ার জন্য কিংবা সিরিয়া বাহিনীর সাহায্য নেওয়ার জন্য। কিন্তু আদর্শ প্রাণ খলিফা সবই না করেছিলেন। কে সংবাদ দিয়েছিল, না আদৌ কেউ সংবাদ দেয়নি, একথা কেউই বলতে পারেন না। হতে পারে এটা পুরোপুরি গুজব, হতে পাবে কোন খলিফা-ভক্ত মানুষ বিদ্রোহীগণকে নিরস্ত বা ভয়

দেখানর জন্য ঐরূপ একটা কথা প্রচার করে দিযেছিলেন। যে কথার বিন্দু-বিসর্গও খলিফা জানতেন না।

সুবর্ণ সুযোগ : হজ যাত্রীগণ মক্কা গমন করলেন। খলিফা অবরুদ্ধ। মদীনা শূন্য প্রায়। বিদ্রোহীরা সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করল। তারা প্রথম প্রবল বেগে প্রাসাদ আক্রমণ করল। প্রথম প্রথম প্রাসাদ প্রহরীগণ বাধা দিতে থাকল। কিন্তু তারা সংখ্যায় ছিল অতি নগণ্য। বরং তারাই মার খেতে আরম্ভ করলো। বিদ্রোহীদের মারমুখী আক্রমণে সামান্য সংখ্যক প্রহরী আত্মবিশ্বাস ও আত্মবল হারিয়ে ফেলল। এমনকি তারাও যখন প্রাণ হারাবার পথে এসে গেল, তখন দয়ালু খলিফা আর স্থির থাকতে না পেরে ছাদের উপর হতে তাদের নির্দেশ দিলেন—তারা যেন আপন আপন বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু তারা তা না করে খলিফার প্রাসাদে প্রবেশের চেষ্টা করলো। বদ্ধ দরজা সামান্য খোলা হওয়া মাত্রই তারা ভিতরে প্রবেশ করল। তখন বিদ্রোহীগণও ঐরূপ চেষ্টা করলো। তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তারা দরজা সম্মুখে আগুন ধরিয়ে দিল। সৃষ্টি হলো এক তাণ্ডব লীলা। অগ্নি সংযোগের পব মারমুখী জনতা পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলো হতে খলিফার প্রাসাদ চত্বরে নামার চেষ্টা করলো। তখন তাদের প্রতিহত করার মত আর কোন প্রাসাদ রক্ষীও ছিল না। সামান্য কিছুক্ষণের জন্য প্রাসাদ-অভ্যন্তরে কতিপয় প্রহরীর সাথে বিদ্রোহীগণের সামান্য সংঘাত বাধলেও তা ছিল খুবই ক্ষণিকের। স্বয়ং খলিফার প্রাসাদ আজ সমরের রূপ নিলো। যে সমরের একমাত্র লক্ষ্য ছিল খলিফার প্রাণনাশ।

কোরআন পাঠে রত জা'মেয়ূল কোরআন : প্রবীণ খলিফা স্বচক্ষে সমস্ত কিছু দেখলেন, স্বজ্ঞানে সমস্ত কিছু বুঝলেন। বুঝলেন তাঁর জীবন-দীপ নির্বাপিত হতে আব বেশি দেরি নাই। এতদিন কুফা-বসরা ও মিশরে বিদ্রোহ চলছিল, পরে খাস মদীনাতে বিদ্রোহ আরম্ভ হলো, তারপর প্রাসাদ ফটকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। অতঃপর প্রাসাদ আঙ্গিনায় বা প্রাসাদ চত্বরে বিদ্রোহের মহাঢেউ উঠল, এখন খলিফা বুঝলেন—সব চত্বরের সব খেলা শেষ হলো, একটি খেলা বাকি শুধু,সেটি তাঁর জীবন-খেলা। যেটি সংঘটিত হতে চলল—কোন সমরে নয়, কোন বিশাল ময়দানে নয়, তাঁরই শয়ন কক্ষে।

জীবনের এই অন্তিম বোধোদয়ে বাঁচার তাগিদে নয়, বরং ওপারেব আহ্বানেই

আপন পরিজনবর্গের মধ্যে একটি কথা শুধু সকলকে সকরুণ কণ্ঠে শুনিযে দিলেন—আমি শীঘ্রই আমার ঘরে (পরপার) যাচ্ছি। বলার পর তহবন্দ ত্যাগ করে পাজামাটি পরলেন, যেন চরম আত্মতৃপ্তিতে কোন আপনজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন। আপন ঘরে বসে জীবনের বিদায় বেলায সবভুলে, সব ছেড়ে হাতে তুলে নিলেন—পবিত্র কোরআন। জা'মেয়ূল কোরআন আরম্ভ করলেন পড়তে পবিত্র কোরআন।

তিনজনের তরবারিচ্যুত : পবিত্র কোরআন পাঠ করতে থাকলেন 'জা'মেয়ূল কোরআন' হযরত ওসমান। বিদ্রোহীগণ তিনজনকে একের পব এক নির্দেশ দিলেন তাঁকে হত্যা করতে। তাবা প্রত্যেকেই একের পর এক ঘরে ঢুকলো। দেখল এক মহান আপন ধ্যানে নিরুদ্বেগে নিখিল স্রষ্টার দেওযা পবিত্র কেতাব তোলায়াত করছেন। পুণ্যশ্লোক দানবীর হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সেই নির্বিকাব মূর্তি সেই মহিমময় মুখছবি, সেই সৌম্য ভাব, সেই সমাহিত স্বর, সেই সুললিত কণ্ঠ, সেই বিনীত বাণী, সেই বিনম্র আকুতি যেন একের পর এক সকলকেই মহাভিভূত করলো। প্রত্যেকেরই মন যেন বিনা জিজ্ঞাসায় বলে উঠল—অন্যায়, অন্যায়, অন্যায়। অতঃপর হযবত আবুবকরের পুত্র, বিবি আয়েশার ভাই মহম্মদের উপর এই ঘৃণিত কাজটিব ভার পড়ল। মহম্মদ এলো, যথেষ্ট গালাগালি করল, গায়ে হাতও তুলল, সুন্নতে-রসুল তাঁর দাড়িতেও হাত দিল। কি ভীষণ সময় কি ভীষণ ক্ষণ, ঘরে কেউ নাই, বিশাল সাম্রাজ্যের লক্ষ সেনার প্রভু আজ একাকী একটি ঘরে একজন ইতরের দ্বারা লাঞ্ছিত হচ্ছেন, সেটাকে দেখারও লোক নাই, একটু কথা বলারও মানুষ নাই। জনশূন্য ঘরে একাকী খলিফা একটি নেকড়েব মুখে একটি বন্য শার্দূলের কবলে। অদৃষ্ট আর কাকে বলে। সামান্য কথাতে বন্য শার্দূলের তরবারিও হাত হতে খসে পড়লো। —"হে ভাইপো ! তোমাব স্বর্গত পিতা আমাকে সবিনয়ে শ্রদ্ধা করতেন, স্বয়ং নবীজীও আমাকে স্নেহ করতেন। আল্লাহ আমার সহায়। তোমার হাত হতে, তোমাকে অকল্যাণ থেকে বাঁচাতে, আমি আল্লাহতে আত্মসমর্পণ করলাম।"

হত্যাকাণ্ড ও বিবি নায়লা: অতঃপর মিশরীয় তিন নরাধম—বিদ্রোহেব নায়ক গাফিকী, সুদন ও কিনানা, যারা ঘর অবরোধ করেছিল, যারা অন্য কাউকে ঐ ঘরে প্রবেশ কবতে বাধা দিচ্ছিল, এবার তারাই এক সাথে প্রবেশ করল। এই তিন শয়তান ইবলিস ও খবিসের খঞ্জরাঘাতে মহাপ্রাণ খলিফাব

প্রাণ-বায়ু নিখিলের নশ্বর দেহ হতে বিদায় নিল, চিরবিদায়। ইন্না-লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলাইহে রা'জেউন। নিশ্চয় সকল কিছুই আল্লাহর জন্য, এবং তাঁরই দিকে সকল প্রত্যাবর্তন। তিন নরাধম-নরপশু এক নরোত্তমকে বিদায় দিল।

যা কিছু জগতে আছে সে ধ্বংসময়
তুমি শুধু বাকি রবে সর্বসাবময়,
মহত্ত্বে গৌরবে তুমি এত সুমহান
জগৎ জুড়িয়া দান নাহি প্রতিদান। সূরা রহমান: ২৬-২৮।

যখন এই নৃশংস ও নারকীয় ঘটনা ঘটছিল, তখন সকল বাধা সকল বিপত্তিকে অতিক্রম করেই বিবি নায়লা ও আরো কয়েকজন ঘরে প্রবেশ করেন। তখন ঐ পশুর দলের কেউ কেউ দ্বিধান্বিত, খলিফা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন কিনা, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা মৃত দেহের উপর খঞ্জের পর খঞ্জর চালাচ্ছে। আর একদল আমোদে-আহ্লাদে-উল্লাসে ফেটে পড়ছে খলিফার মস্তককে দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে। সমগ্র শহীদের ইতিহাসে এইরূপ পাশবিক ঘটনা আর কোথাও কি আছে। নরপশুর দল বুঝল না, বিবি নায়লা ঢালস্বরূপ পড়ে গিয়েছিলেন তাঁর মরদেহের উপর তাঁকে বাঁচাতে নয়, তাঁর সম্ভ্রম রক্ষা করতে, আল্লাহর প্রিয়-অলি তুল্য খলিফা বুঝতে পেরেছিলেন—এইরূপ একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তাই তহবন্দ ছেড়ে পায়জামা পরেছিলেন। আমর নামক এক দুরাচার পাপাচার পশুর অপেক্ষা হীন ব্যক্তি বদ্ধপরিকর হয়েছিল খলিফার মস্তককে দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করতে। এবং সেই সময়ই বিবি নায়লা দারুণভাবে ক্ষতবিক্ষত হন, বহুঘাতের মধ্যে একটি ঘাতে একটি আঙ্গুল হারান। তাঁরও সর্বাঙ্গ শত্রুর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছিল। তবুও পতিপ্রাণা নারী নিজ জীবন ও দেহ সমস্ত কিছুকেই ভুলে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলেন স্বামীর মরদেহের উপর, অসভ্য জন্তু আমরকে রুখতে, মৃত স্বামীর চিরউন্নত শিরকে পবিত্র শরীরের সাথে অটুট ও অক্ষুণ্ন রাখতে। এই হত্যা-যজ্ঞে আরো কিছু নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন—খলিফার দাস-দাসী ও তাঁর তায়েফবাসী বন্ধু মুগীরা। নিরীহ নিরস্ত্র পুরুষ মহিলা সকলেই চেষ্টা করেছিলেন ঐ একটি নিরপরাধ বৃদ্ধ মানব কল্যাণী মানুষকে কতকগুলো রাক্ষসের কবল থেকে রক্ষা করতে। এই ছিল তাদের ত্রুটি।

এই দুঃসংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলী ছুটে এলেন, যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় সকলকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করলেন, সবশেষে আপন পুত্রদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমরা বেঁচে থাকতে খলিফা মারা গেলেন

কেন ? সকলেই উত্তর দিল কি ঘটেছিল। বিদ্রোহীগণ খলিফার প্রাসাদ ত্যাগ করার পরই প্রাসাদের ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন বিদ্রোহীগণ বাইতুল মালের দিকে ধাবমান। এখানেই বিশ্ব-শাহাদতেব ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয শাহাদতের যবনিকাপাত হলো।

প্রাসাদ দ্বাব তিনদিন হলো বন্ধ। প্রাসাদের মালিক প্রাণহীন অবস্থায তিনদিন তিনরাত প্রাসাদে পড়ে। যেখানে শ্মশানেব শান্তি বিবাজ কবছে। প্রহরীহীন প্রাণহীন প্রাসাদ মহাকালের নীরব সাক্ষী রূপে দাঁডিয়ে থাকল, আজও দাঁডিয়ে আছে, আগামীকালও দাঁড়িয়ে থাকবে—মদীনাব বুকে, প্রিয মসজিদে নববীর উত্তর পশ্চিম কোণে—'মাকানে-ওসমান', যা আজও মহাকালের শতাঘাত সহ্য কবেও মহান খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ)-এব দূর অতীতের মহান ও মধুর স্মৃতিকে বক্ষে ধারণ কবে আছে—'দারুল কুতুব ওসমানী' (ওসমানী গ্রন্থাগার) নামে।

''তোমার সৌন্দর্যদূত যুগ যুগ ধবি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া—
'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।''

—রবীন্দ্রনাথ

জানাযা নামায : যখন এই নীরব নিথর অবস্থা, যে নীরবতাকে ভাঙ্গতে ঝিল্লী পোকাও ভয় পাচ্ছে, তখন বিবি খাদিজার ভাইপো হাকিম ইবনে হিযাম, যে হাকিম একদিন মহানবী ও বিবি খাদিজার নির্বাসিত জীবনে রাত্রির অন্ধকারে কিছু খাবার সববরাহ করতেন, সেই রাত্রির নীরব কর্মীটি আজও আবার দিনের নীরবতা ভেঙ্গে এগিয়ে এলেন। ডাকলেন যুবাইর ইবনে মুতেয়েম ও অন্যান্য কয়েকজনকে। সকলে মিলিতভাবেই হযরত আলীর নিকট গমন করে জানাযা নামাযের জন্য পরামর্শ করলেন। কেউই মরদেহ বের করতে সাহস করছিলেন না। সকলেই ভয় করছিল—বিদ্রোহীগণ তখন মদীনা ত্যাগ করেনি। যে কোন মুহূর্তে মরদেহ ছিনিয়ে নিয়ে আরো অশোভনীয় কিছু ঘটিয়ে বসে। যাই হোক, তাদের ওটা ইচ্ছা থাকলেও হযরত আলীর হস্তক্ষেপে তা হয়নি। কিন্তু অত্যন্ত সতর্কভাবে এগোতে হচ্ছিল। তখনও আক্রমণের শেষ হয়নি। সন্ধ্যাব অন্ধকার নেমে এসেছে। নগর নীরব, নির্জন পথঘাট, জন-মানব-শূন্য। সেই অন্ধকারের মাঝে হযরত আলী মাত্র কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে লাশ কাঁধে কবে 'জান্নাতুল বাকি'র দিকে রওনা হলেন। সংক্ষেপে

জানাযা নামায সেরে ঠিক জান্নাতুল বাকি-তে কবর দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় তারই পাশে একটি ফাঁকা স্থানে কবর দেওয়া হলো। পরে এই স্থানটিকেও জান্নাতুল বাকি-র সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে একটি কথা না বললে হযরত আলীর প্রতি অবিচার হয়, হাকিম কেন এগিয়ে এলেন হযরত আলীকে ডাকতে, আলী কেন প্রথম এগোলেন না? কুচক্রী মারওয়ানের জঘন্যতম দুর্ব্যবহারে মহান আলী খুবই ব্যথা পেয়েছিলেন। খলিফা যেখানে নীরব ছিলেন।

মুয়াবিয়া সমীপে :

তখনও বিদ্রোহীগণ মদীনা ত্যাগ করেনি, তখনও মদীনা তপ্ত, তখনও সারা শহর উত্তপ্ত, তখনও রাস্তাঘাটে নীরবতা নির্জনতা সবই বিরাজমান, তখনও মদীনাতে বিদ্রোহীদের একচ্ছত্র শাসন বলবৎ, তখন তাদের সামনে আঙ্গুল তুলার শক্তি কারো নাই। তখন তারা মদীনার দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা, তখনও তারা মসজিদে নববীর হর্তাকর্তা, তখনও তারা মিম্বরে দাঁড়িয়ে নামায পরিচালনা করছে, এককথায় তখনও তারা মদীনাতে বাঘ-বকরীকে এক ঘাটে পানি খাইয়ে দিচ্ছে। এই অবস্থাতে গোপনে মদীনার কিছু মানুষ দামেস্কে গমন করল—বিবি নায়লার ছিন্ন বস্ত্র, রক্তাক্ত কাপড় ও তাঁর কর্তিত অঙ্গুলি সহ আমির মুয়াবিয়ার নিকট। আরম্ভ হলো আরবের দ্বিতীয় নাটক। শেষ হলো ইসলামের তৃতীয় খলিফা ওসমানের খেলাফতকার।

চতুর্থ খলিফা : তিনদিন খলিফার প্রাসাদে শ্মশানের নীরবতা বিরাজ করল। এটাও বিরাজ করতো না, যদি মন্ত্রী মারওয়ান হযরত আলীর সাথে সদ্ব্যবহারটুকুও করতেন। তিনি প্রকাশ্যে বলে দিলেন ষড়যন্ত্রে আলী জড়িত। অথচ সারা দুনিয়া জানে হযরত আলীকে। যিনি জীবনে কারো অনিষ্ট করা দূরের কথা, অনিষ্ট চিন্তাও করেন নি। যাই হোক, চতুর্থ দিনে দাফন সারা হলো। পঞ্চম দিনে বিদ্রোহীগণ মদীনাবাসীদের আহ্বান জানালেন একত্রিত হতে। অনেকেই একত্রিত হলো। সকলেই জানালো—"আমরা মদীনা ত্যাগ করার পূর্বে আপনারা পরবর্তী খলিফার নির্বাচন পর্বটি সেরে ফেলুন, এবং সাম্রাজ্যকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসুন। আমরা পরবর্তী খলিফার জন্য হযরত আলীর নাম প্রস্তাব করলাম।" সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিদ্রোহী সমর্থন জানাল। অতঃপর মদীনাবাসীবৃন্দ একই প্রস্তাব করলেন। সকলেই সমর্থন করলেন। তখন সরল হৃদয় আলী হযরত তালহাকে খেলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রস্তাব ও অনুরোধ করলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আলীর নাম ঘোষণা

কবলেন, এবং নিজ অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। এরপর হযরত আলী উপস্থিত প্রবীণ সাহাবী হযরত যুবাইয়ের নাম প্রস্তাব ও অনুরোধ করলেন। তিনিও একইভাবে হযবত আলীর নাম ঘোষণা করলেন, এবং নিজ অক্ষমতার কথা জানালেন। এইভাবে সর্বশেষে সর্বসম্মিলিতভাবে মহানবীর স্নেহধন্য জামাতা মহাজ্ঞানী মহাবীর মহাতাপস জ্ঞানের দরজা হযরত আলী ৩৬ হিজরিতে ৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে ইসলামের চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত হলেন।

হযরত ওসমান (রাঃ) হত্যার ফলাফল

খলিফা ওসমানের শাহাদত ইসলামের ইতিহাসকে চির কলঙ্কিত করে কলুষিত অধ্যায়ের সূচনা করে। হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ)-এর আকস্মিক মৃত্যু ইসলাম জগতের যে অভাবনীয় ক্ষতি করেছে, তার সাথে আর কারো তুলনা হতে পারে না। প্রখ্যাত জার্মান ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসেনের মতে, 'ইসলামের ইতিহাসে ওসমান (রাঃ)-এর হত্যাই যে কোন ঘটনা অপেক্ষা অধিকতর যুগান্তকারী।'' কেননা এরপরই ইসলামি রাষ্ট্রের গতি অন্যদিকে মোড় নিল। সমগ্র জনসাধারণ খেলাফতের প্রতি একটা দারুণ শ্রদ্ধা পোষণ করত। ওসমান হত্যা যেন তার নিরসন করল। ঐতিহাসিক খোদাবক্স বলেন—''ইহা সর্বকালের জন্য খেলাফতের পবিত্রতা নষ্ট করে।'' বার্নার্ড লুইস বলেন—''বিদ্রোহী মুসলমানগণ দ্বারা খলিফার প্রাণহানিতে যে করুণ ইতিহাসের সৃষ্টি হয়, তা ইসলামি ঐক্যের প্রতীক খেলাফতের ধর্মীয় ও নৈতিক মর্যাদাকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করে।'' জোসেফ হেল মন্তব্য করেন—''খলিফা ওসমানের হত্যা ছিল ইসলাম জগতের গৃহযুদ্ধের বিপদ-সংকেত স্বরূপ।'' কেননা, খলিফার হত্যার পর মহানবী (দঃ)-এর সকল আদর্শ যেন ধূলিসাৎ হতে আরম্ভ হলো। মাথাচাড়া দিল গৃহবিবাদের নগ্ন রূপ। মহানবী (সাঃ) সকলকে এক করেছিলেন, আবার এককে একত্রও করেছিলেন। কিন্তু ওসমান হত্যার পর হতেই সেই একত্ব সর্বত্র ভেঙে যেতে আরম্ভ করল। ওয়েল হাউসেন ঠিকই বলেছেন—''এর ফলে গৃহযুদ্ধের যে দরজা খুলে যায়, তা আর কোনদিনই বন্ধ হয়নি।''

অপদার্থ কাপুরুষ বিদ্রোহীগণ খলিফাকে হত্যা করে যা করতে চেয়েছিল, তা করা তো বহু দূরের কথা, বরং খলিফা হত্যার সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রকেই চিরতরে কবর দিল। খলিফার পতন ও মৃত্যুতে গণতন্ত্রের, সাম্যবাদের, জাতীয়তাবাদের পতন ও মৃত্যু হল। খোদাবক্স বলেন—''ইহা আল্লাহতন্ত্র (Theocracy)-কে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করল।'' খলিফার মৃত্যুর পরে ইহা আবার জাতীয়তাবাদকে বিরাট দুটো ভাগে ভাগ করে দিল—বানু হাশেম ও বানু উমাইয়া। একদিন ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ সকল কৌলিন্য-চেতনাকে ধ্বংস করে সকল মুসলমানকে এক করেছিল। আজ সেই এক হল দুই। আরম্ভ হল দ্বন্দ্ব, সুযোগসন্ধানী ইসলামের কুখ্যাত ব্যক্তি মুয়াবিয়া সুযোগ বুঝে খলিফা ওসমানের রক্তাক্ত জামা ও নায়লার আঙ্গুল নিয়ে হযরত আলীর খেলাফতের বিরুদ্ধে ঘোষণা করলেন বিদ্রোহ। এই মুয়াবিয়াই মিথ্যা প্রবঞ্চনা,

প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াতি, জুলুমবাজি ইত্যাদির সাহায্যে খোলাফায়ে রাশেদীনকে ধ্বংস করলেন চিরতরে, কায়েম করলেন রাজতন্ত্র, শেষ করল মহানবী (দঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত আল্লাহতন্ত্র বা গণতন্ত্র, আমিরুল মোমেনিন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর মজলিস-উস-সুরা, পরামর্শ পরিষদ বা বিধানসভা, সংসদ ভবন ইসলামি প্রজাতন্ত্র।

ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তিস্বার্থে অন্ধ হয়ে সেদিনের কুচক্রী প্রথম মারওয়ান ও তখনকার কুখ্যাত প্রথম মুয়াবিয়া সমগ্র ইসলাম জগতের যে চিরস্থায়ী ক্ষতি করলেন, তা আজও পূরণ হয়নি। তাঁরা শুধু মহানবী (দঃ)-এর আদর্শকে ভুলেই যাননি, তাকে নির্মমভাবে আঘাত করেছেন নির্লজ্জ কাজের দ্বারা। অবশ্য ইতিহাস তাদের ক্ষমা করেনি।

এরপরও খলিফা ওসমানের হত্যাকে কেন্দ্র করে আরো কিছু জঘন্য ঘটনা মাথাচাড়া দিল। নিকলসন ও ওয়েল হাউসেনের মতে—"শিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় ইহুদী সন্তান ভণ্ড মুসলমান ইবন সাবার প্রতারণা হতে।" যদিও হযরত আলী কোনদিনই সাবাকে সমর্থন করেন নি। তবুও এই করুণ কাহিনীকে কেন্দ্র করেই মুসলমানদের মধ্যে সুন্নি ও শিয়া বা খারিজী দলের উৎপত্তি হয়।

খলিফা ওসমানের হত্যার পর হতেই ইসলামি-প্রজাতন্ত্রের রাজধানী মদীনাব প্রাধান্য ও গৌরব লোপ পেতে থাকে। মক্কা ও মদীনার পরিবর্তে প্রাধান্য পেল কুফা, দামেস্ক, ফুসতাত ও বসরা প্রভৃতি শহরগুলো। পরবর্তীকালে উমাইয়া খলিফাগণ বানু হাশেম গোত্রকে বিকৃতভাবে চিত্রিত করে, কালচক্রে হাশেম বা আব্বাসীয় খলিফাগণও অনুরূপভাবেই উমাইয়াদের চরিত্রকে চিত্রিত করে। এই জঘন্য গর্হিত কাজের পালা-বদলের মূলে ছিল খলিফা ওসমান হত্যা। এবং ওসমান হত্যার মূলে দায়ী ছিল মারওয়ানের বদ-বুদ্ধিজাত অপকাজ।

খলিফার কৃতিত্বের সার-সমীক্ষা :

খলিফা হযরত ওসমানের সময় নানা অশান্তি কলুষ দেখা দিলেও খলিফা রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) যার সূচনা করেন, হযবত ওমর (বাঃ) তাঁর অজেয় প্রতিভা দ্বারা তাতে অসামান্য গতি সঞ্চার করেন এবং হযবত ওসমান (রাঃ) বলতে গেলে তাকে একটি পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে সফল হন। হযরত ওসমানেব সময ইসলামেব বিজয় পতাকা পূর্ব হতে বেলুচিস্তান এবং পশ্চিমে ত্রিপলী পর্যন্ত উড্ডীযমান হযেছিল। নতুন নৌবাহিনী দ্বাবা সাইপ্রাস ও বোডস দ্বীপপুঞ্জ দখল খলিফাব অন্যতম কৃতিত্ব। হযবত

আবুবকরের সময় লক্ষ্য কবেছি—বোম ও পারস্য শক্তির দুরন্ত বিরুদ্ধাচরণ। হযরত ওমর তার বলিষ্ঠ উত্তর দিয়েছেন এবং হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সময তার সমাধি রচিত হয।

জনহিতকর কাজে খলিফা ওসমানেব তুলনা হয় না। তিনি জন্মগতভাবেই এই অধ্যায়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জনহিতকর কাজ করার জন্য তাঁর জীবনে দুটি জিনিসের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। এক অগাধ ধনরাশি, অন্যটি দান করাব মনোবৃত্তি। অনেকের ধন থাকে, কিন্তু দান-ধ্যানে থাকে অনীহা। কিন্তু খলিফা ওসমানের জীবনে মণিকাঞ্চনের যোগ হয়েছিল। জনসাধাবণের মঙ্গলের জন্য হেন কাজ নেই যাতে তিনি উদ্যোগী ছিলেন না। মানুষ হিসাবে, মুসলমান হিসাবে, মহানবী (দঃ)-এর সাহাবী হিসাবে, ইসলামের খলিফা হিসাবে তাঁর দানের কোন সীমা নেই। কখনও রুমাকূপ ক্রয় করে জনসাধারণকে জলদান করেন, কখনও মাহজুর বাঁধ বেঁধে মদীনাবাসীকে প্লাবন হতে রক্ষা করেন, কখনও মদীনার মসজিদ সংস্কার, কখনও তার সম্প্রসারণ করে নামাযীদের অসুবিধে দূর কবেন, কখনও 'বনাত লা'ইলাহ' ক্যানেল খনন করে কৃষকদের কৃষিকাজের উন্নতিসাধন করেন, কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেব সমস্ত কিছুকে মহানবী (দঃ)-এর পায়ের তলে হাজির করে দেন। এ ছাডা তিনি বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন। পবিত্র কোরআনের নির্ভুল সংকলন, সংরক্ষণ ও তার বহুল প্রচাব শুধু তাঁর জীবনেই নয়, সমগ্র ইসলামের ইতিহাসে এক অক্ষয় কীর্তি। সুতবাং জনহিতকব কাজে শুধু চারজন খলিফাব মধ্যেই নয়, হযবত ওসমান (রাঃ) সমগ্র ইসলাম জগতের এক প্রতিষ্ঠিত ও অন্যতম ব্যক্তি। মহানবী (দঃ) বলেছিলেন—''মানুষেব মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যিনি মানুষের উপকার করেন।'' মহানর (দঃ)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত সংজ্ঞাতে স্থান-পাত্র-কাল ভেদে খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর সততা ধর্মভীরুতা হযরত ওমর (রাঃ)-এর বিচার ও ন্যায়পরায়ণতা, হযরত ওসমানের (রাঃ) জনহিতকর কার্য এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর বীরত্ব ও মহত্ত্ব কোনদিনই ম্লান হওয়ার নয়।

শাসন-ব্যবস্থায় খলিফা ওসমান (রাঃ) তাঁর পূর্বতন খলিফা হযবত ওমব (রাঃ)-কেই মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু খেলাফতের অষ্টম বছরে কুফার গভর্নব সাঈদের নিকট হতে একটি পত্র পেয়ে খলিফা যেন বিচলিত বোধ কবলেন। পত্রে উল্লেখ ছিল গ্রামের অধিকাংশ মানুষ শহবে চলে আসছে, যাব ফলে শহরের শালীনতা নষ্ট হচ্ছে। তখন খলিফা জমিব হস্তান্তবেব উপব নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন। এর ফলে বহু শহববাসী ধনী পল্লীতে গিযে প্রভূত জমি জাযগা

ক্রয় করতে থাকেন এবং সৃষ্টি হল জমিদারী ও জায়গীরদার প্রথার। এর সুদূরপ্রসারী ফল হল অভিজাত মালিক শ্রেণী ও নির্যাতিত শ্রমিক শ্রেণী। কিন্তু তখন এইরূপ করা ব্যতীত মারওয়ান চালিত খলিফার আর কোন উপায়ও ছিল না। পরবর্তীকালে এটা আরো প্রকট রূপে দেখা দিল। কোন সতীর অসতের পাল্লায় পড়লে, যা হয়, খলিফার তাই হলো।

হযরত ওসমানের চরিত্র :

৬৪৪ হতে ৬৫৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত খেলাফত পরিচালনা করে ৮২ বয়সে খলিফা ওসমান শাহাদত বরণ করেন। তিনি ছিলেন মধ্যম আকৃতির, ঈষৎ লম্বা, গায়ের রং অত্যন্ত ফর্সা, মুখভরা দাড়ি। এই ছিল মোটামুটি তাঁর আকৃতিগত পরিচয়।

প্রকৃতিগত পরিচয় বলতে তিনি ছিলেন—দানশীল, অমায়িক, ধর্মভীরু, সরল, অনাড়ম্বর, মহাপ্রাণ, কর্তব্যপরায়ণ, কোমলমতি, নম্রস্বভাব, নিরহঙ্কারী, সত্যবাদী, বিনয়ী, ধৈর্যশীল স্নেহশীল, শান্তিপ্রিয়, শান্তিকামী আদর্শ মানব। এই সমস্ত খ্যাতির জন্যই মহানবী (দঃ) তাকে পরপর দুটি কন্যা বিবাহে দান করেন, যার জন্য তিনি ‘‘যিন্নুরায়েন’’’ দ্বি জ্যোতিসম্পন্ন উপাধি লাভ করেন। তিনি দু’হাজার ক্রীতদাসকে দাসত্ব হতে মুক্তি দান করেন। বিরাট ধনী হয়েও জীবনযাপনে ছিলেন অতীব অনাড়ম্বর। দুটি উট ব্যতীত প্রায় সবকিছুই ইসলামেব সেবায় তিনি দান করে দিয়েছিলেন। খুবই ধৈর্যশীল ছিলেন, তাই জীবন যখন বিপন্ন তখনও সেনাবাহিনীকে ডাক দিলেন না। জীবনে একটি দিনও কোন দেহরক্ষী রাখেন নি। মসজিদে নিজের জন্য কোন ‘মাকসুরা’ (বিশেষ স্থান) তৈরি করেন নি, পরবর্তীকালে মুয়াবিয়া যার প্রচলন করলেন। তাঁর অতিরিক্ত মহানুভবতা, উদারতা ও চারিত্রিক অন্যান্য গুণ বিদ্রোহীদের শক্তিশালী করতে সাহায্য কবল। তিনি একটু কঠোর হতে পারলে ইসলামের ইতিহাস হয়তো অন্যদিকে মোড় নিতে পারত।

হযরত ওমর ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু সময় বিশেষে তাঁর মধ্যে কঠোরতার ও কোমলতার সংমিশ্রণ ঘটত। হযরত ওসমান ছিলেন অত্যন্ত কোমল, কিন্তু বিশেষ ক্ষণে বা প্রয়োজনে এই কোমলতার সাথে কঠোরতার কোন সংমিশ্রণ না হওয়ায ওমরের ন্যায় কালজয়ী শাসকের সম্মান হতে বঞ্চিত হলেন মহানুভব ওসমান। হযরত ওমব জিজ্ঞাসা করতেন সকলকেই, কিন্তু কাজ করতেন আপন বুদ্ধিতে এবং হযরত ওসমান সকলকেই জিজ্ঞাসা করতেন, কিন্তু কাজ কবতেন—দুষ্টেব সেবা মারওয়ানেব মতো।

হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফতকাল সর্বমোট ১২ বছর। প্রথম ছয় বছর (৬৪৪-৬৫০ খ্রীঃ) শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ; বিজয় ও গৌরবের যুগ। কিন্তু শেষ ছয় বছর বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, বিদ্রোহ ও রক্তপাতের করুণ মর্মান্তিক কাহিনীতে কলুষিত। কতিপয় চঞ্চল-স্বার্থান্বেষী কুচক্রী মানুষ হজরত ওসমানের সরলতা, উদারতা ও ধর্মভীরুতার সুযোগ নিয়ে খলিফার বিরুদ্ধে কতকগুলো অভিযোগ আনয়ন করে বিশাল ইসলামি রাষ্ট্রের সর্বনাশা পরিণাম ডেকে আনে। অভিযোগগুলো: (১) স্বজন-পোষণ, (২) অমিতব্যয়িতা, (৩) চারণভূমির অধিগ্রহণ, (৪) কাবাগৃহ সম্প্রসারণ, (৫) মদীনার বাজার, (৬) হযরত মাসুদের ভাতা বন্ধ, (৭) আবুজরের নির্বাসন, (৮) কোরআন শরীফের দগ্ধীকরণ।

প্রথম অভিযোগ— স্বজন-পোষণ: হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে বিশেষ কয়েকজন সারা দেশে স্বজন-পোষণের অভিযোগকে সোচ্চার করে তুলে ধরলেন। তাঁদের দাবি ছিল—খলিফা যোগ্য ব্যক্তিদের যোগ্য পদ হতে বরখাস্ত করে অযোগ্য আত্মীয়-স্বজনদের সেই সমস্ত পদে বহাল করেছেন। অনেক ঐতিহাসিক বিনা গবেষণায় ঐ সমস্ত মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগগুলোকে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু যুক্তি দ্বারা নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে দেখা যায় খলিফা এ ব্যাপারে একেবারেই নির্দোষী।

স্বজন-পোষণের প্রথম অভিযোগ: মুয়াবিয়াকে সিরিয়ায় গভর্নর পদে নিয়োগ। তিনি নাকি উমাইয়া বংশের এবং খলিফার আপন আত্মীয় ছিলেন। কথাটা সত্য। কিন্তু তাঁর নিয়োগের সাথে হযরত ওসমানের কোন সংযোগ ছিল না। যখন মুয়াবিয়ার বড় ভাই সিরিয়ার গভর্নর থাকাকালীন অবস্থায় মারা গেলেন, তখন হযরত ওমর মুয়াবিয়াকে ঐ পদে আসীন করেন। পরে ওমরের মৃত্যুর পর খলিফা ওসমানের কাউন্সিল বা সুরা ঐ নিযোগকে স্থায়ী বা Confirm করেন। সুতরাং খলিফা ওসমান এখানে নির্দোষ।

দ্বিতীয় অভিযোগ: হযরত ওমর কর্তৃক নিযুক্ত পারস্য বিজয়ী বীর সাদ-বিন-আবি ওয়াক্কাসকে অপসারণ করে খলিফা তাঁর দুধ-ভাই ওয়ালিদ বিন-ওকবাকে কুফায় প্রশাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই অভিযোগ আদৌ সত্য নয়। কেননা, হযরত ওমর জীবিতকালেই সাদের বিরুদ্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ ওঠায় তদন্তসাপেক্ষে তাঁকে কিছুদিনের জন্যে বসিয়ে দেন। এবং তাঁর স্থলে মুগিরা-বিন-শায়বাকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু যখন খলিফা ছুরিকাহত

হয়ে বিছানায় অন্তিম শয়নে শায়িত, তখন সাদের রিপোর্ট খলিফার সামনে হাজির করা হলে খলিফা ওমর সাদকে নির্দোষ দেখতে পেয়ে, ঐ অন্তিম শয়নেই খলিফা নির্দেশ দিলেন সাদকে পুনর্নিয়োগ করতে। এবং সেই মত সাদ আবার নিযুক্ত হন। সুতরাং খলিফা ওসমানের এ ব্যাপারে কোন দোষ ছিল না। পরবর্তীকালে সাদ বায়তুল মাল হতে প্রচুর পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিলে বায়তুল মালের কোষাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ্-বিন-মাসুদ বারবার তাঁকে তাগাদা দিয়েও কোন ফল না হলে ব্যাপারটা খলিফার কর্ণগোচর করেন। এবং খলিফা ও তাঁর 'সুরা' সাধারণের সম্পদ নষ্ট করার দায়ে সাদকে বরখাস্ত করেন। এবং ঐ পদে বীর ওয়ালিদ-বিন-ওকবাকে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ওকবা মদ্যপায়ী প্রমাণিত হলে খলিফা তাকে শুধু বরখাস্তই করেন নি, বেত্রাঘাতেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই ওকবা ছিলেন খলিফার নিকটতম আত্মীয়, খলিফা এখানে ন্যায়বিচার দেখাতে এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এবং পরে জনগণের ইচ্ছায় কুফার ঐ পদে সাইদ-আদ-আসকে শাসনকর্তা নিযুক্ত কবেন। এখানে খলিফা স্বজন-প্রীতির দোষে মোটেই দুষ্ট নন।

তৃতীয় অভিযোগ : কুফার নবনিযুক্ত গভর্নর সাইদ-আল-আস শাসনকার্যে যোগ্যতার পরিচয় দিতে না পারলে তাঁর স্থলে খলিফা আবু মূসা-আল- আশারীকে কুফা ও বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই মূসার সাথে খলিফার কোন রকমেরই রক্তের সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে জনগণ মূসার বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপন করলে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমিরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। এই আব্দুল্লাহ্ ইবনে পরবর্তীকালে দক্ষতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন—পারস্যের বিদ্রোহ দমনে, মার্ভ ও নিশাপুর দখলে এবং নানা সাংগঠনিক কাজে। আব্দুল্লাহ্ খলিফার নিকট-আত্মীয়। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি যখন তাঁর বিরুদ্ধে স্বজন-পোষণের দোষারোপ কবলেন তখন খলিফা কালবিলম্ব না করে যোগ্যতম ব্যক্তি আব্দুল্লাহকেও সেখান থেকে সরিয়ে নিলেন।

চতুর্থ অভিযোগ : মিশর বিজয়ী আমর-ইবন-আল-আসকে হযরত ওমর মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ইনি ছিলেন হযরত ওসমানের আত্মীয়। কিন্তু যখন এই আমরের সাথে সেখানকাব রাজস্ব সচিবের মতবিরোধ দেখা দিল, খলিফা রাজস্ব সচিব আব্দুল্লাহ-বিন-আলি-সাদকে বরখাস্ত না কবে আপন আত্মীয আমরকেই পদচ্যুত করলেন। এবং তাঁব পালিত ভাই আবুল্লাহ-ইবন-সাদকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মক্কা ও মদীনাব

অধিবাসীগণ ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর পুত্র মহম্মদকে সেখানকার গভর্নর রূপে দাবি করলে খলিফা তৎক্ষণাৎ তাদের দাবি পূরণ করেন।

এইভাবে তদানীন্তন কতকগুলো স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি কতিপয় মিথ্যা অভিযোগ সৎখলিফার বিরুদ্ধে উত্থাপন করে সমগ্র ইসলামি রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি করে! এই মিথ্যা অপবাদগুলোকেও কোন কোন ঐতিহাসিক লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে, জ্ঞানে-অজ্ঞানে সমর্থন করে গেছেন। যেমন, আমির আলী বলেন—"খলিফা ওসমান খলিফা ওমর কর্তৃক প্রায় সমস্ত শাসক সমরকুশলীদের পদচ্যুত করে ঐ সমস্ত স্থানে তাঁর আপন অযোগ্য আত্মীয়-স্বজনদের নিয়োগ করেন।" এই মন্তব্য খলিফা ওসমান সম্পর্কে বড়ই মর্মান্তিক, ভ্রান্তিকর, ভিত্তিহীন এবং অযৌক্তিক। মহম্মদ আলী বলেন—"যদি তিনি আত্মীয়দের নিযুক্ত করে থাকেন তাহলে একইভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হলে তাঁদের অপসারিত করতেও কালবিলম্ব করেন নি।" নির্দিষ্ট দোষের জন্য অপসারণ করাটা কোন দিক থেকেই দূষণীয় হতে পারে না। তাতে অপসারিত ব্যক্তি যিনিই হন না কেন। ইসলামের ইতিহাসে এ কথা কারো নিকট অবিদিত নেই—হযরত ওমর শুধু ইসলাম জগতের নয়, সমগ্র জগতের নজিরবিহীন বিরল বিচারক, সেই ক্ষুরধার মহাবিচারকের হাতে ইসলামের মহাবীর খালিদ-বিন-ওয়ালিদ, মুগিরা, সাদ-বিন-ওয়াক্কাস প্রমুখ ইতিহাস বিখ্যাত বীরদেরও বিচারের হাতে বরখাস্তের গ্লানীময় শাস্তি মাথা পেতে নিতে হয়েছে। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব-ইতিহাসে আজও এমন একজনও জন্ম নেননি, যিনি এই ব্যাপারে খলিফা ওমরকে দোষারোপ করা তো বহু দূরের কথা, তাঁর সততায়, সাধুতায় সন্দেহ পর্যন্ত প্রকাশ করতে পারেন। সুতরাং অন্যায়ে বরখাস্ত করাটা দূষণীয় নয়, বরং ন্যায়েরই পরিচায়ক।

পঞ্চম অভিযোগ— অমিতব্যয়িতা : খলিফার বিরুদ্ধে বায়তুল-মালের অর্থ অপচয় ও অমিতব্যয়িতার অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু এ অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। তবুও একথা ওঠার পেছনে প্রথম কারণ খলিফার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি উচ্চপদে আসীন থেকে সরকারি অর্থ অপচয় না করলেও এমন ব্যবহার করতে থাকেন, যাতে জনগণ স্বয়ং খলিফার প্রতি রুষ্ট হয়ে ওঠেন এবং নানা কথা বাজারে রটে যায়। এর মূলে একমাত্র দোষী ব্যক্তি বলতে গেলে তদানীন্তন সিরিয়ার গভর্নর দুষ্ট প্রতিভা মুয়াবিয়া এবং বায়তুল মালের সচিব মারওয়ান প্রমুখ। এরা খলিফার সরলতা, উদারতা ও ধর্মভীরুতার সুযোগ নিয়ে খলিফাকে দোষী করে। দ্বিতীয়ত, খলিফা

ওসমান ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব হতেই ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাই তাঁকে 'গনী' বা ধনী আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর বিশাল ধন-সম্পদকে মহানবীব পাযে লুটিযে দিযে নিজেকে ধন্য মনে কবেছিলেন। পানীয় জলের অভাবের সময় 'বীয়েরুমা' তাঁরই কীর্তি, এবং তাবুক অভিযানে অকাতরে ধন-সম্পদ দান তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, ও মসজিদে নববীর সম্প্রসারণে তাঁর যে দান, সে কথা ইসলামের ইতিহাস কোনদিনই অস্বীকার কবতে পারবে না। তৃতীয়ত, খলিফা নিজে কোনদিনই বাযতুল মাল হতে কোন বকমের ভাতা গ্রহণ করতেন না, সুতবাং যে খলিফা নিজেব খবচ বাবদ এক পয়সাও গ্রহণ করতেন না, তিনি সরকারি পয়সা নষ্ট করবেন, এ কথা একেবাবেই অবান্তর ও অবিশ্বাস্য। চতুর্থত বলা হয, তিনি নাকি আত্মীয-স্বজনকে সরকাবী অর্থ দান করতেন। এ কথা ঠিক নয়। হযবত ওসমান খলিফা হওয়ার পূর্ব হতেই গরিব আত্মীয়-স্বজনকে কিছু কিছু দান করতেন, সেটা খলিফা হওয়াব পরও করতেন। এই কাজটাকে কেউ কেউ অন্যরূপে রূপ দান কবে খলিফাকে দোষী করেছে।

হযরত ওসমান নিজে বলেন—"আত্মীয-স্বজনদেব প্রতি আমাব দানেব কথা বলতে গেলে, আমি ওদের যা কিছু দান কবি, আমাব নিজস্ব সম্পত্তি হতেই কবি। ব্যক্তিগতভাবে সবকাবি সম্পত্তিব কথা বলতে গেলে আমি তাকে আমাব নিজেব জন্য বা অন্য কাবোব জন্য হালাল মনে কবি না।" পঞ্চমত, খলিফা ন্যাযবিচাবে কোনদিনই স্বজনপ্রীতিব দ্বাবা প্রভাবান্বিত হননি। কোন এক সময ত্রিপলী যুদ্ধের পূর্বে আব্দুল্লাহ্-বিন আবিসাবাহকে এক-পঞ্চমাংশ গনিমাহ (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) দানেব কথা দিযেছিলেন। যুদ্ধেব পব ঐ কথা খলিফা বক্ষা কবলে জনগণেব মধ্যে কিছু অসন্তোষ দেখা দেওযায খলিফা পুনরায তাকে ঐগুলো ফেবত দেওযাব নির্দেশ দেন। আমিব আলী বলেন, "খলিফা স্বভাবত নিজস্ব গবিব আত্মীযদেব অর্থদান কবতেন এবং বিভিন্ন সমযে দুষ্ট প্রতিভা মারওয়ানকে বাযতুলমালেব কর্তৃত্ব দান কবেন, যা খলিফাকে জনগণেব মধ্যে অপ্রিয় করে তুলেছিল।"

ষষ্ঠ অভিযোগ—চারণভূমির অধিগ্রহণ: বিদ্রোহীগণ খলিফাব বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন তিনি সবকাবী চাবণভূমিকে অধিগ্রহণ কবেছেন। কিন্তু একথা আদৌ সত্য নয। কেননা স্বযং মহানবী ও খলিফা ওমব পর্যন্ত এই চাবণভূমিতে সবকাবি পশু ব্যতীত জনসাধাবণেব কোন পশুকে ব্যবহাব কবতে দিতেন না। খলিফা ওসমান ঐ একই নিযম মেনে চলেন। সবকাবি চাবণভূমিকে খলিফা হিসাবে তাঁকে বক্ষণাবেক্ষণ কবতেই হতো। এটা ছিল তাঁবই দাযিত্ব। অভিযোগ একেবাবেই মিথ্যা।

সপ্তম অভিযোগ—কাবাগৃহের সংস্কার: খলিফা হযরত ওমর কাবাগৃহের সংস্কার কাজ আরম্ভ করেন এবং খলিফা ওসমান ৬৪৭ খ্রীস্টাব্দে এই কাজ সুসম্পন্ন করেন। খলিফা ওমর যখন সম্প্রসারণের কাজ আরম্ভ করেন, তখন এই সম্প্রসারণের কাজে যাঁদের জমি পড়ল, তাঁরা স্বেচ্ছায় খলিফাকে তাঁদের দাবি ত্যাগ করার স্বীকৃতি দিলেন। কিন্তু হযরত ওসমানের সময় তাঁরা তাঁদের দেওয়ার কথা অস্বীকার করতে এতটুকুও লজ্জাবোধ না করে নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি কবে বিদ্রোহের সূচনা করেন। এবং সেই বিদ্রোহ পবিত্র কাবা শরীফের কাজকে প্রায় বন্ধ করার পথে আনলে খলিফা তাঁদের জমির উচিত মূল্য দেওয়ার জন্য কথা দিলেন, কিন্তু তবুও তাঁরা তাঁদের বিদ্রোহ বন্ধ না করলে খলিফা শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য তাঁদের কারারুদ্ধ করেন। দক্ষ শাসক ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ হিসাবে বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে খলিফার এই পথ অবলম্বন করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না। এখানেও খলিফা নির্দোষ।

অষ্টম অভিযোগ—মদীনার বাজার: অনেকে অভিযোগ করেন খলিফা মদীনার বাজারকে ব্যক্তিগত কাজে লাগান। এ কথা ভিত্তিহীন। ইমাদুদ্দীনের মতে—"মদীনার বাজারে খলিফা সরকারি কাজের সুবিধার জন্য কয়েকটি জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দেন। এবং রাষ্ট্রের উষ্ট্র সমূহেব আহারের জন্য খেজুর বিক্রিকে বাধ্যতামূলক করেন।"

নবম অভিযোগ—হযরত মাসুদের ভাতা বন্ধ: কোন এক সময অভিযোগ উঠলে খলিফা হযরত আবুল্লাহ বিন মাসুদের ভাতা দেওয়া স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন ও অনুসন্ধান করার আদেশ দেন। পরে খলিফা যখন সত্যাসত্য অবগত হলেন, তখন মাসুদ ইহলোক ত্যাগ করায় খলিফা তাঁব যাবতীয় পাওনা ভাতা ২৫০০০ দিরহাম অনতিবিলম্বে তাঁর পরিবারবর্গকে প্রদান করেন। এতে খলিফার দোষ কোথায়!

দশম অভিযোগ—আবুযর আল-গিফারীর নির্বাসন: আবুযর ছিলেন মহানবীর একজন অত্যন্ত প্রিয়তম সাহাবী। তিনি ছিলেন তাপস—সাধকপ্রাণ তখন খলিফা ওসমানের খিলাফতকাল চলছে। আবুযর সিরিয়াতে ছিলেন। সিরিয়ার গভর্নর ধন-সম্পদ লোভী মুয়াবিয়ার ব্যবহার তাঁর মোটেই ভাল লাগে নি। তিনি জোর প্রতিবাদ আরম্ভ করলেন প্রচুর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করা চলবে না। কেননা, ইটা ইসলামকে ধ্বংস করবে। মুসলমানকে মূল লক্ষ্য হতে দূরে সরাবে। এইভাবে হযরত আবুযর জনমত গঠন করতে আরম্ভ করলে স্বার্থান্বেষী মুয়াবিয়া প্রমাদ গুনলেন। তিনি সুকৌশলে

আবুযরকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। আবুযর খলিফাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। খলিফা তাকে বললেন সরকারকে যাকাত হতে বঞ্চিত করে ধনসম্পদ সঞ্চয় করা ইসলাম-বিরুদ্ধ। কিন্তু যাকাত প্রদানের পর কোন ব্যক্তিকেই তাব নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ হতে বঞ্চিত করাও ইসলাম-বিরুদ্ধ। এখানেই আবুযবেব সাথে খলিফার মতবিরোধ দেখা দিল। আবুযর সূফী ধর্মের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু খলিফাকে আপন বিরাট দায়িত্ব পালন করতেই হবে। এই মতবিরোধ সত্ত্বেও খলিফা আবুযরকে মদীনায় সসম্মানে থাকার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু তিনি নিজে রাবাযায় গমন করেন। এতে খলিফার কোন হাত ছিল না। দুর্ভাগ্যবশত দুবছর পরই আবুযর মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন কতিপয় বিদ্রোহী এই বিষয়টিকে নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি করতে থাকল। কেউ কেউ বলেন—খলিফা আবুযরের মত তাপস ব্যক্তিকে অপমানিত করলেন, নির্বাসিন দিলেন। কিন্তু এ কথা আদৌ সত্য নয়। আবুযর সত্যিকারই একজন তাপস ব্যক্তি ছিলেন। ইসলামি সমান-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আমবণ সংগ্রাম কবে গেছেন। ইসলামের নিখুঁত আদর্শকে নিজ জীবনে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাতে কোনদিনই পশ্চদপদ হন নি। খলিফাও তাঁব প্রতি কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করেন নি, এমনকি, আবুযরের মৃত্যুর পর খলিফা তাঁর স্ত্রীকে অর্থ সাহায্য দান কবেন। এবং আবুযরও খলিফাব বিরুদ্ধে কোনদিনই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নি।

একাদশ অভিযোগ—কোরআন শরীফ দগ্ধীকরণ: হযবত ওসমানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ছিল কোরআন শরীফ পোড়ানো। বিদ্রোহীগণ অভিযোগ আনলেন খলিফা কোরআন শরীফ পুড়িয়েছেন। এই অভিযোগটিকে যুক্তি ও প্রমাণেব সাহায্যে বাতিল করার কোন প্রয়োজন হয় না। কেননা যে খলিফা একদিন এই কোবআন শরীফের জন্যই নিজে দেশান্তরিত হয়েছিলেন, নিজ জীবনের বহু কষ্টের সঞ্চিত ধনরাশি এই পবিত্র কোরআনের সম্মানার্থেই মহানবীর দুই হাতে তুলে দিয়েছিলেন, যে কোরআন শরীফ প্রচাবেব জন্য বদব ব্যতীত ইসলামেব এমন কোন যুদ্ধ নেই যাতে যোগদান কবেন নি, যে কোবআন শরীফেব জন্য বিখ্যাত হুদাইবিয়ার সন্ধিতে জীবনকে বিপন্ন কবে মক্কাব কোবেশদেব নিকট হাজিব হলেন, সেই মানুষ কোন্ জ্ঞানে কি কবে কোবআন শরীফকে পুড়িযে দিতে পারেন ? হয তিনি নিজে পাগল হযেছিলেন, নতুবা যাঁবা একথা তুলেছিলেন তারা পাগল। ইসলামেব খলিফা ঠিকই ছিলেন, এবং যাঁবা প্রশ্ন তুলেছিলেন তাবাও ঠিক ছিলেন, তবে প্রশ্নটা ছিল পাগলেব প্রশ্ন।

অভিযোগকারীদের আহ্বান :

খলিফা ওসমান অভিযোগকারীদের প্রকাশ্যে জনসমাজে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য সকলকে আহ্বান করলেন---হজ-মৌসুমে একত্রিত হওয়ার জন্য। এবং তিনি ঐ সময় মজলিস-উস-শুরার বৈঠকও ডাকলেন। যাতে ঐ বৈঠক সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা বা গ্রহণ করতে পারে। যাঁদের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বেশি অভিযোগ ছিল, খলিফা তাঁদেরও হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন। যেমন সিরিয়ার শাসনকর্তা আমর-ইবন-উল-আস্ প্রমুখ।

খলিফা সমগ্র দেশের প্রকৃত স্বরূপ নিরপেক্ষভাবে জানার জন্য কতিপয় গুপ্তচরও নিযুক্ত করলেন, যাতে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যথাসময়ে হজের দিন ঘনিয়ে এল, কিন্তু অভিযোগকারীদের একজনও হাজির হলেন না। জনগণের সম্মুখে মজলিস-উস-শুরার সম্মুখে খলিফা নিজেই বিচারপ্রার্থী হলেন। তিনি শুরা ও জনগণের নিকট হতে রায় নিতে চাইলেন---কি করবেন। যেখানে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো---অনিষ্টকারীদের, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কঠোর হস্তে দমন করে খলিফাকে রাজ্য পরিচালনা করতে হবে। খলিফা জনগণের রায়, শুরার অভিমত মাথা পেতে মেনে নিলেন। কিন্তু সকলেই বুঝতে পারলেন বিদ্রোহীগণ সম্মুখে যখন এলেন না, তাঁরা পশ্চাতে সক্রিয় থাকবেনই। সম্মুখে আসার মত সৎসাহস তাঁদের ছিল না। কিন্তু দুষ্কর্ম করার যথেষ্ট প্রবণতা ছিল। তাই খলিফার জীবন-বিপন্ন বোধ করায় অনেকে তাঁকে মদীনা হতে সিরিয়ায় যাওয়ার কিংবা দেহরক্ষী নিযুক্ত করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু খলিফা নিজের জীবনের জন্য কোনটাই মেনে নিলেন না। তাই পরিণতি হিসাবে একদিন ইসলামের সেবায় উৎসর্গিত জীবন, আল্লাহতে সমর্পিত প্রাণ, মহানবীর একান্ত জন, আশারায়ে মুরাশ শেরনীন'দের (স্বয়ং মহানবী যে দশজনের জান্নাৎ লাভ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন---সেই সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের) একজন অকাতরে শহীদ হয়ে অক্ষয় অমর স্মৃতি শাহাদতের গৌরব অর্জন করলেন।

হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মূল কারণগুলো

নানা জাতির নানা বর্ণের উত্থান-পতনের বিশ্ব-ইতিহাস লক্ষ্য করলে যে চিত্রটি দেখা যায়, আরবের মুসলিম ইতিহাসও তার ব্যতিক্রম নয়। যখন একটি মানুষ বা পরিবার বা সমাজ বা জাতি গড়ে ওঠে তার পেছনে থাকে কতকগুলো কারণ। আবার যখন তার পতন হয় তারও পশ্চাতে রয়ে যায় বেশ কিছু কারণ। এই উত্থান পতনের ইতিহাসে একটি মানুষকে কিছুটা দাযী করতে পারা যায়, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ দোষী করা যায় না। আবার যখন উন্নতির

ঊর্ধ্বে আরোহণ করল, তখন তাকে পথ দেখিয়েছেন স্বয়ং স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ দূত মহানবী (দঃ)। মহানবী নতুন জাতির নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর নিকটতম সাহাবী খলিফাগণ সুসংহত আরব জাতির কাছ থেকে যেমন প্রেরণা পেয়েছেন তেমনি পেয়েছেন তাদের সমালোচনা।

সুখ ও সমৃদ্ধিকে জয় করা যত শক্ত, তাকে ধরে রাখা অধিক শক্ত। ইসলামের ইতিহাসে তার মূলত প্রমাণ বর্তমান। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) পর্যন্ত ইসলামের উন্নতির ধারা সকল দিক থেকেই অক্ষত ও অব্যাহত ছিল। যেমনই তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) খেলাফতের দায়িত্ব নিলেন, তেমনি জাতীয় চরিত্র যেন অন্যদিকে মোড় নিল। এখানে খলিফার চরিত্রকে দোষী-নির্দোষীর কাঠগড়াতে দাঁড় করানো ঠিক হবে না। খলিফা ওমরের পর আমরা লক্ষ্য করেছি—জাতিয় চরিত্রকে কলঙ্কিত করে তুলেছে জাতির হিংসা, বিদ্বেষ, বৈষম্য, বিলাস-ব্যসন, ব্যক্তিস্বার্থ, স্বার্থপরতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, অহংকার, আত্মগরিমা, সবের উপর গোত্রীয় জাতীয় গণ্ডগোল এবং অনৈসলামিক কার্যকলাপ প্রভৃতি। এখানে খলিফা ওসমানের কিছুটা দায়িত্ব ছিল, তবে তিনি একাকী দোষী নন। যেহেতু কোরআন বলে :

নিঃসঙ্কোচে নিখিলের বুকে ঘোষণা করেছে কোরআন—
জাতির ভাগ্য জাতিরই হাতে জাতি আনে উত্থান।

কোরআন— ৮ : ৫৩

এখানে আমরা দেখবো কোন্ কোন্ কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হলো।

আদর্শের অধঃপতন :

হযরত ওসমানের জীবনাবসানের কাছাকাছি যেটা সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল সেটা হল আদর্শের অধঃপতন। মহানবী জাতির সামনে তুলে ধবেছিলেন এক মহান আদর্শ। সেই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন তাঁর সাহাবায়ে কোরাম মহান সাথীগণ। তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব দেখে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে কেউবা বিস্ময় বোধ করতেন, কেউবা সম্মানে মাথা নুয়ে দিতেন, কেউবা সম্মানের বাহু বাড়িয়ে দিতেন, কেউবা সমীহে অন্তরের গোপন শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেন। আজ সেই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত পুরুষদের প্রায় সকলেই ইহলোক ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আজ হতে প্রায় ২৫ বছর পূর্বে মহনবী (সাঃ) ধরাধাম ছেড়ে চলে গেছেন। আজকে আব হযবত আবুবকবের অশ্রুসজল নয়ন-যুগল মানুষকে পাগল করে না, হযরত বেলালের কণ্ঠধ্বনি ঘুমন্ত মানুষকে তন্ময় করে তোলে না, আজ আর আমিরুল মোমেনিন হযবত ওমব ফাকুকেব ন্যায়বিচাবেব বেত্রাঘাত বিশ্বহৃদয়কে প্রকম্পিত

করে তোলে না। আজ জাতীয় চরিত্রকে ষড়রিপু যেন গ্রাস করে তুলেছে। বিদ্রোহের এটা ছিল প্রধান কারণ---জাতীয় চরিত্রের অধঃপতন, আদর্শের অধঃপতন।

আরব মুসলমান ও অ-আরব মুসলমান :

মহানবী হতে হযরত ওমর ফারুক পর্যন্ত আরব ও অ-আরব মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়নি। যদিও পার্থক্য কিছুটা ছিল, কিন্তু সে পার্থক্য মারাত্মক রূপ ধারণ করেনি। সকলেই সমান ব্যবহার পেতো। সকলকেই এক ইসলামের অমোঘ বিধানে বিচার করা হতো। সেইজন্য তখনকার দিনে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি আরব মুসলমান ও অ-আরব মুসলমানের মধ্যে বিভেদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। মুসলমান যেন দেহের দিকে না হলেও মনের দিকে দু'ভাগে ভাগ হল। একটি জাতির জীবনে এটা কম কথা বা কম ক্ষতি নয়, এটা ছিল বিদ্রোহের প্রকাশ্য প্রথম বীজ স্বরূপ।

কুরাইশ ও অকুরাইশদের মধ্যে বিরোধ :

মুসলমান প্রথম দু'ভাগে বিভক্ত হলো---আরব মুসলমান ও অ-আরবীয় মুসলমান। আরব মুসলমানরাও আবার দু'ভাগে বিভক্ত হল---কুরাইশ ও অকুরাইশ মুসলমান। ইসলামের প্রথম যুগে কোন ভেদ ছিল না। সকলেই ইসলামের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ ছিলেন। ইসলামের সকল সুযোগ-সুবিধাও তাদের কাছে সমান ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে এর ব্যতিক্রম দেখা গেল। হযরত ওমর কুরাইশ বা আরব মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী নীতির ফলে কোথাও জমি-জায়গা কেনার অনুমতি দেননি। হযরত ওসমান এই নীতির ব্যতিক্রম করে মহা ভুল করলেন। কুরাইশদের দবদবা-শানাশওকত অকুরাইশদের বা অ-আরবীয়দের ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠল। কুরাইশদেরও চরিত্রে অধঃপতন হল। দেখা দিল উভয় দলে কলহ-অশান্তি। এই কলহ ত্বরান্বিত করল জাতীয় অনৈক্যকে, ধ্বংস করল জাতির ঐতিহ্যকে।

বানু হাশিম ও বানু উমাইয়াদের কলহ :

কুরাইশদের নিজেদের মধ্যেও বিভেদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এই বিভেদ বহু পূর্ব হতেই ছিল। এর জন্য মক্কা বিজয়ের পূর্ব দিন পর্যন্ত স্বয়ং মহানবী (সাঃ)-কে কম দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়নি। পরবর্তীকালে তাঁর তুলনাবিহীন বিরল ব্যক্তিত্বে সবকিছু ধামা চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু চরম জ্ঞাতিহিংসা অজ্ঞাতে কোথায় যেন লুকিয়ে ছিল। হযরত ওসমানের খেলাফতের শেষের দিকে সেই জ্ঞাতিহিংসা চরমভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। আমীর আলি

বলেন—"হযরত ওসমানের সময়ে হাশেম ও উমাইয়া গোত্রের মধ্যে যে শত্রুতার সূচনা হয়, তা এক শতাব্দীরও অধিক কাল স্থায়ী হয়।" যখনই উমাইয়া বংশের প্রথম ব্যক্তি হযরত ওসমান খলিফা হলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অধিকাংশই যেন ইসলামের মহিমাকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে বংশের মহিমায় মেতে উঠলেন। অন্যদিকে খলিফার আপন গোত্রের প্রতি কোন বিশেষ দুর্বলতা না থাকলেও ভালবাসা ছিল। এটা কোন দোষের নয়। এই ভালবাসাকে হাশিমীগণ অন্যভাবে দেখল। বেধে উঠল প্রবল বিরোধ। আপন গোত্রীয় ব্যক্তিকে খলিফার পদে আসীন দেখে কোন কোন উমাইয়া গোত্রের ব্যক্তি ধরাকে সরা জ্ঞান করায় শত্রুতার গতি ত্বরান্বিত হলো। খলিফা ছিলেন অত্যন্ত কোমলচিত্তের মানুষ, তাই কঠোর হতে পারেন নি।

আনসার ও মুহাজেরিনদের মধ্যে বিরোধ :

মহানবী (দঃ) মক্কা হতে মদীনায় গমন করলে সেখানকার অধিবাসীগণ অর্থাৎ আনসারগণ মক্কার মুহাজেরিনদের যে ভাবে বরণ করেছিলেন, তা বর্ণনার অতীত। এত সৌহার্দ্য, এত ভালবাসা, এত ত্যাগস্বীকার পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও নেই। যাঁর যা কিছু ছিল তার অর্ধেক মুহাজের ভাইকে দান করেছিলেন, মৃত্যুর পর সম্পত্তির অংশও দিয়েছিলেন। এমনকি, কারো দুটো স্ত্রী থাকলে, সুন্দরীটিকে পরিত্যাগ করেছিলেন মুহাজের ভাইকে তাঁর স্ত্রী রূপে দান করতে। এই স্বর্গীয় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল মহানবীর স্নেহনিবিড় বন্ধনে। এই মুহাজেরগণও পরবর্তীকালে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন আনসারদের তুলনায় অবহেলিত হওয়ার জন্য। এবং আনসার ও মুহাজেরদের মধ্যে বৈষম্য-বিরোধ প্রবল আকার ধারণ করে রাষ্ট্রের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে।

হিমারাইত ও মুযহারাইতদের কলহ :

সমগ্র আরব তখন দুটো ভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তর আরব ও দক্ষিণ আরব। উত্তর আরব অধিবাসীদের মুযহারাইত ও দক্ষিণ আরবের অধিবাসীদের হিমারাইত বলা হত। বংশগৌরব ও কৌলিন্যপ্রথা নিয়ে এই দু'দলের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিরোধ চলছিল। একমাত্র মহানবী (সাঃ) ও তাঁর পরবর্তী দুই খলিফা এদের মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করেন, তা সত্ত্বেও মদীনা ব্যতীত অন্য কোথাও তাঁরা বড় একটা এক থাকতে পারতেন না। আমির আলি বলেন—"মুযহাবাইত ও হিমাবাইতদের পূর্বতন ঈর্ষাভাব সাময়িকভাবে দূরীভূত হলেও পুনবায় উহা মাবাত্মক পরিণতি সহ ইসলাম জগতে মাথাচাড়া দিয়ে

উঠল।'' হযরত ওসমানের খেলাফতকে এই দ্বন্দ্বও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে জাতীয় জীবনে পর্বতপ্রমাণ ব্যবধান সৃষ্টি করে।

মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ :

মহানবী (দঃ)-এর সময় হতে খলিফা ওমর (রাঃ) পর্যন্ত মুসলমান ও অমুসলমান অধিবাসীরা সুখে-শান্তিতে বসবাস করছিলেন। এর মূলে ছিল ইসলামের উদার ও মহান নীতি, যার কোন স্খলন তখনও ঘটেনি। তখন মুসলমানদের ত্যাগ ও সাধনা সকলকেই মুগ্ধ করতে পেরেছিল। পরবর্তীকালে মুসলমানগণ সেই আদর্শ, ত্যাগ ও সাধনাকে ভুলে গেল। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তাদের গ্রাস করে বসল। তদানীন্তন মুসলমানদের ভূমিকায় ইসলামের তেজ ও মহিমা মানুষকে আর দীর্ঘদিন আকর্ষণ করতে পারল না। মুসলমানরা নিজেরাই ইসলামের মহিমা হতে দূরে সরে যাওয়ায় অন্যান্য বিধর্মী অমুসলমানগণও স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের নিকট হতে দূরে সরে গেলেন। হারাল একাত্মতা বোধ, সৃষ্টি হল বিরোধ।

ভণ্ড মুসলমানের অপপ্রচার :

ইসলামের শান-শওকত, মান-মর্যাদা সকল কিছু যখন উচ্চ মার্গে পৌঁছাল, তখন অনেকেই ইসলামের শাশ্বত গুণে না হলেও ইসলামের যুদ্ধলব্ধ ধনে লুব্ধ হয়ে মুসলমান হয়েছিল। তারা ভেবেছিল মুসলমান হয়ে দু'হাতে বেশ কিছু কামিয়ে নেবে, আখের গুছিয়ে নেবে। কিন্তু ইসলামের খলিফা যখন কোমল প্রাণে কঠোর হস্ত সম্প্রসারিত করলেন, তখন অনেকেরই দিব্যজ্ঞান লাভ হল। তারা তখন খলিফার বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করল। খলিফা ওমরের সময় অবশ্য এরকম কোন প্রবণতা দেখা দেয়নি। কারণ তিনি ছিলেন লৌহমানব। যখন কোমল-চিত্ত ওসমানের সময় এল তখনই এই শ্রেণীর মুসলমানের বিড়ম্বনা ইসলামকে বা মুসলিম খেলাফতকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলল।

আব্দুল্লাহ্ ইমনে সাবা ছিলেন ভণ্ড মুসলমানদের অন্যতম। ইনি প্রতারকও ছিলেন। ইয়েমেনের নিগ্রো ইহুদী সন্তান বসরার শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ বিন আসিরের নিকট ইনি ইসলামে দীক্ষিত হন। পরবর্তীকালে ব্যক্তিস্বার্থেব বশবর্তী হয়ে হযরত আলীর খেলাফতের দাবিতে খলিফা ওসমানের বিরুদ্ধে প্ররোচনা জোগাতে থাকেন। এই আন্দোলন পববর্তীকালে 'সাবাইত' (Sabaism) বা উগ্র শিয়া মতবাদ নামে পবিচিত হয়। তাবাবী বলেন—''মুসলমানদের ভুল

পথে পরিচালিত কয়ার জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে গমন করেন।'' বসরা ও কুফা হতে বহিষ্কৃত হলে মিশরে গমন করে খলিফার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অভিযোগ প্রচার করেন। কোন এক সময় ভুলবশত হাকিম বিন জাবালা ও মহম্মদ বিন আবুবকবেব মত মানুষও তাঁকে সমর্থন করেন।

কেন্দ্রীয় শাসনের বিরোধিতা :

সমগ্র আরব ছিল চির স্বাধীনচেতা। কেউ কারো অধীনে থাকতে ভালবাসত না। দুর্বার ইচ্ছার বেগে ছুটে চলত আরবের বল্গাহীন জীবন। এত স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি পৃথিবীর ইতিহাতে বিরল। উগ্র গোষ্ঠীপ্রিয়তা তাঁদের মজ্জাগত ছিল। এই সমস্ত কিছুকে ভেঙে চুবমার করে মহানবী তাদের একত্র করে এক বিশ্ববিজয়ী জাতিতে পরিণত করেন। কিন্তু তাদের শিরায় শিরায় ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বাদ ফল্গুব মত প্রবাহিত ছিল। পরবর্তীকালে তারই প্রকাশ দেখা দিল। তাই তারা কেন্দ্রের বিরোধিতা আরম্ভ করল। এখানে খলিফা ওসমান চরিত্রের দোষ বলতে তিনি এই বিদ্রোহকে দমন করতে অসমর্থ হয়েছিলেন। তাই বিদ্রোহের কারণগুলো সম্পর্কে ঐতিহাসিক বার্নার্ড লুইস বলেন— ''প্রকৃতপক্ষে কারণ আরো গভীরে ছিল, এবং তাঁর দোষ বলতে—তিনি বিদ্রোহের কারণগুলো অনুধাবন করে নিয়ন্ত্রণ অথবা প্রতিকারে অক্ষম ছিলেন।''

দীন ও মুরুওয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব :

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, অনেকেই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন—ইসলামের মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হয়ে নয়; বরং ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান লাভের আশায়। তাই সেখানে একদিকে ছিল ইসলামের অনাবিল তৌহিদবাদ এবং অন্যদিকে ছিল পৌত্তলিক আরবের প্রাচীন ধর্মীয় সংস্থা, যাকে বলা হত 'মুরুওযা' (Muruwwa)। এই মুরুওয়াপন্থীরা যখনই দেখল ইসলামে দীক্ষিত হয়ে কোন লাভ নেই, তখনই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে আপন পূর্বপুরুষদের ধর্মীয় প্রথাকেই প্রাধান্য দান কবল। এব জ্বলন্ত প্রমাণ আমরা দেখতে পাই ইসলামেব প্রথম খলিফা আবুবকরের সময়। মহানবীর সময়ে তারা মাথাচাড়া দেওয়াব আর সাহস করেনি। যখনই তিনি ইহলোক ত্যাগ কবলেন, সঙ্গে সঙ্গে মুরুওয়াপন্থীগণ ইসলামেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। যা ইসলামেব ইতিহাসে রিদ্দা যুদ্ধ নামে অভিহিত, অর্থাৎ স্বধর্ম ত্যাগীদেব আন্দোলন বা যুদ্ধ। ইসলামেব প্রথম খলিফা আবুবকব এই আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করেন। অতঃপব ওমবেব সময কঠোব শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত

হওয়ায় কেউ কোন রূপ বিদ্রোহ করতে সাহস পায়নি। যখনই হযরত ওসমানের রাজত্বকাল আরম্ভ হলো সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনপন্থীরা মাথাচাড়া দিল। এদের অধিকাংশই ছিল নামে মাত্র মুসলমান, তারা কোনদিনই ইলামের সাম্য, শান্তি ও ভ্রাতৃত্বে আস্থা স্থাপন করতে পারেনি। শাস্ত্রীয় বিধিবিধানে, শৃঙ্খলিত জীবনে, সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় তারা কোনদিনই অভ্যস্ত ছিল না। তাই কোমল মতি খলিফা হযবত ওসমানের সময় তারা যেন তাদের উত্থান ও বিদ্রোহের সুযোগ পেল।

কুচক্রী মারওয়ানের প্রভাব :

যখন একের পর এক মহানবীর ঘনিষ্ঠ সাহবীগণ পরলোকগমন করেন, তখন খলিফা ওসমানের সময়ে ঐ সমস্ত পদ প্রায়ই পূর্ণ হলো উমাইয়া বংশের লোক দ্বারা। হযরত ওসমানের চরম দুর্ভাগ্য তাঁর নিকটতম সহযোগী বা প্রধান সচিব বা উপদেষ্টার স্থান লাভ করল তাঁর চাচাতো ভাই ও জামাতা মারওয়ান। মারওয়ান ছিলেন দুর্নীতিপরায়ণ কুচক্রী মানুষ এবং খলিফা ওসমান ছিলেন ন্যায়পরায়ণ সরল মানুষ। সুতরাং খলিফা সহজেই মারওয়ানের হাতে শিকার হলেন। এই মাবওয়ান সম্পর্কে আমির আলি বলেন—''তিনি (খলিফা) অজ্ঞাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পূর্ব ধারণা অনুযায়ী তাঁর পরিবারের প্রভাবাধীন হলেন। মহানবী কর্তৃক একবার বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে বহিষ্কৃত এবং উমাইয়াদের মধ্যে অন্যতম নীতিজ্ঞান বর্জিত ব,ক্তি সচিব মারওয়ান কর্তৃক তিনি পরিচালিত হলেন।'' তিনি শুধু আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য স্বগোত্রীয় লোকদের উচ্চপদে নিয়োগ করে হাশেমীদের যোগ্য লোকদের বঞ্চিত করেন। অন্যদিকে খলিফার সমস্ত ব্যক্তিকে নিজের কুক্ষিগত করেন এবং প্রধান মন্ত্রীরূপে দু'হাতে শক্তির অপব্যবহার করতে থাকেন। শক্তির এই অপব্যবহারেই দুটি জিনিসকে খুবই ত্বরান্বিত করল—একটি খলিফার অপমৃত্যু এবং অন্যটি খোলাফায়ে রাশেদিনদের যবনিকাপাত। সুতরাং ধূর্ত, কপট ও কুচক্রী মারওয়ানের পক্ষপাতিত্ব, দুর্নীতি, স্বজন পোষণ প্রভৃতি খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল। অন্যদিকে একই গোত্রের একই চরিত্রের অন্য একজন মুয়াবিয়া সিরিয়াতে উমাইয়া শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বসেছেন। পরবর্তীকালে তাঁরও ইতিহাস খোলাফায়ে রাশেদিনকে সরাসরি পথে বসিয়েছে। ইসলামের ইতিহাসের কলঙ্কিত বা করুণ ইতিহাস ''খোলাফায়ে রাশেদিনের'' পতন, যাব সূচনাতে মাবওযান এবং সমাপ্তিতে মুয়াবিয়া। এই দু'জনই পবিত্র ইসলামেব ইতিহাসে কুখ্যাত চরিত।''

নীতির রদবদল :

আমিরুল মোমেনিন হযরত ওমব (র'ঃ) তাঁব বিস্ময়যকব প্রতিভা দ্বারা আবব জাতীযতাবাদ গড়ে তুলেছিলেন। তিনি সমগ্র আববকে একটি দুর্গে এবং একটি নিষ্কলুষ সামবিক জাতিতে প'বিণত কবেন। তাই তাঁদেবকে বহির্জগতের সংমিশ্রণের আবিলতা হতে মুক্ত বাখাব জন্য যা কিছু কবাব প্রয়োজন ছিল, তিনি সমস্তই করেছিলেন। সেনাবাহিনীকে স্থাযীভাবে কোথাও জায়গীর দেওয়াব পরিবর্তে নিয়মিত উচ্চহাবে বেতন দিতেন। তিনি জায়গীর প্রথার রোধ করেন এবং যারা চাষ করতে পারেন, ঐরূপ ব্যক্তিদের মধ্যেই জমি বিতরণ করার ব্যবস্থা করেন। এতে জমিব উৎপন্ন ফসল বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এক কথায় তিনি কাউকে বিরাট ভূস্বামী বা জমিদাব হওযাব সুযোগ দেননি। কেননা এটা ছিল ইসলামের মূল নীতির বিবোধী।

হযরত ওসমান (বাঃ) যে কোন কারণেই হোক হযবত ওমবেব বলিষ্ঠ সুদূরপ্রসারী নীতির পরিবর্তন করে এক মহাভুল কবলেন। অ-আববীয অঞ্চলে জমি-জায়গা ক্রয় করার জন্য আরব অধিবাসীদের উপব খলিফা ওমর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন, খলিফা ওসমান তা তুলে নিলেন। সেনাবাহিনীকে জায়গীব দেওয়াব পরিবর্তে বেতন দেওয়ার প্রথা রহিত কবলেন। সকলেই প্রায় জায়গীর পেতে আরম্ভ করল। এর ফল হল সুদূবপ্রসাবী। সমগ্র ইসলামি সাম্রাজ্যে এক শ্রেণীর জায়গীবদার ও ভূস্বামীর সৃষ্টি হল। কায়েমী স্বার্থ জেঁকে বসল। পুঁজিপতিগণ ধনী হতে অধিক ধনী হয়ে উঠলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তোযাহ হোসাইন বলেন—"তালহা, যুবাইর, মারওয়ান, ইবনে হাকাম প্রমুখ ব্যক্তিগণ বিবাট বিরাট ভূস্বামীতে পরিণত হলেন।" খলিফা ওসমানের আদেশক্রমে মুয়াবিয়াও অনেক জায়গীব দিতে আবম্ভ কবলেন। অনেককে স্থাযী ভাবে অন্যত্র বসবাসের অনুমতি দিলেন। এইভাবে খলিফা ওমরের আরব জাতীয়তাবাদ অকালে বিনষ্ট হল। বালাজুরীব মতে—"মুয়াবিয়া বনু-তামিমকে আবরাবিয়ায়, কায়েস, আসাদ এবং অন্যান্য অনেককে আল মুদায়বিবে বসবাস কবতে অনুমতি দিলেন। স্বযং খলিফা ওসমান আব্দুল্লাহ ইবন মাসুদকে নাহবাইনে, আম্মাব ইবন ইয়াসিরকে আসবিনা, খাব্বারকে সানাবা এবং সাদকে হরমুজ গ্রাম জায়গীব স্বরূপ দিয়েছিলেন।" এছাড়া বহু সাহাবীকে জায়গীর দেওযা হয়। এব ফলশ্রুতি হিসেবে পুঁজিপতি শ্রেণীব উদ্ভব হল, সমাজে দেখা দিল বিলাস ব্যসন, কর্মহীনতা, সৌখীনতা, কামনা লালসা ইত্যাদি। ফলে ইসলামেব মূল আদর্শ হতে মুসলমানগণ বিচ্যুত হতে থাকলেন।

অন্যদিকে আরব জাতীয়তাবাদে ভাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরব অধিবাসীরা যেখানে খুশি বিবাহ্-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংমিশ্রণে গা ভাসিয়ে দিল। এই সংমিশ্রণের ফলে আরবের যে জাতীয় ঐতিহ্য, ধর্মীয় অনুপ্রেরণা তা আর বেশি দিন দীর্ঘস্থায়ী হল না। এখানে খলিফার চরম অদূরদর্শিতার পরিচয় ফুটে উঠেছিল।

যদিও হ্যরত ওসমানের সময় কোষাগার ধনরত্নে ভরে উঠেছিল, যার হিসেব দিতে গিয়ে ইবন মাসূদ বলেন—''খলিফার জীবনাবসানকালে সরকারি কোষাগারে ২,৫০,০০০ দীনার ও ১০,০০,০০০ দিরহাম জমা ছিল।'' সাহাবীরাও বিত্তশালী হয়েছিলেন। তবে এতে কোন দোষ নেই। কেননা যুদ্ধ-বিগ্রহে সাহাবীগণ বহু গানিমাহ্ যুদ্ধলব্ধ ধন হাতে পেয়েছিলেন। এগুলো ন্যায়সঙ্গত ছিল। যার জন্য ইবন খালদুন বলেন—''তাঁদের ধর্ম ধন সঞ্চয়ের জন্য তাঁদের প্রতি দোষারোপ করেনি। কেননা, গানিমাহ হিসাবে এগুলো ছিল আইনসিদ্ধ সম্পত্তি।'' তবু বিদ্রোহীগণ এগুলোকেও ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে খলিফাকে দোষারোপ করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, খলিফা গানিমাহের এক রাজকীয় অংশ তাঁর জামাতা বা প্রধানমন্ত্রী মারওয়ানকে দিয়েছিলেন উপহার।

শেষের ঘণ্টা

তুমি এক আল্লাহ্ ছাড়া নাহিক মাবুদ
মোদের জীবন শুধু সাগরেতে বুদ্বুদ্।
তুমি আছ চিরকাল, চির বিরাজিত
তন্দ্রা ও নিদ্রাহীন সদা জাগরিত।
আসমান জমিন জুড়া তোমার আসন
সদাই সতর্ক থাকে তোমার নয়ন।
কেহ নাই তব পাশে তব দরবারে
কোন কিছু বলিবারে কোন অধিকারে।
তব আজ্ঞা অনুমতি নাহি যদি পায়
কে আছে এমন তিনি তব দ্বারে যায়।
সামনে পেছনে যাহা সবই তব জ্ঞানে
তোমার জ্ঞানের কণাও কেহ নাহি জানে।
তোমার বিচারাসনে তুমিই প্রহরী
বাজাতে বিদায়ী ঘণ্টা নাহি কর দেরি।
এমনি প্রহবী তুমি কালেব প্রহরে
ভিখারি ভিক্ষুক হতে বাজার অন্তবে—
পাপ ও পুণ্যেব লীলা দেখ সব ঘেবি
সবেরে সময় দিয়ে কর কিছু দেবি।
মানুষের বুদ্ধিবল দেখ বিবেচনা
তার পরে দাও তুমি আপনাব চেনা।
সীমার বাহিরে গেলে সম্মুখে ঘেবি
বাজাতে বারোটা তুমি নাহি কর দেবি।
তোমারে করিব দায়ী কেন অকারণ
নিজ হাতে গড়ি মোরা উত্থান-পতন।
এমনি প্রহরী তুমি মানব-অন্তরে
দিবা নাই রাত্রি নাই তোমার প্রহরে।
অনাচার অবিচার দেখে সব ঘেরি
বাজাতে শেষের ঘণ্টা নাহি কব দেবি।

কোরআন— ২:২৫৫, ৩:২৬, ১৩:১১, ২০:১১০ ২৮:৬, ৫৩:৩, ৮৯:৫৩। কাব্য কানন।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

১।* কোরআন শরীফ : আধুনিক ব্যাখ্যা-সহ্ বঙ্গানুবাদ।

২।* কাব্য কানন : কোরআন ভিত্তিক ইসলামি কবিতামালা।

* বাংলা ভাষায় সাতশ' বছরের ইসলামের ধারাবাহিক সাত খণ্ড ইতিহাস : ৫৭০-১২৫৮

৩। ১ম খণ্ড :	মহানবী, হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী	৫৭০-৬৩২
৪। ২য় খণ্ড :	হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)	৬৩২-৬৩৪
৫। ৩য় খণ্ড :	হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)	৬৩৪-৬৪৪
৬। ৪র্থ খণ্ড :	হযরত ওসমান গনী (রাঃ)	৬৪৪-৬৫৬
৭। ৫ম খণ্ড :	হযরত আলী হায়দার (রাঃ)	৬৫৬-৬৬১
৮। ৬ষ্ঠ খণ্ড :	উমাইয়া খেলাফত	৬৬১-৭৫০
৯। ৭ম খণ্ড :	আব্বাসীয়া খেলাফত	৭৫০-১২৫৮

প্রকাশক : আল্হাজ্ব আবুল কালাম মল্লিক
মল্লিক ব্রাদার্স
৫৫, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩